KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/২, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 23/4 24/1 26/1 26/2	Year of Publication : Sep - 2002 Oct - 2002 Oct - 2004 May - 2005 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, রাহুল সেন	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

৮৫

বিভাব

গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা
১৪০৯

বিভাব

প্রধান সম্পাদক/সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক/রাহুল সেন

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত বই

জীবনমূলক : নট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। কুমার রায়। ৩.০০ টাকা॥ ঋষি নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। কুমার রায়। ২.০০ টাকা।। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। গণেশ মুখোপাধ্যায়। ৯.০০ টাকা।। গেরাসিম লিয়েবেদেফ। ডঃ হায়াৎ মামুদ। ১৮.০০ টাকা।। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার। শংকর ভট্টাচার্য। ৪০.০০ টাকা।। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। ১৫.০০ টাকা।। বাংলার নটনটী (৪র্থ খণ্ড)। দেবনারায়ণ গুপ্ত। ৩৫.০০ টাকা।। নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য। লেখা:সজল রায়চৌধুরী। সম্পাদনা: নৃপেন্দ্র সাহা। ৮০.০০টাকা।। ব্রের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০.০০ টাকা।।

নাট্য ইতিহাস ধর্মী : কলকাতা নাট্যচর্চা। রথীন চক্রবর্তী। ১০০.০০ টাকা।। স্টার থিয়েটারের কথা। দেবনারায়ণ গুপ্ত। ৮.০০ টাকা।। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। কিরণচন্দ্র দত্ত। সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাশ ৮০.০০ টাকা।। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯০১ -১৯০৯)। শংকর ভট্টাচার্য। ৬০.০০ টাকা।। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৯১০-১৯১৯)। শংকর ভট্টাচার্য। সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য। ৮০.০০টাকা।। বঙ্গীয় নাট্যশালা। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা : ড. বিষ্ণু বসু। ৫০.০০ টাকা।।

প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালা : আশার ছলনে ভুলি (২য় সংস্করণ)। উৎপল দত্ত। ৪৫.০০ টাকা॥ বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান। ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। ৩৫.০০ টাকা।। নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ১ ❖ শ্রাব্য ও দৃশ্য, মঞ্চে ও নাটকে। ড. অজিতকুমার ঘোষ। ১০.০০ টাকা।। নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ২ ❖ পথ নাটক : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা। শিশির সেন, জোছন দস্তিদার, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য। ১০.০০ টাকা।। নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ৩ ❖ থিয়েটারে কবিতা। কুমার রায়। ১০.০০ টাকা।।

নাটক : সফ্‌দর হাশমি নাট্য সংগ্রহ (নতুন সংস্করণ)। সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা। ৭৫.০০ টাকা॥ শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী। উপেন্দ্রনাথ দাস। সম্পাদনা : ড. মহাদেব প্রসাদ সাহা। ৪০.০০ টাকা।। নীলদর্পণ(ইংরেজি)। সম্পাদনা : সুধী প্রধান। ৭০.০০ টাকা।।

পত্রিকা : নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৩ ❖ ২০.০০ টাকা।। নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৫ ❖ ৫০.০০ টাকা।। নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬ ❖ ৬০.০০ টাকা।। নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৭ ❖ (বিশেষ ব্রেখট সংখ্যা)। ৬০.০০ টাকা।।

প্রাপ্তিস্থান

বইঘর, কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীট, রবীন্দ্রসদন চত্বর।

বাংলা আকাদেমি ভাণ্ডার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০

তথ্য ও সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই.সি.এ ৪০৩০/২০০২

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা

১৪০৯

সূচি

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা ❖ সত্যেন্দ্রনাথ রায় ১

যেহেতু সময় নেই ❖ অশোক মিত্র ১৩

বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত ও ইংরেজি ❖ শিশিরকুমার দাস ১৯

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে Sex fantasy ❖ নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৩৫

বুদ্ধদেব বসু পাঠের ভূমিকা ❖ অমিয় দেব ৪৯

অতুলপ্রসাদের গান : পুনর্বিবেচনা ❖ সুধীর চক্রবর্তী ৫৭

গানের কবিতা, সমাজের আয়না ❖ অরুণকুমার বসু ৬৫

বাংলা শিশুসাহিত্যের অপরূপকথা ❖ পিনাকী ভাদুড়ী ৮৭

বিদেশি সাহিত্য

রম্যাঁ রলাঁ ও ভারতবর্ষ : বিস্মৃত এক সংলাপ ❖ চিন্ময় গুহ ১০৩

মালার্মে সম্পাদিত ও প্রকাশিত মহিলাদের পত্রিকা ❖ কমলেশ চক্রবর্তী ১১৫

বেলা শেষের গান (মূল রচনা : গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ) অনুবাদ ❖ অমিতাভ রায় ১২৯

আলোচনা

ভেবে দেখুন ❖ ডা. গৌরীপদ দত্ত ১৪৭

আইন শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষসাধনই যথেষ্ট নয় ❖ অরুণ মুখোপাধ্যায় ১৫২

সম্পাদকমণ্ডলী :
পবিত্র সরকার । অশোক মুখোপাধ্যায় । প্রদীপ দাশগুপ্ত ।
শান্তিনিকেতন
অনাথনাথ দাশ । অরুণ মুখোপাধ্যায় । স্বপনকুমার ঘোষ

প্রধান সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক
রাহুল সেন

প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদকীয় দপ্তর
'বিভাব'
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল) । কলকাতা - ৬৮ । দূরভাষ : ৪৭৩-৩৬০০

প্রচ্ছদ : শংকর ঘোষ

বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*
ইস্টার্ন বুক এজেন্সি
৮/সি, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত।
বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ ফোন : ৪১২ ১১৩৩ হইতে অক্ষর বিন্যস্ত
এবং চিত্রিত ও আইডিয়াল গ্রাফিক্স, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

বিভাবের এই সংখ্যাটি প্রবন্ধ সংখ্যা। অতীতেও শুধুমাত্র প্রবন্ধ নিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায়ও বেশ কিছু উজ্জ্বল এবং একই সঙ্গে বিতর্কসাপেক্ষ প্রবন্ধ আছে। আছে সময়ানুগ দুটি আলোচনা। বলাই বাহুল্য, এই সব লেখায় যে-সব সিদ্ধান্ত উপস্থিত তার সঙ্গে সম্পাদক একমত নাও হতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সূচনার প্রথম পাঁচ বছর বিভাব প্রবন্ধেরই কাগজ ছিল। এখনো ভালো প্রবন্ধই আমাদের আকর্ষণের মূল কেন্দ্রে। গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অত্যন্ত উচ্চমানের কিছু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বহু উল্লেখযোগ্য গল্প কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে। সত্যিকারের যোগ্যমানের প্রবন্ধও দুর্লক্ষ্য নয়। আসলে একসঙ্গে এত ভালো সাহিত্যপত্রের প্রকাশ নিকটকালে আর হয়েছে বলে মনে হয় না! তবে যোগ্য প্রবন্ধের সংখ্যা এখনো অপ্রতুল। আমরাও তাই প্রবন্ধের দিকেই হাত বাড়িয়ে থাকি। একই সঙ্গে চাই বিষয়বৈচিত্র্য। এ-কারণেই অবশ্য-সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা প্রকাশের প্রয়াস আমাদের। দিলীপকুমার গুপ্ত স্মৃতি সংখ্যা, ভাস্কর্য সংখ্যা, গোয়েন্দাসংখ্যা, বিরল তথ্যসহ একাধিক সঙ্গীত সংখ্যা, জীবনানন্দ সংখ্যা, আমাদের সম্পাদকীয় প্রবণতা চিহ্নিত করে।

এই প্রবণতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল সমগ্র 'টুকরো কথা' সংখ্যা। সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর পাঠকসমাজ আমাদের যে সম্মান ও অভিনন্দনবন্যায় প্লাবিত করেছেন তাতে 'অভিভূত' হওয়া ছাড়া আমরা আর কিছু জানাব না। কেন না এ সংখ্যার প্রকাশকে আমাদের অবশ্যকৃত্য বলে মনে হয়েছিল। বর্তমানকালের সাহিত্যবিচারে এখন অনবরতই 'খদ্যোতকে' অন্যায্য ভাবে নক্ষত্র বলে চিহ্নিতকরণের বাণিজ্য চলেছে, তাতে অনেকে বিচলিত বোধ করলেও আমরা যে করছি না, আশা করি বিভাবের জ্ঞানী-গুণী মান্য পাঠকদের কাছে আজ তা আর অবিদিত নেই। তবে 'টুকরো কথা' সংকলনের সমাদর সত্যিই আমাদের হতবাক করেছে! যত সংখ্যক ছাপা হয়েছিল এবং তখন যা আমাদের যথেষ্ট মনে হয়েছিল, এত অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যায়, যে পরে মনে হয়েছে সংখ্যায় তিনগুণ ছাপা হলেও 'টুকরো কথা' অনতিবিলম্বেই নিঃশেষিত হয়ে যেত। কি আর করা যাবে! আপনারা যাঁরা সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারলেন না তাঁদের কাছে আমরা করজোড় ক্ষমাপ্রার্থী। সংখ্যাটির প্রকাশ এতই ব্যয়বহুল যে জীবনানন্দ স্মরণসংখ্যার মতো এর দ্বিতীয় মুদ্রণে এখনই সাহসী হতে পারছি না। যদিও আমাদের কাছে দ্বিতীয় মুদ্রণের সব রকম প্রয়োজনীয় উপাদান প্রস্তুত।

এই সংখ্যা থেকে সম্পাদক হিসাবে রাহুল সেনের নাম থাকবে। গত কয়েকটি সংখ্যার প্রতি পাতায় তার উজ্জ্বল উপস্থিতি পাঠকের কাছে অলক্ষ্য থাকেনি। তার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। সম্পাদকমণ্ডলীর অনুরোধে আমি অবশ্য প্রধান সম্পাদক হিসাবে থেকে যাব।

একটি কথা, নানা সময়ে বহু প্রশস্তিমূলক চিঠি আমাদের দপ্তরে আসে। আমরা তা না ছাপলেও, সত্যিকারের ত্রুটি নির্দেশক চিঠির প্রতি আমাদের আগ্রহ। আমরা প্রায়শই আমাদের অতীত সাহিত্যমানের ঐতিহ্য ভুলে যাই। শুধু ভুলে যাই বললেও সবটুকু বলা হয় না। অনেকের তা জানাই নেই? জানলে তো ভুলে যাব? আমরা শিকড় এবং পল্লবিত সবুজ বিস্তার, একই সঙ্গে লক্ষ করতে চাই। ভবিষ্যতেও চাইব।

জীবিকার এবং একই সঙ্গে শিল্পের প্রয়োজনে বিখ্যাত ফরাসি কবি মালার্মে একসময় মেয়েদের ফ্যাশন ম্যাগাজিনও সম্পাদনা করেছিলেন। কমলেশ চক্রবর্তীর রচনায় ছবি সহ তাঁর সম্পর্কে একটি কৌতূহলদ্দীপক প্রবন্ধ এ সংখ্যায় মুদ্রিত হল। সম্প্রতি কমলেশ প্রয়াত হয়েছেন। কবি অনুবাদক কমলেশ চক্রবর্তীর নাম মনস্ক পাঠকের কাছে অবিদিত নয়। এটিই তাঁর শেষ মুদ্রিত রচনা।

এ বছর বিখ্যাত অধ্যাপক এবং বাংলাছন্দের অন্যতম প্রধান গবেষক-নির্দেশক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীর বছর। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। বিভাবের আগামী সংখ্যাই বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১। বিভাব সাধারণভাবে বছরে চারবার প্রকাশিত হবে। কোনো নিয়ন্ত্রণঅসাধ্য কারণে যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হলে গ্রাহকরা অতিরিক্ত মূল্য না দিয়েই একটি সংখ্যা অতিরিক্ত পাবেন।

২। বছরে একবার মাত্র 'বিশেষ কবিতা সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। অন্য কোনো সংখ্যায় বিশেষ তাৎপর্য ছাড়া কবিতা প্রকাশিত হয় না। সুতরাং সহৃদয় লেখকবর্গ সাধারণ সংখ্যার জন্য কবিতা পাঠাবেন না। বিভাবের আগামী বিশেষ কবিতা সংখ্যা প্রকাশিত হবে ২০০৩ সালের এপ্রিলে।

৩। রচনার কপি রেখে পাঠাবেন। কোনো ক্রমেই ডাকটিকিট থাকলেও রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। জেরক্স বা ফোটোকপি করা কোনো রচনা মুদ্রিত হবে না। মনোনীত হলেও তাতে ভুল মুদ্রণের সম্ভাবনা।

৪। একসঙ্গে পাঁচ কপি না নিলে কোনো কমিশন দেওয়া হয় না।

৫। মুদ্রিত রচনা সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা আসলে তাঁর স্বদেশ ভাবনারই এক বিশেষ প্রকাশ।

নিজের দেশকে 'স্বদেশ' রূপে অন্তরের মধ্যে পেতে হলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দেশের করে দিতে হবে। তখনই বলতে পারব — আমার দেশ। সব ভালোবাসাই এইরকম দেওয়ার মধ্য দিয়ে পাওয়া। ভালোবাসার অর্থই তাই।

এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। '*পল্লীপ্রকৃতি*' বইয়ে 'দেশের কাজ' প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন (রচনাবলী:/১৩খণ্ড/ পৃ ৫২৬/জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) :

> আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আমরা এই দেশকে আপনি জয় করি নি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এই-সব বস্তুপিণ্ডেরও নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়।...আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে।

নিজেকে সর্বান্তঃকরণে দেশের বলে ভাবা সহজ নয়। বিশেষ করে সহজ নয় ভেদ-সর্বস্ব মনের পক্ষে। ভেদ-বুদ্ধি এবং বিশেষ সুবিধাভোগ মনকে অসাড় করে দেয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দু মন কমপক্ষে হাজার বছরের অসাড় মন — সে-কথা এখানে নয়, যথাস্থানে। ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। যদিও আর্য বা হিন্দুর ইতিহাসচর্চাতেই রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-কথা সীমাবদ্ধ।

জড় বস্তু বা জন্তু-জানোয়ারের নিজের দেশ বলে কিছু নেই, নিম্নমানের চেতনা যে-মানুষের, তারও স্বদেশ-বিদেশ বলে কিছু নেই। স্বার্থবোধ প্রবল হলে সব ভালোবাসাই সংকুচিত, কুঁকড়ে যায়। চেতনার একটা উঁচু স্তরে উঠলে তবেই মানুষ একটা বিশেষ ভূখণ্ডকে, তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে, কাছের মানুষজনকে আপন বলে ভাবতে পারে। যে তা পারে না, তার উপর রাগ করবার কিছু নেই। সে এখনও অনেকটা জন্তুর স্তরে।

দেশের মানুষের সঙ্গে মানুষের দেশের যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা আপনা থেকে নয়, তা গড়ে ওঠে বুদ্ধি আর হৃদয়ের সহযোগিতায়, কল্পনা আর সম-অনুভূতির বা এমপ্যাথি (empathy)-র মধ্য দিয়ে, মনুষ্যত্বের এক-একটা উচ্চতর ধাপে উত্তরণে। এই ক্ষান্তিহীন আত্ম-উত্তরণেই মানুষ সত্য হয়।

মানুষ যূথবদ্ধ প্রাণী। একলা হলে সে বিলুপ্ত হয়ে যেত। চলতে চলতে চলারই প্রয়োজনে নানারকম ছোটোবড়ো যূথবদ্ধতা সে তৈরি করে; আবার প্রয়োজন ফুরোলে স্বতন্ত্র সংহতি, যূথবদ্ধতা বা গোষ্ঠী তৈরি করে। কোথাও তা গুহার নিরাপত্তার সংহতি, কোথাও তা খাদ্য-সংগ্রহের জন্য যূথবদ্ধতা, কোথাও তা ধর্ম বা উপাসনাভিত্তিক অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক যূথবদ্ধতা তৈরি হয়, আবার বিলীনও হয়। 'দেশ' তেমনই একটা যূথবদ্ধতা। একদিন 'দেশ' নামের সংহতি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল, আজ আর ঠিক ততটা নেই।

সব সংহতিই যেহেতু মানুষেরই প্রয়োজনের সৃষ্টি, তাদের খানিকটা যেন জৈবধর্ম আছে —অনেক সময় কিছু আগেই এসে উপস্থিত হয়, অনেক দরকার ফুরিয়ে গেলেও আসর

ছাড়তে চায় না। মানুষের বিভিন্ন ছোটোবড়ো, কালোপযোগী বা কালাতিক্রান্ত গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যে যে-বিশেষ একটি এখানে আমাদের বিবেচনার বিষয়, তা হল দেশ। তাকে নানারকম ফ্রেমের মধ্যেই দেখা যায়। এখানে আমরা দেশকে বিশেষ করে ভূগোল এবং ঘটনার ফ্রেমে দেখতে চাই।

ঘটনার ফ্রেম বলতে সাধারণভাবে আমরা রাজনীতির ফ্রেমই বুঝি। এরকম বোঝা অল্প-বিস্তর ভুল হতে পারে, কেননা অনেক রকমের ইতিহাস হতে পারে। কিন্তু সচরাচর ইতিহাস বলতে যা আমরা বুঝি, সে হল শক্তির লীলা। এবং সে-শক্তি মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

একটা কথা এখানে আমাদের প্রথমেই বলে রাখা দরকার। এখানে আমাদের কাজ নিরাসক্ত ইতিহাস-সন্ধান নয়। এ-প্রবন্ধে আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা-যা লিখেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি, তা-ও আমাদের অপর প্রধান লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে অসামান্য কল্পনাপ্রবণ এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষ। কল্পনাকে তিনি ইতিহাস-অনুসন্ধানের ব্যাপারেও তুচ্ছ করেননি। অন্য প্রমাণের যেখানে অভাব, সেখানে *রামায়ণ মহাভারত* বা অন্যকোনো মহাকাব্যের পুরা-কথাকে তিনি অবাধে মূল্য দিয়েছেন, যা বিজ্ঞানধর্মী ইতিহাসে কখনই দেওয়া হয় না। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের এই পুরা-চর্চাকে পাঠক কী মূল্য দেবেন, তা পাঠকের নিজের অভিরুচি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনো ঐতিহাসিক গবেষণা করেননি। কম বয়সে রাজপুত বীরদের নিয়ে বা শিবাজিকে নিয়ে যে-কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছেন, তা বিশেষ করে হিন্দুর মনে বীরত্বের সঞ্চার করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ইতিহাস-নিরপেক্ষ সত্যসন্ধান। পরিণত বয়সে *রামায়ণ* বা অন্য কাব্যকে ভিত্তি করে কিছু কিছু লিখেছেন, তা মূল্যবান দিগ্‌দর্শনী হতে পারে, কিন্তু তার পক্ষে কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই।

ইতিহাসচর্চার দুটি বিপরীত প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক, তথ্যের প্রতি কঠিন আনুগত্য; দুই, তথ্য পেরিয়ে কল্পনা, গল্পরস অথবা ভাবরসের প্রতি আনুগত্য।

'তথ্য' কথাটা নিয়ে অনেক কূট দার্শনিক তর্ক তোলা যায়। সাধারণবুদ্ধিতে আমরা 'তথ্য' আর 'সত্য'-এ বিশেষ তফাত করি না এবং তথাকথিত ভাবের সত্যকে 'সত্য' আখ্যা দিই না। ইতিহাসকে যদি বিজ্ঞানধর্মী হতে হয়, তা হলে 'তথ্য'-ই তার একমাত্র সম্বল।

তবে এমনও বলা যেতে পারে যে, ইতিহাস একটি নির্মীয়মাণ বিজ্ঞান, যার তথ্য পদেপদে বদলে যাচ্ছে। হিমালয় তো অনড় অচল স্থির। অথচ প্রতি নিমেষে সে বদলে-বদলেও যাচ্ছে। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ততক্ষণই, যতক্ষণ-না নতুন তথ্য এসে তাকে হটিয়ে দেয়।

জীবনের প্রথমার্ধ কাটল রবীন্দ্রনাথের উনবিংশ শতাব্দীতে। তারপর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। আরও চার-পাঁচ বছর পরে বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশি আন্দোলন। এই সময়, ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' লিখলেন। 'স্বদেশী সমাজ' ঐতিহাসিক রচনা নয়। কিন্তু নতুন ইতিহাস সৃষ্টির বীজ। একে আর প্রথমদিকের রচনা বলা চলে না। এর আগের সমস্ত রচনাকেই আমরা ইতিহাস বিষয়ে প্রথমদিকের রচনা বলে ধরতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের কিছু ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ আছে যা লেখকের নিজের গবেষণালব্ধ নয়, ইতিহাসের বা সংশ্লিষ্ট লেখা থেকে ধার করা। নিজের কথাও অবশ্য কিছু আছে। *রবীন্দ্র*

রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)-র ১৩ খণ্ডে *ইতিহাস* গ্রন্থে তাদের পাওয়া যাবে। যেমন — 'শিবাজী, ও গুরু গোবিন্দ সিংহ', 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' বা 'ঝাঁসীর রানী' (রচনাবলী/১৩খণ্ড/ পৃ ৪৪১-৯০/জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের ছাপ তার মধ্যে অল্পই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ইতিহাসের সাদা তথ্য ছাড়া আরও কিছু বলতে চান এটা প্রায় সব প্রবন্ধেই অনুভব করা যায়। এই 'আরও-কিছু' হল আদর্শ।

তথ্যের সত্যতা বিচার করা যায়, প্রমাণ করা যায়। কিন্তু 'আরও-কিছু' অর্থাৎ ভাব বা আদর্শ প্রমাণসাপেক্ষ নয়।

গদ্য প্রবন্ধ যথার্থ প্রমাণিত সত্যের ভিত্তিতে রচিত কি না তা প্রমাণের দ্বারা নির্ণয় করা যায়। কবিতায় প্রমাণের প্রশ্ন ওঠে। ভাব বা আদর্শের ক্ষেত্রে, কল্পনার ক্ষেত্রে প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

তখন এল *কথা* কাব্যগ্রন্থের কবিতা। যেমন — 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'প্রতিনিধি', 'সামান্য ক্ষতি', 'গুরু গোবিন্দ', 'শেষ শিক্ষা' — এইসব কবিতা বা প্রবন্ধের অধিকাংশই মুঘল ও পাঠান শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাহিনী। এগুলিতে ইতিহাসের ঘটনা যেমন কিছু আছে, তেমনই আছে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করার চেষ্টা। একই সঙ্গে খানিক ঐতিহাসিক এবং অনেকখানি আদর্শবাদী রচনা।

অনেক রচনায় এক-একটি গুরু বা লোকহিতব্রতী সাধকের সাক্ষাৎ পাই। এদের অনেকেই লোক-সংগঠক। কিছু আগে যেমন আমরা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, যেমন *আনন্দমঠ*-এর সত্যানন্দ বা হিমালয়ের শিখর থেকে নেমে আসা মহাগুরু।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই গুরু প্রায় সবাই সন্ন্যাসী গোত্রের মানুষ, সকলেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ — কার্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রত্যাহার করেন। রবীন্দ্রনাথের কোনো গুরু-স্থানীয় ব্যক্তিই সন্ন্যাসী নন, অলৌকিকও নন। সাধারণ মানুষের মতো হয়েও এঁরা আদর্শনিষ্ঠায় এবং সম্ভাবনায় অসাধারণ। এঁরা সাহিত্যে শিল্পগুণ না বাড়ালেও জীবনমূল্যের সঞ্চার করেন।

যেমন *রাজর্ষি*— উপন্যাসের বিশ্বন চরিত্রটি। এঁরা অনেক সময় সাহিত্যমূলে বরং ক্ষতিই করে। বোধ হয় সেইজন্য *বিসর্জন* নাটকে বিশ্বন চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন। বিশ্বনের কিছুটা অনুসরণ গোবিন্দমাণিক্যই করেছে।

গোবিন্দমাণিক্য জাতের চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেক। *গোরা*-র পরেশবাবু থেকে শুরু করে অনেক ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর, অনেক ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যে পাব। এঁদের কাজের জগতে হঠাৎ একটা অকাজের হাওয়া বইয়ে দেওয়া, নাটক বা উপন্যাসকে উচ্চতর নৈতিক ঘাটে বেঁধে দেওয়া, একে উচ্চতর মানবিক ঘাটও বলতে পারি।

'শিবাজি-উৎসব' কবিতাটি সরলা দেবীর নির্বন্ধাতিশয্যে রচিত। কবিতাটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের মনে ফরমায়েশি কবিতার ছাপ প্রায় সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। ফরমায়েশি কবিতায় প্রায়ই একটু-আধটু অত্যুক্তির ছোঁওয়া থাকে। 'শিবাজি-উৎসব'-এ তা একেবারেই নেই এ-কথা কিন্তু বলা যাবে না।

বক্তব্যকে কবিতায় পরিণত করতে যতটুকু কল্পনা ও অতিশয়োক্তি অত্যাবশ্যক তাকে অত্যুক্তি-দোষ বলা যায় না, কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে অলংকার-বাহুল্যে তার ঐতিহাসিক সত্য থেকে সরিয়ে ফেলা অবশ্যই দোষাবহ। শিবাজি-উৎসবে এই অনৈতিহাসিকতার অভিযোগ খুব উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কবিতাটিকে কেবল কবিতা হিসাবে দেখলে এটি যে নানা কাব্যগুণে অসামান্য সৃষ্টি তা মানতেই হবে। কিন্তু ঐতিহাসিক বললেই আপত্তি হতে পারে। এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিক আপত্তি করেওছেন। প্রশ্নটা শিবাজির 'অখণ্ড ভাবনা'-কে নিয়ে। শিবাজির কবিতায় যে-মন্ত্র শিবাজির কণ্ঠে ধ্বনিত — 'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত/ বেঁধে দিব আমি।' — এই মন্ত্র কি ইতিহাসের শিবাজির মন্ত্র? শিবাজির ভাবনা হিন্দু-ভাবনা বা মারাঠি-ভাবনা হতে পারে, ভারত-ভাবনা নয়। তেমন মনে করলে কালাতিক্রমণ দোষ ঘটবে।

এই মতের সমর্থনে আমরা যদুনাথ সরকার বা ঈশ্বরীপ্রসাদের নাম করতে পারি। জাতিকে সর্বভারতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করার কোনো চেষ্টাই শিবাজি করেননি, করার কথাও নয়। শিবাজি তার বাহিনীর মধ্যে এ-আদর্শ প্রচারিত করেননি। শিবাজির মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এই বাহিনীর প্রধান একটি অংশ সংঘবদ্ধ দস্যু-বাহিনীতে পরিণত হয়ে পূর্ব-ভারতে লুঠতরাজ করতে আরম্ভ করে। 'বর্গির হাঙ্গামা' বাঙালির কাছে আজও বিভীষিকা।

'শিবাজি-উৎসব' কবিতা রচনার (আগস্ট ১৯০৪) আগের মাসেই বাঙালির পক্ষে একটি অভাবিত প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। প্রবন্ধটি বহুখ্যাত, নাম 'স্বদেশী সমাজ' (জুলাই ১৯০৪)। এটি ইতিহাস নয়, কিন্তু ভাবী ইতিহাসের বীজমন্ত্র। প্রবন্ধটির মধ্যে পদে পদে ভারত-ইতিহাসের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধটির সব থেকে উল্লেখযোগ্য কথা হল আত্মশক্তির উদ্‌বোধন।

এই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অজস্র 'স্বদেশী' গান রচনা করে যে অভিনব জোয়ার এনে দেন, তার অধিকাংশ গানেরই মূল কথা হল আত্মশক্তির উদ্‌বোধন। কোনো সামান্যতম ব্যাপারেও ইংরেজ-শক্তির দ্বারস্থ না-হওয়া।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি আরম্ভ হয়েছে গ্রামের জলকষ্ট দিয়ে। এক সময় গ্রাম সুজলা-সুফলা ছিল। আজ এ-দশা কী কারণে? তার প্রধান কারণই হল, গ্রামের প্রাণ আজ গ্রামে নেই। অতএব স্বদেশি সমাজ গঠনের প্রথম পদক্ষেপই হল গ্রাম-সমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করা, গ্রামের প্রাণ গ্রামে ফিরিয়ে আনা, লোকসাধারণে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

প্রবন্ধের শুরুতে আমরা জানলাম, ভারতবর্ষ গ্রাম-প্রধান দেশ। গ্রামোন্নয়ন বা পল্লিসঞ্জীবন এখন আমাদের দায়িত্ব। তার জন্য ইংরেজ-সরকারের কাছে হাত পাতব না। রাজনীতি সম্পূর্ণ আমাদের অগ্রসর হতে হবে। যা করতে হবে, তা আমাদেরই করতে হবে।

কলোনির ইংরেজ 'ছোটো ইংরেজ', তারা কলোনির উন্নতিসাধন করবে না। সে-কাজ আমাদের সমাজই করবে, ইংরেজকে — ইংরেজের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়েই তা করতে হবে।

কিন্তু কলোনির মালিক ইংরেজ তা কি করতে দেবে? দেবে, কেন না 'বড়ো ইংরেজ'-ও আছে, তারাই দেবে।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শ্বেতাঙ্গ জাতির মানবিক দায়িত্ববোধে —White man's burden-তত্ত্বে বিশ্বাসী। গ্রামকেও বাঁচাব, ইংরেজকেও অখুশি করব না এই হল রবীন্দ্রনাথের পল্লিসঞ্জীবনের পরিকল্পনা। প্রবন্ধটি গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের একটি আগাম নকশা, যাকে বলা যায় 'ব্লু-প্রিন্ট' (Blue Print)।

এই প্রবন্ধে যে-গ্রামের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সে-গ্রাম কি সত্যিই কখনও ছিল?

কখন? কোন্ আমলে? মুঘল-যুগে, তুর্কো-আফগান যুগে, না হিন্দু আমলে? প্রবন্ধটা যে আমাদের এত টানে, সে কি আমাদের যৌথ নস্টালজিয়ার টান?

গোরা উপন্যাস ১৯০৭-এ আরম্ভ হয়ে শেষ হয় তিন বছর পরে ১৯১০-এ। এই উপন্যাসে তৎকালীন শহরজীবনের ছবি, নানা আন্দোলনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ এমন বিশ্বস্তভাবে ফুটে উঠেছে যে একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বললেও বলা যায়। কিন্তু *গোরা* উপন্যাসের লক্ষ্য ইতিহাস নয়, লক্ষ্য *গোরা*-র জীবনের সমস্যা। তাকে ঘিরে অনেক সমস্যা, অনেক প্রশ্ন। সবথেকে বড়ো প্রশ্ন, কোন্‌টা গোরার স্বধর্ম আর কোন্‌টাই বা তার স্বদেশ? দেশ আর ধর্মে যদি বিরোধ ঘটে?

ইতিহাস প্রসঙ্গে এই সময়ে দুটি প্রবন্ধ খুব বিখ্যাত। একটি হল 'তপোবন' (১৯১০-১১, পৌষ ১৩১৬), আর দ্বিতীয়টি হল, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৯১১, বাং ১৩১৮)।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ তপোবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার কালেই প্রশ্ন তুলেছেন, যদি বৈদিক কালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে নালন্দা অসম্ভব না হয়, তা হলে আজই বা তপোবন কেন হবে না? তপোবনে দুটি জিনিস দরকার : এক, তপস্বী আর দুই, বন। বৈদিক কালে বন অবশ্যই ছিল, তপস্বীও ছিল, আর কোনো কোনো রাজা হয়তো তপস্বীও ছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বছরই বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠিতে লেখেন (আগস্ট ১৯০১), 'ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না'।

এমন অনুমান করা যায় কি যে, রবীন্দ্রনাথের এই ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আসল মতলব 'প্রকৃত হিন্দু' তৈরি করা? তার অনুকূল পরিমণ্ডলই তপোবন?

প্রবন্ধের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বিশেষ বিশেষ জীবন-পরিবেশ বিশেষ বিশেষ ধরনের সভ্যতার জন্ম দেয়।

> সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অল্পস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্‌বিজয়ী হয়েছে — এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।
>
> 'সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক-আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল।'

ক্রমে ভারতবর্ষে নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে, বন দূরে সরে গিয়েছে। তখন প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ ভারতবর্ষ বনের কাছে আপন ঋণ ভোলেনি। কালিদাসের *রঘুবংশ*, *শকুন্তলা*, *কুমারসম্ভব* কিংবা বাণভট্টের *কাদম্বরী* — সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে ভারতবর্ষ তপোবনকে মনে রেখেছে। কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই একটা সমন্বয় দেখা যায়, সে হল ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য।

রামায়ণ-এও আমরা তাই দেখতে পাই : বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন, যা গভীরতর মিলনের ইঙ্গিত বহন করে। এই শিক্ষাই তপোবনের চিরন্তন শিক্ষা।

> 'তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়,

স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা।...ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী, এবং কর্মে যোগসাধনা। (রচনাবলী/১১খণ্ড/পৃ৬০৫ /জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ)

আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বছর চল্লিশেক পরে বিদ্যালয়ে 'তপোবন' প্রবন্ধটি পড়াবার সময় প্রাচীন তপোবন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তার অংশ-বিশেষ এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে —

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ঐতিহাসিক তপোবনের কথা আমি জানিনে। কেউ জানে বলে আমি বিশ্বাস করিনে।

তপোবনের কথা উল্লেখ আছে পুরাণে, কিন্তু এত অসম্ভব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সঙ্গে সে জড়িত যে তাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করাতে পারিনে। যেখানে যে সব ঋষি-তপস্বীদের বাস করেন তাঁরা সমুদ্র-পর্বতকে অভিশাপের জোরে কম্পমান করে জোড় হস্তে দ্বারস্থ করতে পারতেন। আবার তাঁদের তপস্যাও অযুতনিযুত বৎসরের তাপে এমন সর্বনেশে হয়ে যেতে পারত যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাবার জো হ'ত,...এমন সব কথা বিশ্বাস করবার শক্তি যাঁদের আছে, তাঁদের পড়াশোনা করবার দরকার নেই। ('কণ্ঠিপাথর', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ ৬৫৭-৫৯)

তপোবনে'র অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৩১৮ বাং., ১৯১০-১১ ইং)। রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন এই ধারাটিকে ইতিহাসের ধারা বলে ঘোষণা করেছেন তখন একে নিয়ে আপাতত আমাদের খট্‌কার কিছু নেই। গোড়ার দিকটা যুদ্ধ-বিগ্রহেরই কথা, পরের দিক ভাব ও নৈতিক আদর্শের বিবর্তনের কথা। এখানে ইতিহাস হয়েছে দুই দিককে অর্থাৎ রাষ্ট্রিক এবং নৈতিক, দুই দিককে মিলিয়ে নিয়েই। এই বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের আর কোনও প্রবন্ধে নেই। যুদ্ধ, যোদ্ধা এবং অস্ত্রগুরুদের কৃতিত্বের কথা দিয়ে শুরু, শেষ ভাগে বিমল জ্যোতির্ময় ব্রহ্মবিদ্যা। প্রথম ভাগের তথ্য বা উপাদান-উপকরণ প্রধানত আহরিত হয়েছে রামায়ণ মহাভারতের পুরা-কল্প বা আর্কিটাইপ অবলম্বন করে', দ্বিতীয় ভাগের অবলম্বন বেদান্ত। প্রশ্ন জাগে, এই দুই ভাগ সেতু-সম্ভব তো? কিন্তু সে কথা এখন নয়, এখানে নয়।

রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করেছেন দুই বিপরীতের বা সংঘর্ষের কথা দিয়ে, সংঘর্ষের পথে কেমন করে অভিনব তৃতীয়ের আবির্ভাব হয় সেই কথা দিয়ে। দৃষ্টান্ত সবই ইতিহাস থেকে। রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যাক —

গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার প্রয়োজন ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্যেরা কালে কালে ও দলে

দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্য উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না।

এই আর্য-অনার্যের সংঘর্ষের ফলে যে-বিক্ষোভ শান্ত হয়ে এল, তখন আর্যেরা নিজেদের এক বলে জানল, কিন্তু আদিবাসী অনার্যদের কী অবস্থা ঘটল সে-সম্বন্ধে বলার কোনো দায়িত্ব এখানে রবীন্দ্রনাথ নিচ্ছেন না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এ-প্রবন্ধ আর্য-অনার্যের ব্যাপারে একদেশদর্শী। এ-প্রবন্ধে আমরা শুধু আর্যদের বা হিন্দুদের কথাই পাব। গোটা ভারতবর্ষের কথা পাব না।

যাঁরা শক্তিমান, যুদ্ধ হল তাঁদেরই বৃত্তি। তাঁরাই বীর, তাঁরাই হলেন ক্ষত্রিয়। রক্তের সংমিশ্রণ এনেছেন তাঁরাই।

যাঁরা বুদ্ধিমান, মস্তিষ্কের শক্তিতে সমৃদ্ধ, অগ্র-পশ্চাৎ ভাবনা তাঁদেরই কাজ। তাঁরা ধীরস্থির। তাঁরাই হলেন শাস্ত্রকার, তাঁরা ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের কাজ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, বিদ্যাচর্চা। অতি সম্মানের কাজ, সমাজে এঁরাই শ্রদ্ধাভক্তির কেন্দ্র। কিন্তু সাহস, শক্তি, প্রাণোদ্যম সংহত হয়েছে ক্ষত্রিয়ের হাতে। ক্ষত্রিয় মোটেই মামুলি নয়, বরং এক অর্থে বিদ্রোহী। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদেরই উদ্ভাবনা। সেই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যা খ্যাত হয়েছে রাজবিদ্যা নামে।

মহাকাব্যের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে অনেক প্রাচীন কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ। এটা বিরোধেরই কাহিনী, মিলনের কাহিনী নয়। মিলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁরাই বিশেষ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা প্রায় সবাই ক্ষত্রিয়। যেমন বিশ্বামিত্র, জনক, রামচন্দ্র। বিশ্বামিত্র কৃষিবিদ জনকের কাছে গেলেন, এবং তার পর রামচন্দ্রকে নিয়ে দক্ষিণে কৃষিবিস্তারের অভিযান করলেন। এ-কাহিনী খুবই সম্ভবপর। রামচন্দ্র বাহুবলে দক্ষিণদেশের অনার্যদের জয় করেছেন কাহিনীর এইটুকুই সব নয়, তিনি দক্ষিণে কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি ভক্তিধর্ম ও শৈবধর্মকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই মিলনের মধ্য দিয়ে ভক্তিধর্ম ও প্রেমের ধর্ম উত্তর-ভারতে বিস্তৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি।

...প্রাচীন দ্রাবিড়েরা সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দু সভ্যতারূপে বিচিত্র ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে গান করিতে পারিত এবং গড়িতে পারিত। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবিনী শক্তির সংমিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ 'আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু।'

জাতীয় স্মৃতিতে অনেক হারানো কাহিনী কিংবদন্তি বা মিথ (myth) হালকা মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। যেমন শিবে রামে যুদ্ধ, শিবে কৃষ্ণে বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ এদের বেশ সুসংগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অভাব পাথুরে প্রমাণের, অভাব ছিদ্রহীন পারস্পরিক সংগতির। তা নইলে ইতিহাসের মন ওঠে না।

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'-প্রবন্ধের প্রথমার্ধের বক্তব্যের এইখানেই সমাপ্তি। পৌরাণিক কাহিনী যত দূর এগোতে পারে, এ-প্রবন্ধের প্রথমার্ধ তত দূর গিয়েছে। এ-পথ কবিকল্পনার পথ, কবিকল্পনার সত্য, ইতিহাসের সত্য, নয়। এই পর্যন্ত এসে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে অকুতোভয়ে প্রবেশ করেছেন অথবা প্রবেশ করতে চেষ্টা করছেন ভাব-গম্ভীর দর্শনের রাজ্যে। প্রবন্ধের নামে যদিও 'ইতিহাসের ধারা' কথাগুলি আছে, কিন্তু হঠাৎ ইতিহাসের ধারা পাঠান-মুঘল আসার উপক্রমেই বন্ধ হয়েছে। তার বদলে এসেছে উপনিষদ আর বেদান্ত দর্শনের কথা। যেন *রামায়ণ-মহাভারত*-এর উপকাহিনীগুলি সব অদ্বৈত-বেদান্তে পৌঁছোবার সরল মসৃণ রাজপথ।

জাতি-সংঘাত জিনিসটাকে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট ব্যাখ্যা করেননি। আর্য কি একটা জাতি? অথবা, অনার্যই কি একটা জাতি? এই জাতিতত্ত্ব কি নৃবিজ্ঞান-সম্মত?

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধবিপ্লবের কথা বলেছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাত কি জাতি-সংঘাত? ইসলামের শাসন এ-দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ-দেশে ইতিহাসের ধারা থেমে গিয়েছে? নিত্য ধাবমান ইতিহাস হঠাৎ ইসলামের অভিযানের ঠিক আগেই থেমে গেল কেন?

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে যেমন অনায়াসে ভারত-ইতিহাসের কথা বলতে বলতে হঠাৎ দর্শনের কথায় চলে গেলেন, তাতে মনে হয়, ইতিহাস নয়, প্রথম থেকেই সম্ভবত দর্শন তাঁর অভিপ্রেত আলোচ্য বিষয়।

ইতিহাসের কী এবং কেন নিয়ে একটা দর্শন আছে বটে। হেগেল থেকে মার্কস, কলিংউড থেকে কার, অনেকেই ইতিহাস ব্যাপারটাকে আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে ইতিহাস-তত্ত্ব বিষয়ে কিছু বলেননি। বলেছেন অদ্বয়তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব এবং জগৎতত্ত্ব বিষয়ে। মনে হয় এই বিশেষ ব্রহ্ম-তত্ত্বটি পাঠকের সামনে উপস্থিত করাই তাঁর আসল মনের কথা।

আরও অগ্রসর হওয়ার আগে এই কালের দুটি অতি বিখ্যাত কবিতার কথা এইখানেই সেরে নিতে চাই। দুটিই *গীতাঞ্জলি*-র। দুটির রচনাকালের মাঝখানে মাত্র একদিনের ব্যবধান। একটি 'ভারততীর্থ' ('হে মোর চিত্ত'), অপরটি 'অপমানিত' ('হে মোর দুর্ভাগা দেশ')। দুই-ই ১৯১০ সালের, বাংলা ১৩১৮। (আগেরটি ১৮ আষাঢ়, পরেরটি ২০ আষাঢ়)। কবিতাদুটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেমনই কম, ভাবের ব্যবধান তেমনই অতলস্পর্শ।

সময়ের এত অল্প ব্যবধানের মধ্যে কবিতাদুটির ভাব বা মুড(mood)-এর এমন বদল, ভাবনার এমন আকাশ-পাতাল দূরত্ব কল্পনা করাই কঠিন। 'ভারততীর্থ'-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ভারতবর্ষের ঐক্যবিধায়িনী শক্তির অর্থাৎ ভারতবর্ষ যেভাবে অনায়াসে আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান-শিখ — এই বহু-কে এক করেছে তার কৃতিত্ব-কে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন, তা আমাদের কিছু হতবাক করে দেয়। দ্বিতীয় বা 'হে মোর দুর্ভাগা *দেশ*' কবিতায় আমাদের অসাম্য ও এক হওয়ার অক্ষমতার জন্য আমাদের বেদনার্দ্র কণ্ঠে তিরস্কার করেছেন। এই বিপরীত ভাবনার দুটি কবিতাই কি সমান আন্তরিক?

'ভারততীর্থ' কবিতায় ভারতবর্ষ 'তপস্যাবলে একের অনলে/বহুরে আহুতি দিয়া/বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল/একটি বিরাট হিয়া'। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস খুললেই যা নজরে পড়ে তা এর বিপরীত। অর্থাৎ সর্বত্রই অনৈক্য, সর্বত্রই ভেদবুদ্ধি, সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগের

ভিত্তিতে কঠিন উচ্চ-নীচ (hierarchical) ভেদ। ভাবের ঘোরের মধ্যে না থাকলে তাঁর নিজের কথার অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর কানে বাজত।

'রণধারা বাহি জয়গান গাহি/উন্মাদ কলরবে/ভেদি মরুপথ গিরি-পর্বত/যারা এসেছিল সবে' — এদের কাউকে আমরা নিমন্ত্রণ করে আনিনি, সবাই এসেছে রক্তাক্ত তরোয়াল হাতে, কাউকেই আমরা ইচ্ছে করে বুকে নিইনি, আজও পারলে দূরেই রাখতাম। 'এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ' বলে ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই, সেও নিজের স্বার্থেই এসেছে।

দ্বিতীয় কবিতাটি অর্থাৎ 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতা লজ্জা ও অনুশোচনায় মাখা। ভারতবর্ষের একজন উচ্চবর্ণের বিশেষ সুবিধাভোগী মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই বেদনা ও লজ্জা পাঠকমাত্রকেই স্পর্শ করে।

'মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে', একদিন তোমাকে তার সমভূমিতে এসে দাঁড়াতে হবে। — 'দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে..'।

প্রথমটিতে যে-অসংকোচ আত্মপ্রসাদ, মনে হয় দ্বিতীয়টি যেন তাঁরই জন্য সসংকোচ আত্মগ্লানি। সঙ্গে বেদনাবোধও প্রভূত। বেদনার মূল কারণ তিনি প্রকাশ করে বলেননি। কিন্তু তা সকলের সুবিদিত। বেদনা ভারতবর্ষের যুদ্ধবিগ্রহে দুর্বলতার জন্য, আত্মরক্ষার অক্ষমতার জন্য।

অসাম্যই এই দুর্বলতার মূল কারণ। এইজন্য কি তিনি এত উচ্চকণ্ঠে ভারতবর্ষের মহান ঐক্যের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানেন আদিকাল থেকেই ভারতবর্ষের সমাজ অসাম্য তথা অনৈক্যের অনড় ছাঁদে গড়া। আগেই বলা হয়েছে, পরেও হয়তো আবার বলতে হবে, ভারতীয় সমাজ বিশেষ শ্রেণির সুখ-সুবিধার দিকে তাকিয়ে উচ্চ-নীচ স্তরবদ্ধভাবে সাজানো — যাকে বলা যায়— হাইয়্যারর্কিক্যাল (hierarchical) ছাঁদে সাজানো এবং এই ছাঁদ অত্যন্ত কঠিন। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ এই উচ্চ-নিচ বিন্যাসকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করে। অথচ এইটেই এ-সমাজের সীমাহীন দুর্বলতার কারণ। এই দুর্বলতাকে ঢাকবার কোনো উপায় নেই। বাক্চাতুর্য দিয়ে ঢাকতে গেলে তা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো বিড়ম্বনাকর হবে। তাই কি মুসলিম আমলে প্রবেশ করার মুখেই ইতিহাস ছেড়ে দর্শনে ঢুকে পড়লেন?

কিন্তু দর্শনেই বা তাঁর বক্তব্যের তেমন জোর কোথায়? এতক্ষণে আমরা আবার আমাদের পুরোনো প্রসঙ্গে অর্থাৎ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধের কথায় আসতে পারি। প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধ প্রধানত দর্শন-বিষয়ক। এই দর্শনের মূল কথা 'ভারততীর্থ' কবিতাতেই বলা হয়েছে। সে হচ্ছে অদ্বৈত-সাধন — 'তপস্যা বলে একের অনলে' বহু-কে আহুতি দেওয়ার কথা। ভারতবর্ষে অতি আদিম কাল থেকে আর্য ও অনার্য এসেছে, শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এসেছে। ভারতপন্থা হল এই বহু-কে এক করা — ভারতবর্ষ তাই করেছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে *মহাভারত* থেকে *গীতা* এবং বেদ থেকে বেদান্ত জন্মলাভ করেছে। এই বেদান্তে সব দ্বৈত মুছে গিয়ে এক অদ্বৈত সিদ্ধ হয়েছে। এই অদ্বৈতই বৈদান্তিক সাধনার লক্ষ্য। বেদান্ত দুই ধারার — এক ধারা নির্গুণ, অন্য ধারা সগুণ। এই সগুণ ধারার ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। ভারতবর্ষের আসল লক্ষ্যও এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

প্রবন্ধের শেষ অংশটি প্রত্যাশিত রকমের সবল নয়। বড়ো-ছোটো সব গোষ্ঠী মিলিয়ে

ভারতবর্ষে দর্শনের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে কিছু আছে লোকজীবনাশ্রয়ী, কিছু বৈদিক। অনেক আছে নিরীশ্বরবাদী, অনেক সেশ্বরবাদী। এর মধ্যে বৌদ্ধ আছে, জৈন আছে — কেউ উপেক্ষণীয় নয়। এক বৌদ্ধদের চারটি বড়ো ভাগ, উপ-বিভাগ অনেক। এই এত দর্শন-প্রস্থানের মধ্যে কোন্ যুক্তিতে নিজের পৈতৃক দর্শনটিকে বেছে নিলেন — সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব?

বৈদান্তিকদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বিখ্যাত — শঙ্করাচার্য, তাঁকে রবীন্দ্রনাথ কেন বাতিল করলেন, তা জানতে পারলাম না। সগুণবাদীরা অনেকেই বর্ণচোরা দ্বৈতবাদী। এই প্রশ্নটার মীমাংসা কী?

এইসব প্রশ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বোধ করি **অর্থহীন**। তার কারণ, বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ খুব ভেবেচিন্তে লেখা নয়। এবং রবীন্দ্রনাথ **দার্শনিক** খ্যাতির লোভেও এ-প্রবন্ধ লেখেননি। তা না-হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, *একের অনলে বহু-কে আহুতি* দেওয়ার অর্থ কী। বহু-কে একেবারে পুড়িয়ে ফেলেই কি **বাঞ্ছিত এক-কে** পাওয়া যায়, না বহু-র মধ্যেই এক-কে পাওয়া যায়।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি ইতিহাস নিয়ে বা ভারত-**ইতিহাসের** কোনো ব্যাখ্যা নিয়ে আর কিছু লেখেননি। তাঁর *রামায়ণ-মহাভারত*-এর মিথ্ (myth)-ব্যাখ্যার অসামান্যতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করব, কিন্তু ইতিহাসের পণ্ডিতজন বা মহাজন-স্বীকৃত পন্থায় তিনি কখনও এক-পা পথও চলেননি।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথকে কতখানি স্তম্ভিত ব্যথিত ও বিচলিত করেছিল, আমরা অনেকেই তার সঠিক সংবাদ রাখি না। এই হত্যাকাণ্ডটি রবীন্দ্র-জীবনে একটা প্রধান জল-বিভাজনরেখার মতো। এ-পারের দৃশ্যাবলির সঙ্গে ও-পারের দৃশ্যাবলির গভীর অমিল। ঘটনাটা যেন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলে দিল।

রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা না-হোক, যুদ্ধজয়ের পর ইংরেজ ভারতবর্ষকে একেবারে বঞ্চনা করবে না, বলার মতো কিছু একটা দেবেই। যুদ্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, এ-আশা মরীচিকা। কিন্তু অতি বড়ো দুঃস্বপ্নেও তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো একটা ঘটনা কল্পনা করতে পারেননি। এতকাল রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শক্তিগুলির কারোরই অপ্রীতিভাজন ছিলেন না। কিন্তু এই সময় যুদ্ধ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বিষয় নিয়ে দেশে দেশে ভাষণ দিয়ে বেড়াতে শুরু করলেন। এইসব ভাষণের ফলে শত্রু মিত্র সব দেশেরই অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন। এই সময় *Nationalism* (১৯১৭) বইটি লিখলেন। এরই মধ্যে বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপনা (১৯১৮)। বিশ্বভারতীর মূল কথাই হল — যেখানে সমগ্র বিশ্ব এক নীড়, মানুষ মাত্রেরই এক দেশ, তা হল বসুন্ধরা।

কিছুদিন আগে সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ বহুসম্মানিত 'স্যার' উপাধি পেয়েছেন (১৯০৫)। কলোনির মানুষের কাছে এটা কল্পনার অতীত সম্মান।

যুদ্ধশেষে শুরু হল ভারতব্যাপী আশাভঙ্গ। গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ এবং জনসাধারণ, ভিন্ন ভিন্ন কারণে সকলেই এই আশাভঙ্গের শরিক। এর মধ্যেই পাঞ্জাবে ভারত-সরকারের যে-নৃশংসতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেলেন, তার প্রতিবাদে গৌরবান্বিত 'স্যার' উপাধি তিনি পরিত্যাগ করলেন। আজ তার তাৎপর্য আমরা বুঝতেই পারব না।

ইংরেজ সম্পর্কে আকর্ষণ-বিকর্ষণের যে-উভয়বলতা সুদীর্ঘকাল ভারতবাসী লালন করে এসেছে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও তা চট করে যাওয়ার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে (১৯১৭) আমরা তার প্রমাণ পাব। রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের পূর্ণ পরিচয় পেলেন যুদ্ধের শেষে, বিশেষ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে (১৯১৯), যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি-ত্যাগ।

ইংরেজ সরকার পাঞ্জাবের সমস্ত সংবাদই চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল। তবু রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের খবর পেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড়োলাট চেম্‌স্‌ফোর্ড খোলা চিঠি দিয়ে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করলেন (৩০মে ১৯১৯)। জুন মাসে তিনি রম্যাঁ রলাঁর অনুরোধে স্বাধীনতাকামী সংঘের ঘোষণা স্বাক্ষর দিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে শিবির চিহ্নিত করে দিলেন।

ইংরেজ সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ ঘটল। বহুকালের একটা প্রীতিপূর্ণ মায়াবী গ্রন্থি উপাধিত্যাগের মধ্যে দিয়ে তিনি স্বহস্তে ছেদন করে দিলেন। তা নিয়ে নতুন করে কোনো প্রবন্ধ লিখলেন না বটে, কিন্তু তাঁর মনের কথাগুলি হারিয়ে গেল না। মনের উত্তাপ কেমন করে অভিশাপে রূপান্তরিত হয়, তা দেখতে পেলাম 'কালান্তর' প্রবন্ধে(১৯৩৩), 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।

যুদ্ধশেষে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়লেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আবর্তে — অসহযোগ আন্দোলনের ভারত-জোড়া ঘূর্ণিপাকে। অসহযোগ রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন না। বিশেষ করে শিক্ষায় তিনি সর্বজাতিক মিলনেরই প্রবক্তা। গান্ধিজির শিক্ষায় অসহযোগের আহ্বান রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ বিচলিত করেছিল। শুধু গান্ধিজির সঙ্গে নয়, গোটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে অসহযোগ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রবল মতবিরোধ।

এই মতবিরোধের সংঘর্ষে রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে কয়েকটি অসামান্য কিন্তু দেশবাসীর দ্বারা বহু-নিন্দিত প্রবন্ধ, যেমন 'শিক্ষার মিলন'(১৯২১), 'সত্যের আহ্বান'(১৯২১), 'চরকা'(১৯২৫)। এরা কেউ-ই ইতিহাসের প্রবন্ধ নয়, প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা যা দিয়ে ইতিহাস তৈরি হয়।

১৯৩৩ সালে, মোহভঙ্গের ঘটনা অর্থাৎ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার ১৪ বছর পর রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। খুব শান্ত কণ্ঠে এদেশে ইংরেজের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন। সেই সূত্রেই প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগের কথাও বললেন। ইংরেজ আগমনে যেসব আদর্শগত পরিবর্তন আমাদের ঘটল তা যুগান্তকারী। কিন্তু এক সময় ইংরেজের নখদন্ত প্রকটিত হয়ে পড়ল। এই প্রবন্ধে কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠায় 'ভারতবর্ষ'-এ তিন পর্বের অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিবৃত করলেন।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ইংরেজ বুঝি নব্য ইউরোপের চিত্তদূত। White Man's Burden বহন করাই বুঝি তার দায়িত্ব। 'কালান্তর' প্রবন্ধটি পড়লে রবীন্দ্রনাথের মোহ এবং মোহভঙ্গ দুয়ের সম্বন্ধেই আমাদের নির্ভুল ধারণা জন্মে। এই একটিই মাত্র রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। মুগ্ধ অবস্থার শেষ রচনা হল 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধ (১৯১৭), আর মোহভঙ্গের পরে প্রথম রচনা 'কালান্তর'। দুটিকে মিলিয়ে পড়লে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে এল। ইতিহাসের প্রবন্ধ লেখার সময় এটা

রবীন্দ্রনাথের নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখন যা লিখবেন, তাই-ই ভিন্ন অর্থে ঐতিহাসিক।

রবীন্দ্রনাথ ঘোর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবশ্যই। রবীন্দ্রভক্ত জাপানি কবি ইয়োন নোগুচি জাপানের চীন-আক্রমণ সমর্থন করে যে-চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, তার শেষ চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নোগুচিকে লেখেন, 'Wishing your people whom I love, not success, but remove'. (১৯৩৮)।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) অনেক দিক থেকে 'কালান্তর' প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তির মতো। এই শেষ জবানবন্দীতে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

জানি না, এই ঋষি-বাক্যে কতখানি আস্থা রাখতে পারব।

যেহেতু সময় নেই

অশোক মিত্র

কবি-সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রসদন-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে যতই ভিড় করুন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য খুব বেশি দিন আর টিকে থাকবে, তেমন ভরসা কম। প্রধানত মধ্যবিত্তরাই সাহিত্যের ধারক ও বাহক। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্তরাই বাংলা ভাষা সম্পর্কে আগ্রহ প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন। কলকাতা, এমনকী মফস্‌সলের, রাস্তাঘাটে কলকল করতে করতে যাওয়া ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক আলাপ কান পেতে শুনুন, একটিও আস্ত নিখুঁত বাংলা শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে না। ইংরেজির মিশেল, কখনও কখনও হিন্দিরও। মাতৃভাষা সম্পর্কে প্রগাঢ় হীনম্মন্যতা হৃদয়ের কন্দরে প্রবিষ্ট: বাংলা বলতে তাদের প্রায় লজ্জাবোধ, নেহাত মাঝে-মাঝে অপকৃষ্টজনদের সঙ্গে কথা বলতে ওই ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় বলেই তারা তা খানিকটা রপ্ত করতে বাধ্য হয়। তবে তাদের আশা, এবং আমাদের গুটিকয়েকজনের আশঙ্কা, এই হতকুচ্ছিত ঋতুর শিগগিরই অবসান ঘটবে, তথাকথিত ভদ্রসমাজ থেকে বাংলার ব্যবহার পুরোপুরি উঠে যাবে। বাঙালি সমাজের অভিজাত অংশ বিদেশি ভাষায় চিন্তা করতে, বিদেশি ভাষায় সেই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ইতিমধ্যেই রপ্ত হয়ে গেছেন, তবে বৃত্তির খাতিরে মাঝে-মাঝে তাঁদের বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হয়। সেই কারণে তাঁরা একটি সংকর ভাষা উৎপন্ন করেছেন। চারপাশে অহরহ বিবিধ অভিনব ধ্বনি উচ্চারিত হতে শুনি। বাংলা সংবাদপত্রে, ইদানীং প্রতি অনুচ্ছেদে, একটি বিচিত্র শব্দ ইদানীং ব্যবহৃত হচ্ছে : 'ইস্যু'। আট কোটি বাঙালির অন্তত সাত কোটি, কিংবা তারও বেশি, আমার ধারণা এই বিদেশি শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নন। হলে কী হবে, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত নিদান, বাঙালি সাংবাদিকদের নিদান, বাংলা রাজনৈতিক নেতাদের নিদান, এখন থেকে বাংলা ভাষাচর্চায় 'ইস্যু'-তরঙ্গ রুধিবে কে, হরে মুরারে হরে মুরারে। বাংলায় 'ইস্যু'-র চমৎকার-চমৎকার প্রতিশব্দ আছে : বিষয়, ব্যাপার, সমস্যা, প্রশ্ন; একটু চুঁড়লে আরও বেশ কয়েকটি সহজেই হাতের কাছে মিলবে। কিন্তু না, 'ইস্যু' না বললে, 'ইস্যু' না ব্যবহার করলে মধ্যবিত্ত ঠাঁট ঠিক বজায় থাকে না। গাঁয়ে-গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদারে খেটে-খাওয়া বাঙালি, হতদরিদ্র বাঙালি, ধুঁকেপুকে বেঁচে-থাকা বাঙালি শব্দটির অর্থ উদ্ধার করতে পারুক না পারুক, কিছু যায় আসে না। এক সনাতন বাংলা প্রবচন: 'নাচে কারা তারা তারা'। সামান্য লেখাপড়া জানা, আমি বলব অশিক্ষিত, মানুষজন নিজেদের মধ্যে 'ইস্যু' নিয়ে মাতোয়ারা, অন্যরা হতবুদ্ধি হয়ে দণ্ডায়মান কি না তা না ভাবলেও চলবে।

এবং সে জন্যই প্রায়ই আশঙ্কা হয় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা যে সম্পূর্ণ স্বত্বমুক্ত হল তার আর তেমন সার্থকতা নেই, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমা গণ্ডিতে নেই, কারণ এই ভূখণ্ডে, বাংলা ভাষা আস্তে-আস্তে বিলীন হয়ে যাবে, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তরা জীর্ণবস্ত্রের মতো তাঁদের একদা-মাতৃভাষা পরিত্যাগ করবেন। অন্যপক্ষে গরিবগুরবোদের মাতৃভাষায় দীক্ষিত-নন্দিত হওয়ার সুযোগই দেওয়া হবে না। জোর গুজব, শিগগিরই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের একেবারে গোড়া থেকে ইংরেজি ভাষাচর্চা শুরু হবে। বাংলা ভাষাও অবশ্য থাকবে; কিন্তু দুয়োরানিকে তেমন কেউ কোনোদিন রেয়াত করে না, রূপকথাতেও না, রূঢ় বাস্তব জীবনেও না। হয়তো

যে রাজনৈতিক ভূখণ্ডকে বাংলাদেশ বলে অভিহিত করা হয়, সেখানে বাংলা ভাষা টিকবে, পুষ্পিত হবে, রবীন্দ্রনাথ যুগের পর যুগ ধরে নন্দিত হবেন, নন্দিততর হবেন; তাতে আমাদের কী!

আদি কবিতার ভগ্নাংশ আর-একবার আওড়ানো : ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। আমাদের ভাষা বিনাশের পথে, বাংলা সাহিত্য নিয়ে ভাবনায় ডুবে যাওয়ার প্রয়োজন দ্রুত ফুরোবে, এমনকী মাতৃভাষা-অনুরাগের স্মৃতি পর্যন্ত, রাত্রির রজনীগন্ধার মতো, ধূল্যবলুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ আরও বেশি করে অনাদৃত। অথচ নিছক এই কারণেই সম্ভবত, আমাদের মধ্যে কারও কারও রবীন্দ্রনাথকে আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরার আকুতি। আর খুব বেশি সময় নেই, অবশিষ্ট যে-কটি প্রহর, আসুন, রবীন্দ্রনাথে নিবিষ্ট হই। প্রহর শেষের আলোয় রাঙা অসহনীয় চৈত্র মাস, সর্ব অর্থে আমাদের সর্বনাশ ঘনায়মান, শুধু এই সান্ত্বনা নিয়ে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি, শেষ লগ্ন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেতনার আস্তে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলেন।

যেহেতু প্রহর গুনছি, সময়ের আয়ু সংকীর্ণ হয়ে আসছে, সমগ্র রবীন্দ্রনাথে ডুবে যাওয়ার মতো বিলাসিতায় আমাদের অধিকার নেই। আমাদের বাছতে হবে, মনস্থির করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ রচনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। নিজের জন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি, আমার সিদ্ধান্ত অন্য কেউ হয়তো মানবেন, হয়তো বা মানবেন না, কিন্তু এটাই তো রুচির স্বাধীনতা, বিচারের স্বাধীনতা, অপরাপরের নির্বাচনকেও শ্রদ্ধা করব, শ্রদ্ধা করব এই আশা নিয়ে যে আমার নির্বাচনের সার্বভৌমত্বও তাঁরা মেনে নেবেন, তাঁরা তাঁদের পাঠে আবিষ্ট থাকবেন, আমাকে আমার মতো করে রবীন্দ্রনাথে অবগাহন করবার অনুমতি দান করবেন।

সময় নেই, ত্বরায় মনস্থির করতে হবে, সুতরাং আমি লোভ সংবরণ করব, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-চিঠিপত্রের বিরাট ব্যাপ্ত পর্বতমালার দিকে ফিরেও তাকাব না। আমার সুযোগ নেই, সময় নেই, আমাকে সংবৃত হতে হবে, আমি প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে বাছব তাঁর সৃষ্টির নির্যাস। তাঁর কাব্যের প্রতিটি তন্ত্রীতে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে মিশেছে যে স্বর্গীয় উপাদান, তা উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথকে পরিমাপের মধ্যে নিয়ে আসা অসম্ভব। যে সীমিত সময় আমার জন্য অপেক্ষমাণ, তার বেশির ভাগ কবিতাতে তাই ঢেলে দেব।

এখানেও আমাকে দ্বিতীয় স্তরবর্তী একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমি, কী আর করা, *চিত্রা, সোনার তরী, খেয়া, বলাকা, পূরবী*, ইত্যাদি গ্রন্থ দৃঢ়তার সঙ্গে পেরিয়ে এসে *মহুয়া* থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ-পনেরো বছরের কাব্যসৃষ্টিতে একনিষ্ঠ হব। আমাদের তো সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, 'আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা নিশীথবেলা' কিংবা 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা ভরা নদী ক্ষুর-ধারা' অথবা 'হেথা নয় হোথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে' কিংবা 'দুয়ার বাহিরে যেমন চাহিরে মনে হল যেন চিনি' নিয়ে বিস্তারিত-প্রলম্বিত হওয়ার সুযোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের শব্দনিক্কণ ও ছন্দশিঞ্জিনীতে যোজন-যোজন সময় জুড়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করব, সেই সৌভাগ্য অবসিত। অতি কুশ্রী ও অশ্লীল শোনায়, তা হলেও স্বীকারোক্তি না করে তো উপায় নেই, সম্যকরূপে সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিতে হবে। তাঁর জীবনের শেষ পর্বের কথা ভাবুন, দেহে বার্ধক্য জড় হয়ে এসেছে, বিভিন্ন রোগের পৌনঃপুনিক আক্রমণ, রবীন্দ্রনাথ তা হলেও সৃষ্টির উচ্ছ্বসিত স্রোতোধারায় নিজেকে বিচ্ছুরিত করতে উন্মুখ, অথচ শারীরিক সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না। তাই

মহুয়া-পরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ ভাষাব্যবহারে সীমিত ও সংযত হয়ে এসেছেন। সীমিত শব্দের সংহতিতে নিজেকে উদ্ভাসিত করবার মন্ত্র প্রয়োগ করে। কখনও শিথিল পয়ারে বা মাত্রাবৃত্তে, কখনও গদ্যছন্দে উপচার সাজানো, অন্তঃস্থিত ভাবনা-ঐশ্বর্যের এতটুকু ঘাটতি ঘটল না অথচ কাব্যসুষমার আশ্চর্য সমারোহ, সারণির পর সারণি জুড়ে, স্বল্পবাক সৃষ্টির সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা গভীর অতলতায় উত্তীর্ণ, যেমন ঘট ভরতে হয় না দেরি, সবাই জানে, উপচে পড়া জলের কথা বুঝবে না তো কেউ; যেমন 'দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রং, মন শুধু বলে; অসম্ভব এ অসম্ভব'; যেমন 'এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম'। হয়তো অভিযোগ উঠবে এটা আধুনিক বিকার, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পকর্ম ফেলে রেখে শেষ অধ্যায়ে মনোনিবেশ। পণ্ডিতেরা ধরে নিচ্ছি নাক কোঁচকাবেন, আমাকে ছাড়পত্র দিতে চাইবেন না।

আমার একটি বিনীত জবাবদিহি আছে। হ্যাঁ, 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে' অথবা 'ঈশাণের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে ছুটে আসে'-র মতো আশ্চর্য পঙ্‌ক্তি আমি বিসর্জন দিচ্ছি। সেই শব্দসম্ভারসুখ উপভোগ করতে পারলে বর্তে যেতাম। কিন্তু আমার যে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হয়ে গেছে, তাই নিজের প্রতি নির্মম না হয়ে উপায় নেই আমার। সম্ভবত শারীরিক অক্ষমতা হেতু রবীন্দ্রনাথকে শেষ জীবনে অল্পের মধ্যে বৃহৎকে আহ্বান করতে হয়েছিল, খুব কম কথা বলে অনেক কথা বলতে হয়েছিল। আমাদের ভাষা আর বাঁচবে না, বিশ্বায়নের অজুহাতে, রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জিত হবেন; এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের সারাৎসার তাঁর শেষ পর্বের কাব্য থেকে আহরণ করে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তৃপ্তির ও সন্তুষ্টির মধ্যে অবশ্যই ব্যবধান আছে, কিন্তু তৃপ্তির সম্পূর্ণতা যেহেতু আমার সীমালাঙ্ঘিত আয়ত্তের বাইরে, সংক্ষিপ্ততার মধ্যে অবৈকল্য খুঁজতে হবে। এবার পরবর্তী আকাঙ্ক্ষা এবার বিধৃত করব। শেষ পর্বের কবিতাপুঞ্জের পাশাপাশি আমি সমান শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে *গীতবিতান* পেড়ে বসব। *গীতবিতান*-এ অন্তর্ভুক্ত সাতশ-শো' গানে নিমজ্জিত হওয়ার সময় হয়তো আমাকে দেওয়া হবে না, রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে আমি আড়াইশো-তিনশো' গান বাছব। আমার সিদ্ধান্তের কারণ অন্য কিছু নয়, শারীরিক কারণে যেমন শেষের পর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অনুশাসনে বেঁধেছিলেন, ব্যাকরণিক কারণে সংগীত রচনার ক্ষেত্রেও তাঁকে অনুরূপ অনুশাসনে বাঁধা পড়তে হয়েছিল। কথার স্রোতস্বিনী তাঁর সত্তাকে ছিঁড়ে ফেলে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু সেই কথামালায় বাঁধন পরাতে হবে, কারণ সুরের সঙ্গে, তালের সঙ্গে, রাগের সঙ্গে এবং সীমিত বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করা প্রয়োজন। অনেক সময় এমনও হয়েছে হয়তো একই ভাবনা পাশাপাশি উন্মোচিত হচ্ছে কবিতার মধ্য দিয়ে ও গানের মধ্যবর্তিতায়। হয়তো একই দিনে, একই সন্ধ্যাতে একই ভাবনার তাগিদে গানের সঙ্গে প্রায়-প্রতিযোগিতায়, কবিতা রচিত হচ্ছে। কবিতায় উদ্‌বেল উচ্ছ্বাস, গানে তা অনেক সমাহিত। রবীন্দ্রনাথকে যদি ছুঁতে চাই, ছুঁয়ে-ছেনে দেখতে চাই, আমি কৃতসংকল্প, তাঁর গানের উপত্যকায় প্রধানত বিহার করে বেড়াব। এখানেও কিন্তু আমার নির্বাচনে পক্ষপাত, একচোখোমি। কিছু-কিছু পূজার গান অবশ্যই বাছব, তবে সেইসব গান যাদের প্রেমের গান বলে অভিহিত করতে এতটুকু বাধবে না। ব্রহ্মসংগীত ও স্বদেশি সংগীত স্বেচ্ছায়, কখনও হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সরিয়ে রাখব। আমার সময় নেই, আমি তো রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে চাই।

সেই নিবিড়তা 'প্রকৃতি' পর্বেও কবিতায় আছে। সম্ভবত লোকলজ্জাবশত রবীন্দ্রনাথ 'প্রেম' পর্বের কিছু কিছু 'পূজা' পর্বের গান অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাদের মধ্য থেকে আমি একটি-দুটি নিকষ প্রেমগীতিকা আবিষ্কার করে নেব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সীমিত বেষ্টনীর মধ্যে হৃদয়কে উপচে দিয়েছেন, ব্যাকরণের বেড়াজাল উপেক্ষা না করে। উপেক্ষা করার তাঁর উপায় নেই : যা তিনি বলতে চাইছেন, সুরধ্বনির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে চাইছেন, স্বল্প বৃত্তের মধ্যে, ব্যক্ত করতে হবে তা, নিজেকে তাই শাসনে সংহত করতে হচ্ছে তাঁকে। গানের বাঁধুনিতে কবিতা তাই মহত্ত্ব ছুঁয়েছে, প্রতিটি গানেই ছুঁয়েছে। আপন্ন সর্বনাশের মুখোমুখি আমার ডুবে যাওয়ার ভেসে যাওয়ার পরম সুযোগ।

অন্য একটি আবিষ্কারে চমকিত হতে হয়। শেষ পর্যায়ের কবিতার মতো, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গানও গার্হস্থ্য সাহজিকতায় অবতরণ করেছে। কবিতার ভাষা যেমন দৈনন্দিন মুখের ভাষার কাছাকাছি চলে এসেছে, গানও তেমনই এসেছে, তাঁর ব্যাকরণিক সমস্ত অনুশাসন সত্ত্বেও। উদাহারণস্বরূপ একটি আস্ত গান এখানে তুলে দিচ্ছি:

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই এমন মনের মতো ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন।।
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলহলে
মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন।।
ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় করে
তোরা দাঁড়াস নে ভিড় করে—
আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন
গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন।
অকূল অবকাশে যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
দে আমারে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ—
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন।।

বাংলা ভাষা এর চেয়ে আধুনিকতর আর কী হতে পারে? যাঁরা খুঁতখুঁতেপনায় আসক্ত, তাঁরা বড়োজোর 'যেথায়' ও 'আমারে' এই শব্দদ্বয় নিয়ে মৃদু আপত্তি তুলতে পারেন, কিন্তু গানের ব্যাকরণের নিগড় মেনে আধুনিক ভাষার এমন সমাবেশ এমনকী রবীন্দ্রত্তোরপর্বে, আদৌ পাওয়া যাবে? বিশেষ করে কান পেতে শুনুন : 'ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,... আকাশ নিবিড় করে/ তোরা দাঁড়াস নে ভিড় করে/ আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন/গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন।' এতাদৃশ আধুনিকতার সাহস রবীন্দ্রনাথই কি অন্য কোথাও দৃষ্টান্বিত করতে পেরেছেন। আর -একটি গানের কথা বলি, প্রায় শেষের দিকের

রচনা :

একদিন চিনে নেবে তারে,
তারে চিনে নেবে
অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা।।
সরে যাবে নবারুণ-আলোকে এই কালো অবগুণ্ঠন—
ঢেকে রবে না রবে না মায়াকুহেলীর মলিন আবরণ,
তারে চিনে নেবে।।
আজ গাঁথুক মালা সে গাঁথুক মালা,
তার দুখরজনীর অশ্রুমালা।
কখন দুয়ারে অতিথি আসিবে,
লবে তুলি মালাখানি ললাটে।
আজ জ্বালুক প্রদীপ চির-অপরিচিতা
পূর্ণপ্রকাশের লগন-লাগি—
চিনে নেবে।।'

গানটি আয়তনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নয়, কিন্তু সমগ্র চরণগুলির মধ্যে এখানেও মাত্র কয়েকটি শব্দ আধুনিকতার সংজ্ঞা সামান্য কষ্ট করে পেরোবে, 'লবে', 'লাগি', 'তুলি' এবং 'আসিবে'। রবীন্দ্রনাথ কবিতা তথা গানের শেষ পর্যায়ে শুধু সংহতই হননি, ঘরোয়াও হয়েছেন।

আপাতত: এই সঙ্গোপন রবীন্দ্রনাথেই আমার স্তম্ভিত হয়ে থাকা, নিমগ্ন হয়ে থাকা : 'কখনো ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারিধারে' কান পেতে শুনে বিদীর্ণহৃদয় হওয়া, কখনো 'পূর্ণিমানিশীথিনীসম নীরবতায়' নির্বাক হয়ে আসা, 'নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ারস্রোতে শুক্লরাতে চাঁদের' যে তরণী, তার সঙ্গে অকূলে ভেসে যাওয়া।

তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, আমার একান্ত হয়ে গেছেন তাঁকে নিয়ে আমার অহরহ ছলাকলারঙ্গ, দণ্ডের পর দণ্ড ধরে। দেবস্তান্তারকের ভূমিকা থেকেও আমি পিছিয়ে যাই না পর্যন্ত। আদিপর্বের রবীন্দ্রনাথকে মুখ ভেংচিয়ে মাঝে-মাঝে উচ্চারণ করি, 'তুমি আমাদের বাবা, তোমারে বাবা বলে যেন জানি, নত হয়ে যেন মানি, তুমি কোরো না, কোরো না ফোঁস'। অমন কোমল, নিটোল অনুরাগগীতি 'বারেক তোমায় শুধাবারে চাই, বিদায়কালে কী বল নাই', পালটে নিয়ে ব্যঙ্গ করি, 'বারেক তোমায় শুধাবারে চাই, বিদায়কালে কী বল ছাই'। কখনও রবীন্দ্রনাথকে ঈষৎ চিমটি কাটি : 'জাগিয়ে দিয়ে', 'লাগিয়ে দিয়ে', 'আগিয়ে দিয়ে' ইত্যাদির সঙ্গে মিল দেওয়ার পীড়নে তাঁর কি 'কাঁদনবাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে' ব্যবহার না করলেই চলত না?

রবীন্দ্রনাথে আমার অধিকার আছে বলেই তো এই অনধিকার চর্চায় সাহস পাই। আবার হঠাৎ মুগ্ধতায় মুহ্যমান হয়ে পড়ি : 'কুজনহীন কাননভূমি দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে, একেলা কোন পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে'। ছটি-সাতটি শব্দের হালকা ভিড়ে অন্তত তিনবার 'পথ' উচ্চারিত অথচ আমরা তো ক্লান্ত বোধ করি না, রবীন্দ্রনাথকে দুয়ো দিতে পারি না, আমরা পথ ও পথিকের পৌনঃপুনিক উল্লেখে এই নির্জন নিঃসঙ্গ পথের একাকিত্ব আরও গভীর করে যেন অনুভব করি।

মাঝে-মাঝে খোদার উপর খোদকারি করবার শখ জাগে।

'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি, তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি'।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আবদার জানাবার ইচ্ছে হয়, কেন তিনি ভাষা-ব্যবহারে আরও একটু আধুনিক হলেন না। মিল তো তুচ্ছ প্রসঙ্গ, কেন তিনি 'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলে' লিখলেন না? ভুলে থাকতে চাইলেও তো ভুলে থাকা যায় না। 'ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ, গান হবে সারা', সত্যের এই রূঢ়তা না মেনে তো উপায় নেই, এবং ভিতর থেকে উদ্‌গত আর্তনাদ, 'যতখন থাকি ভরে দিবে নাকি এ খেলার ভেলাটাই'...।

সান্ত্বনা, শুধু 'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া, আর কিছু নাহি জানে'। রবীন্দ্রনাথ থাকবেন না, আমরাও থাকব না, এবং বাংলা ভাষার অন্তর্জলি যাত্রা তো শুরু হয়েই গেছে। স্থিতধী হোন, আগামী দিনে কেউই তার দয়িতাকে আর সম্ভাষণ জানাবে না : 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস,/তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'।

বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত ও ইংরেজি

শিশিরকুমার দাশ

আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বড়ো ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স ন-বছর। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে পাঠশালায় পাঠানো হয়েছিল। চার বছর পাঠশালায় পড়ার পর শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন, একে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ইংরেজি বিদ্যার শিক্ষা দাও। ঠাকুরদাস ছেলেকে হিন্দু স্কুলে পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সে-ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়নি। অর্থাভাবই তার মূল কারণ। শেষপর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভরতি হলেন সংস্কৃত কলেজে। ঠাকুরদাসের ইচ্ছে ছিল সংস্কৃত শেখার। কিন্তু সে-আশাও তাঁর পূর্ণ হয়নি। ভাবলেন ছেলে সংস্কৃতই শিখুক। পরে গ্রামে এসে চতুষ্পাঠী খুলে বসবে। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শিখলেন ঠিকই, যদিও গ্রামে ফিরে গিয়ে চতুষ্পাঠী খোলেননি।

তখন সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার যৎসামান্য ব্যবস্থা অবশ্য ছিল। তবে ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে কতটা ইংরেজি শিখেছিলেন জানি না। সংস্কৃত কলেজের পাশেই হিন্দু কলেজ। সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষাও যেমন ভিন্ন, তেমনই ভিন্ন তাদের হাব-ভাব, ধরন-ধারণ। শুধু ইংরেজি নয়, তাঁরা ইংরেজিয়ানাও শিখছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার সমাপ্তির পর ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বেশ ভালোভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ইংরেজি কারও চেয়ে কম শেখেননি। তাঁর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই লিখেছেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত হইলেও, ইংরেজী শিক্ষার ব্যূহ বেষ্টনে আবদ্ধ ছিলেন। একদিকে হিন্দু কলেজের উন্মাদিনী শিক্ষা, অপর দিকে মিশনরী কলেজের মোহিনী মায়া; তদুপরি শক্তিশালী সাহেব সিবিলিয়নদের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা।...ইংরেজি শিক্ষার অপ্রতিহত ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়বান, মনস্বী ও তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র বিচলিত হইয়াছিলেন। অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন ইংরাজি না শিখিলে বর্তমান যুগে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দুঃসাধ্য'।[১]

'সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন'-এর উদ্দেশ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিখেছিলেন, এই ধারণা বিহারীলালের। তাঁর ধারণা বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত শিক্ষা এবং ইংরেজি শিক্ষার দুয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল। প্রথমটির ফলেই তিনি 'দেশীয় ভাব সংরক্ষণে সমর্থ' হয়েছিলেন। আর ইংরেজি শিক্ষার ফলে তিনি কখনও কখনও ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছেন। অর্থাৎ সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাব, ইংরেজি এবং ভ্রান্ত পথ এই সহজ সমীকরণ করেছিলেন বিহারীলাল।

কোন্ উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিখতে শুরু করেছিলেন সেসব অনুমানের মধ্যে না গিয়ে দেখা যেতে পারে যে ইংরেজি শিক্ষা তাঁর পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল তাঁর কর্মজীবনের প্রয়োজনে। একুশ বছর বয়সে যখন তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ঢোকেন, তখন তিনি এলেন সংস্কৃত কলেজ থেকে এক ভিন্ন ভাষাগত পরিবেশে। এখানে তিনি দেখলেন তাঁর ছাত্ররা সবাই ইংরেজ। অধিকাংশ সহকর্মী ইংরেজ। কয়েকজন ভারতীয় সহকর্মীও ছিলেন, তাঁরা কেউ হিন্দিভাষী, কেউ উর্দুভাষী, কেউ মারাঠিভাষী। এই বহুভাষার পরিবেশে ইংরেজি ছিল প্রধান ভাষা। বিদ্যাসাগর এখানে ইংরেজি-চর্চার প্রয়োজন বোধ করলেন। শুধু ইংরেজি

নয়, তিনি আরেকটি ভারতীয় ভাষার চর্চাও করলেন। ভারতীয় ভাষাটি হিন্দি। এখানে থাকার সময় বিদ্যাসাগর *বেতালপঞ্চবিংশতি* রচনা করেন। কোনো মৌলিক রচনা নয়। এটি অনুবাদ। সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর এটি অনুবাদ করলেন মূল সংস্কৃত থেকে নয়, হিন্দি অনুবাদ থেকে। কেন হঠাৎ হিন্দি থেকে এই অনুবাদ করলেন বিদ্যাসাগর, এ-প্রশ্নটা তুলেছিলেন বিহারীলাল। তিনি অবশ্য কোনো উত্তর দেননি। শুধু বলেছিলেন, 'এই সময় তিনি হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপই বোধহয় হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ'।[২] জানা দরকার যে কোনো গ্রন্থ অনুবাদ করা হবে তা ঠিক করার অধিকার ছিল না ভারতীয় শিক্ষকদের, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তা স্থির করতেন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। অতএব এ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের স্বাধীনতা ছিল কি না তাতে সন্দেহ আছে। তবে তিনি যে হিন্দি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন এতে তাঁর হিন্দি ভাষায় অধিকারের পরিচয় আছে নিঃসন্দেহে। শুধু হিন্দি থেকে নয়, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি মার্শম্যানের *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* বইটির অনুবাদ করেন। কলেজের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই বিদ্যাসাগর বিভিন্ন ভাষা, বিশেষ করে ইংরেজি-চর্চার গুরুত্ব অনুভব করছিলেন এ-সময়। এতে যদি তাঁর সংসারের কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকে তাতে কারও আপত্তি করার নেই। এ-সময় তিনি ইংরেজির চর্চা করছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সংস্কৃত-চর্চাও ছিল অব্যাহত। শ্যামাচরণ সরকার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইংরেজি-জানা বিখ্যাত বাঙালিরা এই সময়ই তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখছিলেন। এইসব বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রদের পড়ানোর অভিজ্ঞতায়, উদ্‌বুদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার সহজতর পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তার ফলই *উপক্রমণিকা* এবং *ব্যাকরণ-কৌমুদী*। আর সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি এইসব ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল মাতৃভাষার চর্চা।

যে-বিদ্যাসাগরকে আমরা চিনি, যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, যিনি বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন এবং নবীন চিন্তাধারার নায়কত্ব দিয়েছেন, এই তিনটি ভাষার — ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাংলা — প্রভাব ও পারস্পরিক সম্পর্ক-বিষয়ক সমস্যা বাদ দিয়ে তাঁকে বোঝা অসম্ভব। অবশ্য ইংরেজি-সংস্কৃত-বাংলা শিক্ষার সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবই শুধু নয়, এই তিন ভাষার সম্পর্কের সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমরা ঔপনিবেশিক কালের এবং তার চেয়েও বড়ো কথা আমাদের আজকের ভাষাগত পরিস্থিতিকেও কিছুটা সমস্যায়িত করতে পারব।

ভাষা তো শুধু সংবাদ-বিনিময়ের একটা মাধ্যম নয়, তা সমাজের আদর্শ নিরপেক্ষ যন্ত্রমাত্র নয়। তা বহু ইতিহাস ও বহু স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো; তা বিশেষ মূল্যবোধের বাহক; ভাষা একটি জাতি, একটি ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবেশদ্বারও বটে। আরও স্পষ্ট করে বললে, প্রত্যেকটি ভাষাই একটা স্বতন্ত্র ভাব-ভাবনা, বিশ্বাসের জগৎ, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা শেষপর্যন্ত বিভিন্ন ভাব-বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয়। সংস্কৃত একটি প্রাচীন ভাষা, সেই প্রাচীনত্বকে আমরা অনেকে বিশেষ গৌরব দিয়ে থাকি। এই গৌরবায়ন শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে : উইলিয়াম জোন্স যখন সংস্কৃতকে গ্রিক ও ল্যাটিনের সঙ্গে তুলনা করলেন, সংস্কৃতকে গ্রিক ও ল্যাটিনের চেয়ে সুগঠিত ও সমৃদ্ধ বললেন। প্রাচীন ভারত এবং প্রাচ্যতত্ত্ব গড়ে তোলার সবচেয়ে বড়ো উপকরণ এই সংস্কৃত ভাষা। বিদেশি সভ্যতা, বিদেশি শাসন যখন দম্ভের সঙ্গে উপনিবেশের মানুষকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব ঘোষণা করছে, যখন দেশীয় ভাষাগুলির তুলনায় একটি বিদেশি

ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করছেন শাসকবর্গ তখন সংস্কৃতের গৌরবায়ন ভারতীয়দের পক্ষে জাতীয় সম্মান রক্ষার একটি স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। সংস্কৃত শুধু প্রাচীন নয়, তা সমৃদ্ধ এবং তা যথার্থ ভারতীয়। সংস্কৃত পাঠ, সংস্কৃত চর্চা একদিকে শুধু সেই প্রাচীনের যোগরক্ষক সেতু এবং শুদ্ধ ইংরেজিয়ানা-বর্জিত ভারতীয়ত্বের প্রতীক, এইরকম একটা প্রতীতি আমাদের মনে কাজ করে চলছিল। এর রাজনৈতিক প্রকাশ কখনও কখনও প্রবল উগ্র। এর ভাবাদর্শগত প্রকাশও অতি স্পষ্ট, আমাদের সময় তার ব্যতিক্রম নয়।

সংস্কৃত যদি হয় ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সত্তার প্রকাশ, তা প্রাচীন, তা পবিত্র এবং ভারতীয়ত্বের প্রধান ভিত্তি; ইংরেজি দেখা দিয়েছিল আধুনিকতার প্রতীক হিসেবে। পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিরপেক্ষ এবং ভারতীয়ের শত্রু না হলেও প্রতিবন্ধক রূপে। সংস্কৃতের সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্রাহ্মণ্য শক্তি, ব্রাহ্মণ্য ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস : তার শক্তির উৎস ছিল প্রাচীনত্ব, স্মৃতি-শ্রুতি-পুরাণ। আর ইংরেজির সঙ্গে যুক্ত ছিল ইংল্যান্ডের সামরিক এবং বাণিজ্যিক প্রতাপ, সেই সঙ্গে অবশ্য স্বীকার্য যে, ইউরোপে উৎপাদিত জ্ঞান। সংস্কৃত ভাষায় যে-জ্ঞান সঞ্চিত ছিল, যে-জ্ঞান ধর্ম ও দর্শন বিষয়েই হোক, মানুষের দেহ বা প্রকৃতি-বিষয়কই হোক, এমনকী যে- সাহিত্য প্রস্তুত হয়েছিল সেই ভাষায় — তা সবই তখন আর চলন্ত, প্রবহমান নয়। তার অনেকটা মৃত বা সজীব নয়। এইসব মিলিয়ে সংস্কৃত শিক্ষার্থীর একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল আমাদের মনে। সেই ভাবমূর্তিতে মিশেছিল ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে একটা বোধ, ইংরেজ এবং ইংরেজিয়ানায় মুগ্ধ ভারতীয়দের বিপরীত এবং প্রতিবাদী একটি চরিত্র।

বিদ্যাসাগর তাঁর পোশাক-আশাকে ইংরেজি অনুকারী ভারতীয়দের বিপরীত এবং প্রতিবাদী চরিত্রটি সযত্নে সচেতনভাবে লালন করেছেন। চটি ও চাদর এই ভাবমূর্তির অন্যতম প্রধান উপকরণ। বাঙালি কবির উচ্ছ্বসিত উক্তির মধ্যে এই প্রতিবাদী চরিত্রের গৌরবায়ন :

সেই যে চটি — দেশী চটি— বুটের বাড়া ধন
খুঁজব তারে, আনব তারে এই আমাদের পণ।

বুট এবং চটি দুটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক বিশেষ। বাংলা সাহিত্যে বুট, রূঢ় ক্ষমতার, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের প্রতীকী উপকরণ হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। আর চটি বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীকী মর্যাদা যদি নাও পেয়ে থাকে, বিদ্যাসাগর তাকে প্রায় একটি রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় The Great Shoe Question প্রসঙ্গ।[৩] চটি জুতো পরে বিদ্যাসাগর গিয়েছিলেন বলে এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এর পক্ষে একটা পরিহাসই লক্ষণীয়। সেকালের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিতের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের জন্য বিশেষ 'ড্রেস কোড' পালনীয় ছিল। ১৮৭৪ সালের ২ জুলাই 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

> Pandit Isvar Chandra Vidyasagar, a native gentleman of learning, modesty and merit, who has rendered inestimable services to his fellow country-men, and whose reputation extends far beyond the bounds of Asia, complains that he is not allowed to enter the rooms of the Society with his Shoes—native shoes—on and the Council does not know precisely how to act in this matter.

'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' লিখেছিলেন, 'This shoe question had at one time assumed by no means a pleasant political character.'।

যখন বাঙালি সমাজে ইংরেজের পোশাক, পরিচ্ছদ, আহার, গৃহসজ্জা ইত্যাদির ব্যাপক অনুকরণ শুরু হয়েছিল (আজ যা আমাদের জীবনে সর্বাত্মকভাবে গৃহীত) তখন বিদ্যাসাগরের পোশাক ও পাদুকার যে-নির্বাচন তা কোন্ সচেতন রাজনীতি প্রণোদিত তা বলা কঠিন, কিন্তু এই ঘটনায় যে পোশাক-পরিচ্ছদের রাজনীতির সূত্রপাত তা অস্বীকার করা যাবে না।[৪]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন একদিকে চটিকে 'দেশী' অভিধা দিয়ে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ইঙ্গিত করেছেন, অন্যদিকে এই 'দেশী'-ত্বকে তিনি স্বতন্ত্র করে দেখেছেন শাস্ত্র-বিচারের নিষ্ফল ঐতিহ্য এবং আনুষ্ঠানিকতার বন্ধ্যাত্ব থেকে :

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ
তর্ক যাদের অর্ক ফলার তূমুল আন্দোলন
বিচার যাদের যুক্তি বিহীন অক্ষরে নির্ভর
সাগরের এটি চটি তারা দেখুক নিরন্তর।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যে-ঐতিহ্যগত পরিচ্ছদ ও কেশবিন্যাস তার একটিকে নিয়ে (অর্ক ফলা) সত্যেন্দ্রনাথ পরিহাস করেছেন। অর্থাৎ ঐতিহ্যের আনুগত্যমাত্রই মূল্যবান মনে করেননি তিনি, তাঁর মতে বিদ্যাসাগরের সাজসজ্জা শুধু আনুগত্যের প্রকাশ নয়, তার মধ্যে আছে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা।

ইংরেজি ভাষা-চর্চা যাঁরা করছিলেন তখন, তাঁদের অনেকেরই যে দেশীয় শিকড় শিথিল হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই; মেকলে যে-সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তা অনেকটাই সার্থক হয়েছিল। কিন্তু মেকলের স্বপ্ন যে শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি, ওই ইংরেজিশিক্ষিত সমাজ থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং জনআন্দোলনও গড়ে উঠেছিল, তার কারণ ছিল ভারতীয় মনীষীদের ইংরেজ ও ইংরেজিয়ানার পার্থক্য রচনার সামর্থ্য। আরও একটা কারণ ছিল যে সংস্কৃত ভাষা ও তার সঙ্গে জড়িত মূল্যবোধের সঙ্গে ভারতবর্ষের আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা। বিদ্যাসাগরের ভাষাচর্চা এই আধুনিকতা বোধের কেন্দ্রে অবস্থিত।

২.

সমালোচক মহল বিদ্যাসাগরের ইংরেজি রচনার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। হয়তো বিদ্যাসাগরের ইংরেজি রচনা কথাটা শুনে অনেকে একটু কৌতুক বোধ করতে পারেন। বিদ্যাসাগরের ইংরেজি রচনা অবশ্য আয়তনে বিপুল নয়, বিচিত্র তো নয়ই, এমনকী তা তাঁর রচনাবলির অন্তর্গতও নয়। কিন্তু তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রধান মনীষীরা দ্বিভাষিক : ইংরেজি ও বাংলা দু-ভাষাতেই তাঁরা রচনা করেছেন। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। এঁদের প্রত্যেকের ইংরেজি রচনা গুরুত্বপূর্ণ। কারও কারও ইংরেজি রচনার পরিমাণ বিপুল। বিদ্যাসাগর ইংরেজিতে কখনও ভাষণ দেননি, ইংরেজিতে বই লেখেননি (সম্ভবত বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন)।[৫] সেদিক থেকে তিনি উক্ত মনীষীদের থেকে পৃথক। কিন্তু সমস্ত জীবন তাঁকে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার করতে হয়েছিল এবং সেইসব রচনাগুলিতে তাঁর চিন্তাভাবনা দৃষ্টিভঙ্গির নানা পরিচয় পরিকীর্ণ হয়ে আছে। এই রচনাগুলি সবই চিঠিপত্র অথবা রিপোর্ট।[৬]

এইসব চিঠিপত্র ও রিপোর্টের কোনো কোনোটি পাঠক-পাঠিকা মহলে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত। কতকগুলি বিখ্যাত মন্তব্য, যেমন সাংখ্য ও বেদান্ত দুই-ই ভ্রান্ত দর্শন। এইসব চিঠিপত্রেরই অন্তর্গত। কিন্তু বিশেষভাবে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি রচনাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয় এখনও পর্যন্ত কেউ করেননি। তাই এ-বিষয়ে দু একটি মন্তব্য করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিদ্যাসাগরের প্রথম ইংরেজি লেখা কোন্‌টি তা বলতে পারব না। ২৮ মার্চ ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে চাকরির আবেদন করেন। সম্ভবত এটিই বিদ্যাসাগরের সংরক্ষিত এবং প্রাপ্তব্য রচনার মধ্যে প্রথম।[৭] ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অধিকাংশ বাঙালি যুবকের কাছে ইংরেজির প্রাথমিক, হয়তো-বা একমাত্র প্রয়োজন ছিল জীবিকাগত। চাকরির আবেদনপত্রটি যদি হয় বিদ্যাসাগরের অন্যতম প্রথম ইংরেজি রচনা তাতে ইতিহাসের পরিহাস জড়িয়ে আছে সন্দেহ নেই। এই আবেদনে একটা আত্মপরিচয় আছে, যেমন থাকে চাকরির আবেদনে। বিদ্যাসাগরের এই প্রথম 'আত্মকথা'-র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

> As regards my qualifications, I beg to observe that I had the honour to be educated in the above institution (অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজ) where I was fortunate enough to obtain many honour and distinctions. Besides I have the honour to hold the office of Sheristadar of the Bengalee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the system of Sankhya philosophy and the Puranas, branches which do not fall within the regular course of education afforded by your college .[৮]

এই আবেদন গ্রাহ্য হয়েছিল, বিদ্যাসাগর চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন কাজ করতে পারেননি। সেক্রেটারি রসময় দত্তের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে বিদ্যাসাগর চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। পদত্যাগপত্রটি বিদ্যাসাগরের প্রথম দীর্ঘ ইংরেজি রচনা। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর যোগ দিয়েছিলেন এই আশায় যে তিনি কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনতে পারবেন। তাঁর প্রস্তাবগুলি রসময় দত্ত গ্রাহ্য করেননি। বিদ্যাসাগর এই পদত্যাগপত্রে লিখেছিলেন :

> I studied the Sanskrit language and literature in the Government Sanskrit College and there imbibed my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feeling and without any other strong motive, I applied for the appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the persuit of effectual study and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace superadded I thought it high time to resign.

বিস্তারিতভাবে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা এবং উপরওয়ালার বাধা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই ব্যর্থতাবোধ ছাড়াও তিনি যোগ করেছেন আত্মসম্মানের কথা। বিদ্যাসাগর চাকরি ছেড়ে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা চলে। হিন্দু কলেজ ছিল শুধু ইংরেজি-চর্চার নয়, ইংরেজিয়ানারও দম্ভ। বিদেশি রাজশক্তির দম্ভ ও আধিপত্যের সংস্পর্শও লেগেছিল তার সঙ্গে। অন্তত বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা তাই। সংস্কৃত কলেজে সহকারী সেক্রেটারি থাকার সময়ে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে তাঁর একটি সংঘাত বাধে। এ-ঘটনাও জুতো-কেন্দ্রিক, সকলেরই জানা। কার বিদ্যাসাগরকে বসতে বলেননি, নিজে চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের উপর পা তুলে বসেছিলেন। কিছুদিন পরে কার সাহেব কোনো কারণে বিদ্যাসাগরের ঘরে আসেন, তখন বিদ্যাসাগর টেবিলের উপর চটিশুদ্ধ পা তুলে বসে বসে সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ক্ষুব্ধ কার সাহেব এই আচরণের প্রতিবাদ করেন, উপরওয়ালা বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ত দাবি করলে বিদ্যাসাগর বলেন, অভ্যর্থনা করার এই সভ্য রীতি তিনি কার সাহেবের কাছে শিখেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের সম্পর্কের মধ্যেও একটা বর্ণবিদ্বেষ বা জাতিবৈরতার ক্ষীণ বীজ উপ্ত হয়েছিল। ভারতীয় পণ্ডিতকে অসম্মান করার অসৌজন্য ইংরেজ অধ্যক্ষকে বিচলিত করেনি। তাই ধুতি-চাদর-চটি পরা ভারতীয় শেষপর্যন্ত তার প্রতিবাদ করেছেন তীব্র ভাষায়, সে-ভাষা বাংলা বা সংস্কৃত নয়, ইংরেজিও নয়, ইংরেজি ভদ্রতার প্যারডি।

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করব। এই ঘটনাটি তেমন পরিচিত নয়। এর উল্লেখ আছে বিদ্যাসাগরের ইস্তফাপত্রে। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ প্রায়ই সংস্কৃত কলেজ থেকে টুল ও ডেস্ক ধার নিতেন তাঁদের কলেজের পরীক্ষার সময়। তিন-চারদিন ধরে পরীক্ষা চলত। এই সময় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বসতে হত মাটিতে। এ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য শোনা যাক, তাঁর নিজের ভাষায় :

> ...some of our students are obliged to sit on the ground and it must be remembered the rooms are not matted. This irregularity has been frequently reported to you (অর্থাৎ রসময় দত্ত) and although you have frequently promised to take efficient steps for putting a stop to such unjust interference yet you do not appear to have taken any such steps either because you approve of such contact or because you are not impressed with the inconvenience and unseemliness of our half of a class sitting on the bare ground whilst the other half sits on stools. Such a disregard of the comfort of the students and the *right of the institutions* is to me highly distasteful.[৯]

হিন্দু কলেজের সঙ্গে আর-একবার ঝগড়া বেধেছিল বিদ্যাসাগরের, তার বিবরণ পাওয়া যাবে এফ. জে. মোয়াটের কাছে লেখা ২৮ আগস্ট ১৮৫২ তারিখের চিঠিতে।[১০]

হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের কয়েকটি ছেলে ২৬ আগস্ট সংস্কৃত কলেজের ছোটো ছেলেদের মারধর করে। দু-দিন পরে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে হিন্দু কলেজের এক ছাত্র তার

কয়েকজন সঙ্গীসাথিকে নিয়ে এসে আবার সংস্কৃত কলেজে চড়াও হয় এবং ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়। এর দু-দিন পরে কলেজ ছুটির পর তিনজন ইউরোপীয় নাবিককে দেখা যায় কলেজের গেটের ধারে। হিন্দু কলেজের ছেলেরা তাদের ভাড়া করে এনেছিল সংস্কৃত কলেজের ছেলেদের পেটাবার জন্য। এই নিয়ে বেশ হইচই হয়। শেষপর্যন্ত একটা 'এনকোয়ারি'ও হয়।

মূল ব্যাপারটা হল এই যে সাহেবই হোক বা ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয় বা ভারতীয় ছাত্রই হোক, যাঁরা সংস্কৃত কলেজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করেছে, বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মান বোধ, (যার শিকড় প্রোথিত ছিল তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে) আহত হয়েছে এবং বিদ্যাসাগর উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য সহজে মেনে নেননি। কিন্তু ঐতিহ্য বা পরম্পরাকে অন্ধভাবে মানতে তিনি রাজি হননি। সেখানে কি তাঁর ইংরেজি শিক্ষার কোনো প্রভাব ছিল না তাঁর চিন্তায়?

৩.

কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফিরে গেলেন। ১৮৫০ সালে ফিরে এলেন সংস্কৃত কলেজে প্রথমে অধ্যাপক এবং পরে প্রিন্সিপাল হয়ে (রসময় দত্তের পদত্যাগের পর সেক্রেটারি পদ লুপ্ত হয়ে প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টি হয়)। এই সময় তিনি কলেজ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন (১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০)। এই রিপোর্ট এবং দু-বছর পরে লেখা (১২ এপ্রিল ১৮৫২) 'Notes on the Sanskrit College' নামে একটি প্রস্তাব— দুটিই দীর্ঘ প্রবন্ধবিশেষ। প্রথম চিঠির বিষয় হল সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি।

বিদ্যাসাগর বলছেন সংস্কৃত কঠিন ভাষা, ব্যাকরণশিক্ষার সুসম্বদ্ধ পদ্ধতির অভাবে সংস্কৃত শিক্ষা কঠিনতর হয়ে ওঠে। পাঁচ বছর ধরে ছাত্ররা কিছু না বুঝে *মুগ্ধবোধ* পড়ে যায় অর্থাৎ পাঁচটি বছর বৃথা যায়। *মুগ্ধবোধ*, *ধাতুপাঠ*, *অমরকোষ*, *ভট্টিকাব্য* কোনোটিই সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সহায়ক নয়। অতএব চাই নতুন পদ্ধতি।

বিদ্যাসাগরের মতে সোজাসুজি সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়িয়ে, ছাত্রদের পড়াতে হবে সহজ বাংলায় ব্যাকরণের মূলসূত্র। সম্পাদনা করতে হবে কয়েকটি 'রিডার'—এগুলি হবে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে, যেমন *পঞ্চতন্ত্র*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* ইত্যাদি সংকলন। এইভাবে চলবে দু-বছর পড়া। তার পর তারা পড়বে *সিদ্ধান্তকৌমুদী*; তার সঙ্গে চলবে *রঘুবংশ*, ভট্টিকাব্য-এর সংকলন, *দশকুমারচরিত*। এর ফলে এক বছর সময় বাঁচবে। পড়াশোনা হবে নিয়মিত এবং মনোরম।

ব্যাকরণশ্রেণির পর বিদ্যাসাগর বললেন সাহিত্যশ্রেণির কথা। এর পাঠ্যকাল ছিল দু-বছর, পড়তে হত *রঘুবংশ*, *কুমারসম্ভব*, *মেঘদূত*, *নৈষধচরিত*, *কিরাতার্জুনীয়*, *শিশুপালবধ*, *বিক্রমোর্বশী*, *রত্নাবলী*, *মুদ্রারাক্ষস*, *উত্তরচরিত*, *দশকুমারচরিত* এবং *কাদম্বরী*। এই অংশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ বিদ্যাসাগর এখানে প্রত্যেকটি গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। যেমন, 'Meghaduta is a poem in 118 slokas. A Yaksha or demi-god, having excited the wrath of his master Kuvera, the god of wealth, was doomed by the curse of the master deity to remain in a state of separation; away from his beloved life in a distant land, for the full length of one year. The love in his distressed condition addresses a cloud, to bear his message to his wife, at Alaka, the capital.' *নৈষধচরিত* হল 'the adventures of Nalaraja from the

subject matter of Naisadha'. আর *মুদ্রারাক্ষস*? 'Mudrarakshasa, by Vishakhadatta, may be called a political drama'. আর *কাদম্বরী*— 'is a novel or rather an epic poem in prose'. এই দুটি শব্দ political drama এবং novel সচকিত করে তোলার মতো। তখনও আমাদের সমালোচনার কোনো পরিভাষা গড়ে ওঠেনি, অথচ বিদ্যাসাগর ব্যবহার করছেন ইংরেজি সমালোচনার পরিভাষা। নভেল বা উপন্যাস এখনও দেখা দেয়নি আমাদের সাহিত্যে। কিন্তু বিদ্যাসাগর একটি সংস্কৃত গদ্যকাব্যকে 'নভেল' আখ্যা দিতে দ্বিধা করছেন না।

প্রকৃতপক্ষে যেভাবে বিদ্যাসাগর তেরোটি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় দিয়েছেন এবং মধ্যে মধ্যে তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন তাতে মনে হয় এই রিপোর্টটি তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩)-এর খসড়া। এই গ্রন্থটির সঙ্গে এই রিপোর্টটি মিলিয়ে পড়লে সংস্কৃত বিদ্যা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নতুন চিন্তাধারার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জ্যোতিষ আর গণিত পড়ানো হত সংস্কৃত কলেজে। লীলা এবং বীজগণিতও পড়ানো হত। বিদ্যাসাগর ছিলেন এর বিরোধী। তিনি চাইছিলেন ইংরেজি পদ্ধতিতে অঙ্ক ও বীজগণিত পড়ানো হোক। পাঠ্যক্রমে আনতে হবে ইংরেজি বই। এইভাবে আধুনিকায়িত করতে হবে সংস্কৃত-চর্চার। আর ইংরেজি বইগুলিকে পাঠক্রমে ঢোকাতে হবে অনুবাদের মাধ্যমে। সংস্কৃত বিদ্যার পরিবর্তনের জন্য দরকার ইংরেজি, আর সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার মাধ্যম হবে বাংলা।

এই মনোভাব আরও স্পষ্ট সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র বিভাগের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণের প্রস্তাবে। তিনি বলছেন বই চাই, নতুন বই, এবং বইগুলি হবে বাংলায়। ব্যাকরণ বিভাগের চতুর্থ শ্রেণির জন্য চাই পশু-বিষয়ক মনোরঞ্জনী গল্প, তৃতীয় শ্রেণির জন্য জ্ঞানের কথা (চেম্বার্সের বই তাঁর আদর্শ), দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নীতি (সেখানেও আদর্শ চেম্বার্স) আর প্রথম শ্রেণির জন্য বিজ্ঞান, যেমন মুদ্রণ, চুম্বক, ভূমিকম্প, পিরামিড, মৌমাছি ইত্যাদি। সাহিত্য-শ্রেণির ছাত্রদের জন্যও চাই চেম্বার্সের নানা বই, আর সেই সঙ্গে অনূদিত গ্রন্থ; যেমন *টেলিমেকাস, রাসেলাস* এবং *মহাভারত*। অলংকারশ্রেণির জন্য চাই নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক প্রবন্ধ এবং natural philosophy অর্থাৎ বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা। দেখতে পাচ্ছি বিদ্যাসাগরের প্রধান রচনা, *কথামালা, বোধোদয়, জীবনচরিত*, এমনকী *মহাভারত*-এর অনুবাদ সবই এই পরিকল্পনার রূপায়ণ।

সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি-র ক্লাস সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগরের কিছু বক্তব্য আছে। তখন পড়ানো হত *মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, বিবাদ চিন্তামণি, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা* এবং রঘুনন্দনের *অষ্টবিংশতি তত্ত্ব*। বিদ্যাসাগর শেষোক্ত গ্রন্থগুলি বাদ দিতে চান, কারণ 'though they are of use to the Brahmins as a class of priests, they are not at all fitted for an academical course' অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষাকে বিদ্যাসাগর চাইছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কুক্ষি থেকে মুক্ত করতে, ধর্মনিরপেক্ষ করতে।

ন্যায়শ্রেণির পাঠ্যক্রম সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগরের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যে-সব গ্রন্থ পড়ানো হত তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিয়েছেন। সেই পরিচয়গুলি তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এর পরিশিষ্ট হতে পারত। উদয়নাচার্যের *কুসুমাঞ্জলি* সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলছেন যে এই গ্রন্থ 'treats of the existence of the deity and that of a

future state. The line of argumentation on the whole is similar to what is to be found in modern European works on the same subject.'। সেইরকমই গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের *অনুমান চিন্তামণি* সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলছেন, 'His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle ages of Europe. This treatise is what Bacon would call a "cobweb of leaning".' এইসব মন্তব্য ঐতিহ্যানুগত কোনো সংস্কৃত বিদ্বানের নয়, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত এক সংস্কৃত পণ্ডিতের। রঘুনাথ শিরোমণি, যাঁকে নিয়ে বাংলার গর্বের শেষ নেই তাঁর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য : 'he is the dictator in the modern Nyaya, a school of philosophy learning', তার আর-একটি উদাহরণমাত্র।

হিন্দু দর্শন চিন্তা, তাঁর মতে আধুনিক কালের উন্নত চিন্তাধারার (advanced ideas of modern times) সঙ্গে মেলে না, তবু একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের তার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। আর যখন ছাত্রদের যথেষ্ট ইংরেজি জ্ঞান হবে (অর্থাৎ ইংরেজি জ্ঞান ছাত্রদের হওয়া যে প্রয়োজন সে-কথা বিদ্যাসাগর ভাবছিলেন) তখন ইউরোপের আধুনিক দর্শন পড়তে পারে। তখন, বিদ্যাসাগরের ভাষায়, 'they shall have an ample opportunity of comparing the systems of philosophy of their own with the new philosophy of the Western world. Young men thus educated will be better able *to expose the errors of ancient Hindu philosophy* (বক্কিমিকরণ আমার) than if they were of derive their knowledge of philosophy simply from European sources.'

হিন্দু দর্শনের মধ্যে অনেক ভ্রান্তি আছে আর সেই ভ্রান্তি দূর হতে পারে ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা— এই ধরনের চিন্তার প্রেরণা বিদ্যাসাগর পেলেন কোথায়? কিন্তু দর্শন-চর্চায় মীমাংসাকে বাদ দিতে চেয়েছেন কারণ তাঁর মধ্যে মীমাংসা শুধু 'rule of religious ceremonies' আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ বেশি নয়। কিন্তু সাংখ্য, পাতঞ্জল পড়া দরকার, কারণ ছাত্ররা তাদের ভ্রান্তিগুলি দেখুক : আর এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ধারণা ইউরোপীয় দর্শনের জ্ঞানের মূল্য অসামান্য। 'His knowledge of European philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.'

এই সঙ্গে বিদ্যাসাগর ইংরেজি-চর্চারও একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন। ইংরেজি শিক্ষার সুব্যবস্থাও করতে হবে, তা হলেই সংস্কৃত কলেজ হবে সংস্কৃত বিদ্যার পীঠস্থান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, কারণ বিদ্যাসাগর স্বপ্ন দেখছিলেন এক নতুন বাংলা সাহিত্যের। সংস্কৃত কলেজ হবে 'a nursery of improved vernacular literature and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen.'

সংস্কৃত কলেজ তা হলে শুধু সংস্কৃত নয়, সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলার ত্রিবেণীসংগম। তার উদ্দেশ্য একটা Vernacular literature তৈরি আর সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রচার।

৪.

আমি কি বেশি উৎসাহে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি রচনাটির মধ্যে এমন সব চিন্তাভাবনা আবিষ্কার করতে চাচ্ছি যা বিদ্যাসাগরের নয়? কিংবা এত বেশি জোর দিয়ে তিনি এসব কথা বলেননি? তিনি শুধু সংস্কৃত বিদ্যার পুনর্গঠনের কথাই বলেছেন, তার বেশি গুরুত্ব দিলে ভুল করা হবে।

তা হলে ১২ এপ্রিল ১৮৫২ সালের দীর্ঘ রিপোর্টটি একবার দেখা যাক।[১১] এর শুরু হচ্ছে এইভাবে :

1. The creation of an enlightend Bengali literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.
2. Such a literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect materials from European sources and to dress them in elegant, expressive idiomatic Bengali.
3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali Style cannot be at the command of those who are not good Sanskrit scholars. Hence the necessity of making Sanskrit scholars well versed in the English language and literature.

শুধু সংস্কৃত শিক্ষা নয়, এই প্রবন্ধের প্রথম বাক্যেই আছে, বঙ্গীয় শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য হবে উন্নত দীপ্ত বাংলা সাহিত্য রচনা। আর তা করা সম্ভব সংস্কৃত পড়ুয়াদের পক্ষেই, তবে তার জন্য দরকার ইংরেজির জ্ঞান। লক্ষণীয় যে যাত্রাপথ হবে সংস্কৃত থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে সংস্কৃত নয়। কারণ ইংরেজি - পড়ুয়ারা so much anglicized যে তারা এই নতুন সাহিত্য গড়তে পরবে না।

বিদ্যাসাগর যা চেয়েছিলেন বা যা ভেবেছিলেন তা হয়নি। নতুন বাংলা সাহিত্যের রূপান্তরে সংস্কৃত পড়ুয়ারা নায়কত্ব দেননি। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য অস্বীকৃত হয়নি। মাইকেল কিংবা বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র কিংবা বিহারীলাল, হরপ্রসাদ কিংবা রামেন্দ্রসুন্দর সকলেই দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে পশ্চিমি ঐতিহ্যের সম্পর্ক রচনার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। তাঁদের সকলেরই সমস্যা ছিল ইংরেজি ও ইংরেজিয়ানার মতোই সংস্কৃত ও সংস্কৃতয়ানার টানাপোড়েন। বাংলা সাহিত্যের চরিত্র তৈরি হচ্ছিল এই দুই ভাষা ও সংস্কৃতিতে নিয়ে, তাদের সঙ্গে জড়িত মূল্যবোধ নিয়ে। বিদ্যাসাগর যে-কথাটি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তা হল মাতৃভাষার বিকাশে একদিকে সংস্কৃত ও অন্যদিকে ইংরেজির ভূমিকা। ইংরেজির গৌরবায়নে সাংসারিক লাভ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব, কিন্তু তা আত্মগৌরবের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, আবার ইংরেজি-বর্জনেও আছে প্রাদেশিকতার আত্মতৃপ্তি, বিশ্ববিচ্ছিন্ন কূপ-বিলাস। বিদ্যাসাগর চাইছিলেন বাংলা এবং বাঙালি যুক্ত হোক বৃহত্তর জগতের সঙ্গে। সংস্কৃতবিদ্যার পুনর্গঠনে ইংরেজির ভূমিকা এবং শেষপর্যন্ত বাংলা সাহিত্য গঠনে সংস্কৃতের ভূমিকা তার প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য।

৫.

১৮৫৩ সালে কাশীর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জে. আর. ব্যালান্টাইন সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে Council of Education-এর সেক্রেটারিকে একটি বড়ো চিঠি দেন। তাতে

কিছু পরামর্শ ছিল, ছিল কিছু তাত্ত্বিক প্রশ্ন, আর পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন বিষয়ে কিছু মতামত। দীর্ঘ চিঠির দীর্ঘ উত্তর দেন বিদ্যাসাগর। নানা কারণে এটি একটি ঐতিহাসিক চিঠি।[১২] বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিদ্বান মহলে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, সে-ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যে-ব্যাপারটির প্রতি একটু জোর দিতে চাই তা হল বিদ্যাসাগরের যেমন ইংরেজিয়ানার প্রতি ধিক্কার, তেমনই বিরাগ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে। এই চিঠিতেই আছে সেই বিখ্যাত উক্তি, নানা কারণে আমাদের বাধ্য হয়ে বেদান্ত ও সাংখ্য - দর্শন পড়াতে হয়। দুই দর্শনই যে ভ্রান্ত দর্শন (false systems of philosophy) সে-ব্যাপারে আর কোনো বিতর্কই নেই। আর সেজন্যই দরকার এইসব ভ্রান্ত চিন্তার প্রতিষেধক। বিদ্যাসাগরের মতে ইংরেজির পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে এইসব ভ্রান্ত চিন্তার প্রভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যে-কোনো ইংরেজি বই তার উপযোগী নয়।

বিদ্যাসাগর বললেন বিশপ বার্কলের *এনকোয়ারি* বইটি পড়ানো ঠিক হবে না, কারণ এখানে যেসব চিন্তা তা ওই সাংখ্য ও বেদান্তের চিন্তার অনুরূপ, আর ভারতীয় ছাত্ররা সাহেবের লেখায় ভারতীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন দেখলে শ্রদ্ধায় গলে পড়বেন। এখানে বলা দরকার ব্যালান্টাইন সাহেব বার্কলের *এনকোয়ারি*-র একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন তাঁর সংস্করণটি পাঠ্য করা হোক।

ওই চিঠির গোড়ায় বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অবস্থায় আমার মতে, মিল-এর রচনা পাঠ অপরিহার্য। এ-প্রসঙ্গেও বলা দরকার যে ব্যালান্টাইন সাহেব মিল-এর তর্কশাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্তসার (নোট বই?) প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই বইটি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এতেও আপত্তি তুলেছিলেন বিদ্যাসাগর।

ব্যালান্টাইন চাইছিলেন যে সংস্কৃত কলেজের উদ্দেশ্য হবে এমন একদল ছাত্র তৈরি করা যারা দেখাবে যে হিন্দুরা যেসব প্রাথমিক সত্য উপলব্ধি করেছেন তা কীভাবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের তাতে সন্দেহ ছিল। প্রথমত বহু ব্যাপারেই ভারতীয় শাস্ত্র ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানে ঐক্য নেই। আর দ্বিতীয়ত ভারতীয় পণ্ডিতের কুসংস্কার অতি শক্তিশালী, তাদের অন্ধত্ব ও গোঁড়ামি অটল। 'They believe that their Shastras have all emanated from omniscient Rishis, and therefore, they cannot but be infallible.' আর তাই যখন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রাথমিক অঙ্কুরিত রূপ তাঁদের শাস্ত্রের মধ্যে তাঁরা দেখতে পান, তখন শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের অন্ধ ভক্তি হয়ে ওঠে দ্বিগুণ।

পণ্ডিত সমাজের প্রতি বিশেষ আস্থা নেই বিদ্যাসাগরের। 'What we request is to extend the benefit of education to the mass of the people'—তার জন্য চাই বাংলা স্কুল। বাংলা পাঠ্যপুস্তক আর শিক্ষিত শিক্ষক, যাঁরা হবেন মাতৃভাষায় কৃতবিদ্য, দেশের অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত। আর, সংস্কৃত কলেজ হবে এই প্রকল্পের লালনভূমি।

৬.

কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সদস্য ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে (পরে বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন) সাহেবের নির্দেশে বিদ্যাসাগর তৈরি করেন Note on Vernacular Education, ১৮৫৪ সালে। এই পরিকল্পনা সরকার অনুমোদন করেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিস্তারের কাজে

আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই পরিকল্পনার রূপায়ণে। ১৮৫৫-৫৬ সালের মধ্যে তিনি কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয় খুলেছিলেন। এ-সময় ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ছিলেন ডবলিউ. গর্ডন ইয়াং। তাঁর কাছে বিদ্যাসাগর প্রতি তিন মাসে একটি করে রিপোর্ট পাঠাতেন। এই রিপোর্টগুলি বাংলা দেশের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে যে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল তা আমরা জানি। বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্র এখন প্রসারিত হয়ে গেছে সংস্কৃত কলেজের বাইরে, গ্রামে-গ্রামান্তে। স্কুলের বাড়ি, তার স্থান নির্বাচন, সেখানে পাঠ্যপুস্তক তৈরি, শিক্ষকদের মাইনে ইত্যাদি তাঁর ভাবনার বিষয়। সেইসব ভাবনায় পরিকীর্ণ এই রিপোর্টগুলি। এর মধ্যে অনেক অসাধারণ মানবিক মুহূর্তের কথাও আছে।

বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন কীভাবে গ্রামের মানুষ এগিয়ে এসেছে স্কুল খোলার কাজে সাহায্য করতে। প্রথম প্রথম পণ্ডিতেরা উপেক্ষা করেছেন, তার পর তাঁরা ছেলে পাঠাতে শুরু করেছেন। হুগলি জেলার শিয়াখাল্লা গ্রামের লোকেরা ইট তৈরি করে দিয়েছে। জ্বালানির অভাব দেখে পবিত্র অশ্বত্থগাছ কেটে জ্বালানির জোগাড় দিয়েছে। মেদিনীপুরের প্রতাপগাঁয়ের প্রধানেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে টাকা দিয়েছেন। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারির রিপোর্টে একটি মজার কথা আছে। একটি স্কুল পরিদর্শনের পর বিদ্যাসাগর ছাত্রদের ছুটি দিতে চাইলেন। কিন্তু ছাত্ররা ছুটি চায় না। বিদ্যাসাগর অবাক, তারা বললে ছুটি দিলে তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত হবে। মেদিনীপুরের গোপালনগরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বিদ্যাসাগরের। তিনি এক ছাত্রের পড়া শুনছিলেন। কিছুক্ষণ শোনার পর বৃদ্ধ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখে জল। তিনি বললেন গুরুমশাইয়ের পাঠশালার চেয়ে এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতি কত উন্নত!

বিদ্যাসাগর 'জনশিক্ষা' সমর্থন করেননি বলে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী মহল তাঁর প্রতি বিরূপ। এ-প্রসঙ্গটা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন : Higher, Middling এবং Lower। Higher বা অবস্থাপন্ন ছেলেরা মোটামুটি প্রাথমিক শিক্ষার পরেই ইংরেজি স্কুলে চলে যায়, কাজেই সরকারি মডেল স্কুল নিয়ে অবস্থাপন্ন লোকেরা খুব চিন্তিত নন। মাঝারিরা দলে বেশি তবে তারাও চায় ইংরেজি শিক্ষা, কিন্তু ইংরেজি স্কুলে যাওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের। তারাই মডেল স্কুলের প্রধান ধারা, তাদের জন্যই বিশেষভাবে বাংলা পাঠ্যক্রম তৈরি করা প্রয়োজন মনে করেন বিদ্যাসাগর।

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণি? তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রেরা স্কুলে সবচেয়ে কম সংখ্যায় আসে। বিদ্যাসাগর জানেন যে এই নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। স্কুল খোলার প্রধান উদ্দেশ্যই সাধারণ মানুষের (masses than for any other class) জন্য, কিন্তু সে-উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না। বিদ্যাসাগর লিখছেন, আমি যতদূর জানি এই স্কুলের উদ্দেশ্য আদৌ তা নয় ...'these institutions are regulated on principles which will always act as a great drawback on the working class. Here children are not only required to buy their slates, book etc. but have to pay monthly schooling fees. Labour in this country is so cheap that the earnings of the working classes are scarcely sufficient for their maintenance. They cannot, therefore, be expected to incur extra charges for the education of their children. If those classes are to be educated, the Education must be imparted to them gratis so long as their condition is not bettered, otherwise, it is not reasonable to expect that these classes will

reap any material advantage under the system in force in the Vernacular Schools.'[১৩]

এই কথাগুলি কি বিদ্যাসাগর বলছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্বার্থের রক্ষার জন্য? না, বাস্তব বোধ থেকে?

৭.

শিক্ষার মাধ্যম যে বাংলা হওয়া দরকার এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর যেমন নিঃসন্দেহ, তেমনই তিনি চিন্তিত বাংলা শিক্ষার content বা বস্তু নিয়ে, কীভাবে তা হতে পারে যথেষ্ট উন্নত এবং উপযোগী। সেজন্যই তিনি জোর দিচ্ছেন পশ্চিমি চিন্তার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার সম্পর্কের। সংস্কৃত এবং ইংরেজি এই দুটি শাখা, এদের সাহায্যেই বাংলা-বিদ্যা বৃহৎ শূন্যে বিচরণ করতে পারে। বিদ্যাসাগরের এই বিশ্বাস এখনও জীর্ণ হয়নি। বাংলা-বিদ্যা এখনও যথেষ্ট সম্মানিত নয়। তার জন্য শুধু সামাজিক অবজ্ঞা ও তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার রিক্ততাই দায়ি নয়। বাংলা-বিদ্যা এখনও দুর্বল, তরল এবং সংকীর্ণ। বাংলার মাধ্যমে যে বিদ্যাচর্চা হয় তাও দুর্বল, পরনির্ভর এবং আত্মকরুণায় দীর্ণ। তার প্রধান কারণ সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা-বিদ্যাকে যুক্ত করতে এখনও আমরা দ্বিধাগ্রস্ত, এই দুই ভাষার লভ্য যে-জ্ঞান তাকে বাংলার অঙ্গীভূত করতে ব্যর্থ। ইংরেজি ভাষায় যে-জ্ঞান নিত্য উৎপাদিত হচ্ছে, তার মাধ্যমে যে-বিশ্ববীক্ষা সম্ভব তাকে অস্বীকার করলে বাংলা-বিদ্যা দুর্বল, তরল এবং সংকীর্ণ থাকতে বাধ্য।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকে অবহেলা করেননি, কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তাকে তর্কাতীত মনে করেননি। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লেখার কথা ভাবেননি। ডন কিহোটের মতো অতীতের পুনরাগমন চাননি। 'আধুনিক' সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা চাননি। কিন্তু বুঝেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় দরকার। ইউরোপীয় মনীষীরা যেমন আধুনিক ভাষায় গ্রিক ও ল্যাটিন ক্লাসিক্‌সগুলির নিয়মিত অনুবাদ করে চলেছেন, যেমন তাঁরা গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য সম্বন্ধে মাতৃভাষায় সমালোচনার একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা সৃষ্টি করেছেন, বিদ্যাসাগরও চেয়েছিলেন তাই। গ্রিক-ল্যাটিন সাহিত্য, অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যের এক জাগ্রত, জীবন্ত ধারা। সংস্কৃত সাহিত্য সেভাবে সঞ্জীবিত করতে পারেনি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যকে, দু একটি ব্যতিক্রম বাদে। কিন্তু মূলত সংস্কৃত সাহিত্য বন্দি থেকে গেল শুধু প্রাচীন ভাষায় বন্ধনে নয়, প্রাচীনত্বের দুর্গে। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পিছনে ছিল সংস্কৃত সাহিত্য ও আধুনিক পাঠকের মধ্যে সম্পর্ক রচনা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডবলিউ. গর্ডন ইয়াং *শকুন্তলা*-র একটি ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়ে সংস্কৃত কলেজে প্রাইজ হিসেবে বইটির উপযোগিতা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের উত্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তিনি বলেছেন বইটি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অনুপযোগী তবে ইংরেজি স্কুলের ছাত্ররা যাঁদের সংস্কৃত-চর্চার সুযোগ নেই, তাঁদের কাজে লাগতে পারে।[১৪] আজকের ভারতবর্ষ মোটামুটি সংস্কৃত ভুলে গেছে। আধুনিক ছাত্রছাত্রী-সমাজের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় আর নেই। এমন সময় সংস্কৃতের সঙ্গে যদি সম্পর্ক

রাখতে হয়, তার প্রধান অবলম্বন হবে অনুবাদ। বিদ্যাসাগর হয়তো কল্পনা করেননি যে আজকের বাঙালি ছেলেমেয়েরা সংস্কৃত মহাকাব্য কিংবা নাটক পড়বে ইংরেজি অনুবাদে। কারণ পাঠযোগ্য, আধুনিক অনুবাদ বাংলায় নেই; বিবর্ণ প্রাচীন বাংলা ভাষার নীরস অনুবাদের চেয়ে ইংরেজি অনুবাদ যদি পছন্দ করে আজকের পাঠকসমাজ তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। বিদ্যাসাগর শুরু করেছিলেন বাঙালি পাঠকের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় করিয়ে দিতে।

সেই দিক থেকে ক্ষুদ্রকায় 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, একটি অসামান্য প্রচেষ্টা। ভারতীয় ভাষায় এই প্রথম লেখা হল একটি সাহিত্যের ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব কিন্তু আপাতত নিষ্প্রয়োজন। যেটুকু বলা দরকার তা হল যে বিদ্যাসাগর কালানুক্রমিক বর্ণনার চেয়েও জোর দিয়েছেন সাহিত্যের শ্রেণিবিভাগে, প্রাচীনত্ব বিচারের চেয়েও বস্তু বিচারে, তালিকা নির্মাণের চেয়েও নির্বাচনে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য, তাঁকে এই সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে উদাসীন করতে পারেনি। তিনি যখন বলেন, 'সংস্কৃত কবিগণ মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ, উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন' তখন বঙ্কিমচন্দ্রের কালিদাসও শেকসপিয়রের তুলনার পূর্বধ্বনি উচ্চারণ করেন। আবার *শকুন্তলা* সম্বন্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় : 'কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ অলৌকিক পদার্থ'।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মতো মূল্যবান তাঁর সম্পাদিত বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির ভূমিকা। *মেঘদূত* (১৮৬৯), *উত্তরচরিত* (১৮৭০), *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্* (১৮৭১) —এই তিনটি বই-এর বিজ্ঞাপন সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের নিদর্শন। কালিদাস সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অতি উচ্চ কিন্তু স্বদেশিয়ানা-আক্রান্ত নন। তিনি কালিদাস সম্পর্কে গ্যেটের প্রশস্তি-কবিতাটি উদ্ধার করে বলেছেন (প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর অনূদিত গ্যেটের কবিতাটি বাংলায় গ্যেটের প্রথম অনুবাদ) 'যদি বিদেশীয় লোক অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া এত প্রীত ও চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া, কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন'। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেকসপিয়র প্রশস্তি— ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি—শুনে বিদ্যাসাগর নাকি বলেছিলেন, 'হেমবাবুর এ কথা বলার অধিকার নেই কারণ তিনি সংস্কৃত জানেন না।'[১৫] এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বিদ্যাসাগর শেকসপিয়রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না।[১৬] তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙালি শেকসপিয়র সম্বন্ধে যে-উচ্ছ্বসিত অনুরাগে কালিদাসকে তাঁর তুলনায় ন্যূন প্রতিভাধর মনে করেছেন বিদ্যাসাগর তা স্বীকার করেননি। *ভ্রান্তিবিলাস*-এর ভূমিকায় সমকালীন বাঙালির শেকসপিয়র-অনুরাগ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন : 'অনেকে বলেন তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন এরূপ নহে, এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাতবিবর্জিত কিনা সাদৃশ্য ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতা প্রদর্শনমাত্র'।

প্রকৃতপক্ষে বাঙালির শেকসপিয়র সম্পর্কিত মনোভাব সম্পূর্ণ নান্দনিক বিচারনির্ভর নয়। তা ছাড়া এখনও পর্যন্ত বাঙালির সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বনির্ভর। শেকসপিয়র বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভিন্ন। পূর্ণচন্দ্র বসু যিনি 'সাহিত্যে খুন' রচনা করে শেকসপিয়রের দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তাঁর শেকসপিয়র

সম্বন্ধে মনোভাব আরও ভিন্ন। কাজেই বাঙালির শেকসপিয়র-প্রীতির নানা স্তর, নানা মাত্রা। বিদ্যাসাগরের শেকসপিয়র অনুরক্তির সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ *ভ্রান্তিবিলাস*, শেকসপিয়রের নাটকের এক তৃপ্তিকর রূপান্তর। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে শেকসপিয়রের অভ্যর্থনার অবকাশের অভাব ঘটেনি।

আবার ফিরে আসা যাক মূল কথায়, ইংরেজি ও ইংরেজিয়ানা, স্বদেশানুরাগ ও স্বাদেশিক সংকীর্ণতায়। বহু বিষয়েই ইউরোপীয় চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন বিদ্যাসাগর। তিনি চান ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তার সম্পর্ক। তিনি যেমন কোনো ধর্মসভায় যোগ দেননি, তেমনই ঢোকেননি কোনো রাজনৈতিক সংঘে, ভাষণ দেননি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। তবু তিনি ঘোষণা করেছেন নিজের স্বাধীনতা, যে-স্বাধীনতা চিন্তার। গান্ধি তাঁর *Hind Swaraj* গ্রন্থে এক ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষের কথা বলেছেন। আমরা কি চাই? We want English rule without the Englishman, তাই কি আমাদের লক্ষ্য?

আজকের ভারতবর্ষে ইংরেজ নেই। কিন্তু চলেছে ইংরেজের শাসন, বা বলা ভালো ইংরেজিয়ানার শাসন। বিদ্যাসাগর ছিলেন এরই মূর্ত প্রতিবাদ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরের ধুতি-চাদর-চটির মধ্যে দেখেছিলেন যথার্থ পেট্রিয়টিজম্। গান্ধির মতো বিদ্যাসাগরও চেয়েছিলেন খোলা দরজা জানালা, ঘরের মধ্যে অবাধ হাওয়ার আসা-যাওয়া, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ায় নিজের ঘর থেকে ছিটকে পড়া, পায়ের তলার মাটি হারিয়ে ফেলাকে চাননি। আজ আমাদের চিন্তার একটা বিরাট সংকট, দেশ ও বিশ্ব, স্বাতন্ত্র্য ও একীকরণ, ঐক্য এবং খণ্ড ইত্যাদির সম্পর্ক নিয়ে। আর আমাদের দেশে এখনও চলেছে ভাষা সংকট, সংস্কৃত-ইংরেজি-বাংলার সম্পর্কনিয়ে সমস্যা। তখন বিদ্যাসাগর আমাদের সামনে উপস্থিত হন, কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে নয়, তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে, তাঁর প্রাত্যহিকআচরণ ও বিশ্বাস নিয়ে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি তাই শীতল মর্মর মাত্র নয়, তা জাগ্রত জিজ্ঞাসা, কঠিন এবং অস্বস্তিকর।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর* (১৮৯৫), ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ৩৬

২. বিহারীলাল, তদেব, পৃ ১১৬

৩. দ্রষ্টব্য ইন্দ্রমিত্র, *কথাসাগর-বিদ্যাসাগর* (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯) পৃ ৮০০। সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য 'ইংলিশম্যান' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মন্তব্য। ইন্দ্রমিত্র, পৃ ৮০০-০২

৪. পরবর্তীকালে ক্রমশই দৃঢ় হয়েছে পোশাক ও রাজনীতির সম্পর্ক। মহাত্মা গান্ধি এবং জবাহরলাল নেহরুর পোশাক নির্বাচনে ভারতীয়ত্ব সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন বোধের প্রতিফলন। এমনকী রবীন্দ্রনাথের পোশাক নির্বাচনে শুধু তাঁর স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তাই নয়, ইউরোপীয় পোশাক-পরিহারের সচেতন প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জননায়কদের পোশাক নির্বাচন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে। আপাতত তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (*সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, ২য় খণ্ড, ৫ম সং, ১৯৫৫, পৃ ১১৪) জানিয়েছেন যে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তক দু-খানির ইংরেজি অনুবাদ *Marriage of Hindu Widow* (১৮৫৬) নামে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ কে করেছিলেন সে-কথা কেউ বলেননি।

৬. বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন জীবনীতে কখনও অংশবিশেষ, কখনও-বা কোনো কোনো রিপোর্ট সম্পূর্ণই উদ্ধৃত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (১৯৭৩) এবং ইন্দ্রমিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* (১৯৬৯)। এ ছাড়া অরবিন্দ গুহ সম্পাদিত *Unpublished Letters of Vidyasagar* (১৯৭১) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বিদ্যাসাগর লিখিত তিনশোটি চিঠি সংকলিত হয়েছে।

৭. ইন্দ্রমিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৬-২৭

৮. বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাসাগর এ-সময় বেশ ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন তার কোনো উল্লেখ করেননি এই আবেদনে। মার্শাল সাহেব (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিদ্যাসাগরের ঊর্ধ্বতন অফিসার) বিদ্যাসাগরকে একটি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তাতে লিখেছিলেন, ' ..he has since, by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English language' (ইন্দ্রমিত্র, পৃ ১২৭)

৯. বাঁকা রেখা আমার। এই পদ থেকে বিদায় নেওয়ার কথায় রসময় দত্ত বলেছিলেন 'বিদ্যাসাগর খাবে কী'। যার প্রত্যুত্তর ছিল 'আলু পটোল বেচে'। পদত্যাগের পর বিদ্যাসাগর ছাপাখানা খুলে প্রকাশনার স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেন।

১০. Arabinda Guha ed. Unpublished Letters of Vidyasagar, pp 34-36

১১. বিনয় ঘোষ এই সমগ্র রিপোর্টটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। দ্রষ্টব্য *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পূর্বোক্ত,
পৃ ১৭৩-৭৬। আমি উদ্ধৃতিগুলি ইংরেজিতেই দিচ্ছি। প্রথমত বিদ্যাসাগরের ইংরেজি রচনার বৈশিষ্ট্য তাতে অক্ষুণ্ণ থাকবে। দ্বিতীয়ত, অনুবাদজনিত বিকারের সম্ভাবনা যাতে দেখা না দেয়। সমগ্র ইংরেজি প্রবন্ধটির জন্য দ্রষ্টব্য ইন্দ্রমিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৩-২৬

১২. বিদ্যাসাগরের চিঠিটি প্রথম প্রকাশ করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'Ishwar Chandra Vidyasagar as an Educationist' প্রবন্ধে (*Modern Review*, October, 1927)। এ-চিঠিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ইন্দ্রমিত্রের *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* গ্রন্থে (পৃ ৭৩০-৩৩) এবং বিনয় ঘোষের *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* গ্রন্থে (পৃ ৫২৫-৩০)

১৩. Report for the quarter ending January 1857, দ্রষ্টব্য ইন্দ্রমিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৫৭-৫৮

১৪. ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭, দ্রষ্টব্য *Unpublished Letters of Vidyasagar*, p. 104

১৫. বিদ্যাসাগর নাকি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যকে এ-কথা বলেছিলেন। দ্রষ্টব্য বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৯১৩), পৃ : ৫০

১৬. শেকসপিয়রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ও অনুরাগের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। বিহারীলাল সরকার জানিয়েছেন তিনি শেকসপিয়র আবৃত্তি করতেন। প্রথম বাঙালি মেয়ের এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দে বিদ্যাসাগর 'যৎকিঞ্চিৎ উপহার' পাঠান শেকসপীয়রের রচনাবলী, ব্যালান্টাইন প্রস্তাবের উত্তরে লেখা বিখ্যাত চিঠিতে তিনি লিখছেন 'my occupation is gone'

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে Sex fantasy

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

Disgusting old Charlatan! Corrupter of young girls! I raged to myself, burning with jealousy, fury, impotent outrage, with his libidinous mysticism, his vile mixture of devotion and trickery!

যাঁর সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি বলছেন, তাঁর নাম মির্চা ইলিয়াদ। কোথায়, কী প্রসঙ্গে, এই ক্রুদ্ধ ধিক্কার, সেই বিষয়ে যাওয়ার আগে, কী কারণে এত রাগ, সেটা দেখা যাক। মির্চার বিশ্বাস ছিল, তিনি যেভাবে মৈত্রেয়ীকে ভালোবাসেন, মৈত্রেয়ীও তাঁকে সেইভাবে ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর ভুল হচ্ছে।

Her heart had long since belonged to another, to Robi Thakur. She had loved him since she was thirteen, since she had read his books. She had spent every summer except the last at Shantiniketan, staying with the poet's family, in his own house. How often, at night, alone with the old man on the terrace and seated at his feet, had she listened to him talking! He had stroked her hair. At first, she had not known what emotion it was that transported her beyond ordinary consciousness into a never-ending, unspeakably exquisite dream. She had thought that the veneration and filial devotion she had for her guru must have caused the miracle. Then, one evening, the poet had told her that it was in fact a manifestation of Love. She had fainted. She did not know how long it had been before she came round, laid out in the poet's room, on his bed, her face covered in perspiration. The fresh smell of jasmine floated through the room. Her guru was still stroking her hair. It was then that he had given her the mantra that protected against impurity. He had asked her to stay pure for the rest of her life, to write poetry, to love, to be faithful to him and never to forget him. And she never had forgotten him. She kept the letters he had written her, from every corner of the world, in a box made of perfumed wood which he had given her two years ago, with a lock of his hair...

অনুচ্ছেদটি পড়ার সময় মনে পড়ে যায় এইরকমই ভাবতেন এবং লিখেছেন রাণু মুখার্জি। তবে এই ক্ষেত্রে কিশোরীটি রাণু নন। তিনি মৈত্রেয়ী (১৯১৪-১৯৯০), সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের (১৮৮৫-১৯৫২) কন্যা।

মির্চা মৈত্রেয়ীর প্রেমে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সম্পর্কের কথা জেনে মির্চার রাগ হয় —

How could I have believed in her purity? How could I have believed that

I was the first man to have touched her?

Apparently, however, her guru had never kissed her. He had simply stroked her hair.

কিন্তু মৈত্রেয়ীর মা মেয়ের ভাবলক্ষণ দেখে মেয়েকে তার গুরুর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু মেয়ে তার গুরুকে ভুলতে পারেনি। সে চায়, সে যেমন তার গুরুকে ভালোবাসে, মির্চাও তেমন গুরুকে ভালোবাসুক।

এখানে বলা প্রয়োজন, যে-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিগুলো দেওয়া হয়েছে, সেটা মির্চার কোনো ডায়েরি নয়, তাঁর লেখা একটি উপন্যাস। উপন্যাস নয়, জীবনোপন্যাস। মির্চার জীবনের একটি বছরের কাহিনী। গ্রন্থটি লেখা রুমানিয়ান ভাষায়। লেখা হয় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩, এবং সে-বছরই প্রকাশিত হয়। ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয় ১৯৫০ সালে *La nuit bengali*। ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ হয় ১৯৯৩ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে। সেই বছরই রূপা প্রকাশ করে কলকাতায় ইংরেজি অনুবাদটি, *Bengal Nights*।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মির্চা যা লিখেছেন, সেটা কি জীবনের বাস্তব, না উপন্যাসের জন্য কল্পনা? যদি জীবন থেকে লেখা হয়, তা হলে তিনি কি সম্পর্কটার বিষয়ে জেনেছিলেন মৈত্রেয়ীর কাছ থেকেই? যদি কল্পনা হয়, তা হলে প্রশ্ন জাগে জীবিত মানুষের নাম করে, তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কল্পনা করার স্বাধীনতা লেখকের কতটুকু থাকতে পারে? ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ জগদ্‌বিখ্যাত নাম, তাঁকে disgusting old Charlatan, corrupter of young girls বলার স্বাধীনতা ঔপন্যাসিকের থাকতে পারে? ইউরোপের এক অখ্যাত ভাষায় লেখা, অতএব রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়বে না, এই ভরসায় লেখা? অথবা, তিনি যা লিখছেন, তা সত্য ভেবেই তিনি লিখছেন। মৈত্রেয়ীর মুখে যা তিনি শুনেছেন, তাই লিখেছেন, অতএব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি লিখতে দ্বিধা করেননি। উপন্যাস লিখলেও, তার স্থান, কাল, পাত্র তিনি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি, সহজেই বোঝা যায়, বাস্তব জীবনের ইতিহাসই তিনি লিখছেন। এটা সত্য, উপন্যাসটি সম্পর্কে আমরা সাধারণ বাঙালিরা কিছুই জানতাম না, ১৯৫০ সালের ফরাসি অনুবাদের আগে। অথচ, রুমানিয়ান ভাষায় লেখা উপন্যাসটির সে-দেশে অচিরেই অসংখ্য মুদ্রণ ঘটে, সেই ভাষায় ক্লাসিক আখ্যাপ্রাপ্ত হয়, এমনকী দুবার নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবিত হয়। ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হলেও, কানাঘুষোয় এ-দেশে উপন্যাসটির বিষয় আলোচিত হলেও, ১৯৪৪-এর আগে মৈত্রেয়ী দেবী প্রতিবাদ করেননি। তিনি ফরাসি ভাষাতেও উপন্যাসটি পড়েননি, অন্যমুখে কিছুটা শুনে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে ভেবে, পালটা জীবনোপন্যাস লেখেন, *ন হন্যতে*। এটা ১৯৭৬ সালে সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার পায়।

Bengal Nights এবং *ন হন্যতে* দুটোই জীবনোপন্যাস। বাস্তব কতটা, উপন্যাস কতটা?

মির্চা ইলিয়াদ (১৯০৭-১৯৮৬) ভারতবর্ষে আসেন ১৯২৮ সালে। বুখারেস্টে জন্ম, প্রাচ্য দর্শনের ছাত্র। কলকাতায় দর্শনের অধ্যাপক তাঁর গুরু সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শিষ্যকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর ভবানীপুরের বকুলবাগান লেনের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার জন্য। ১৯৩০ সালের অনেকটাই মির্চা ছিলেন গুরুর বাড়িতে। তবে ওই বছরেই তিনি বহিষ্কৃত হন মৈত্রেয়ীর

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য। এর পর তিনি ১৯৩২ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন, হিমালয়ের বিভিন্ন শহরে, ভারতীয় যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য। ইউরোপে ফিরে গিয়ে তিনি ভারতীয় দর্শন এবং যোগ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে প্রেমের কাহিনী (১৯৩৩) লেখা ছাড়াও মির্চা অন্য আরও উপন্যাস লেখেন, তবে তাঁর খ্যাতি দার্শনিক পরিচয়ে, *History of Religious* নামক অতিকায় গ্রন্থের জন্য। ১৯৫৭ থেকে ১৯৮৬ সালে মৃত্যু পর্যন্ত মির্চা ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে Chair of the History of Religion-এর অধ্যাপক।

Bengal Nights-এ মির্চা ইলিয়াদ এসেছেন অ্যালেন নামের এক চরিত্রে। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, চাকুরিক্ষেত্রে কর্তা নরেন্দ্র সেন। ভারতে আসার পর কিছুকাল অ্যালেন ছিল ওয়েলেসলি স্ট্রিটের রিপন ম্যান্‌সন্‌সে। তমলুক এবং আসামের নানা জায়গায় কাজ করে অ্যালেন অসুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরলে, এডিনবরায় শিক্ষণপ্রাপ্ত, ইঞ্জিনিয়ার নরেন্দ্র সেন তাকে থাকতে নিমন্ত্রণ করেন ভবানীপুরের বকুলবাগান লেনে। সেখানে আছেন তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা — মৈত্রেয়ী আর চাবু। ১৯৩০ সালের গল্প। গল্পে এখন অ্যালেনের বয়স ২৩, মৈত্রেয়ীর বয়স ১৬, চাবুর ১২ (বাস্তবেও মির্চার বয়স ২৩, মৈত্রেয়ীর বয়স ১৬, আর চিত্রিতার ১২)। ইউরোপীয় অ্যালেন প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে ভবানীপুরের ওই বাড়িতে থাকতে আসে এবং সেই বাড়ির জীবনযাত্রা নিয়ে কেবলই ভাবে, সে প্রাচ্য জীবন বুঝতে পারছে না, ভুল করছে। *Bengal Nights*-এর বিষয় এই ইউরোপীয় দৃষ্টিতে প্রাচ্য জীবন দেখা, প্রেম-বৃত্তান্ত তার অঙ্গ বা মুখ্য উপজীব্য। প্রথমে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, তার পর আস্তে আস্তে ভালো লাগা, তার পর প্রেমের যেসব লক্ষণ, সন্দেহ অনুকম্পা ঈর্ষা ইত্যাদি, তার পর আচ্ছন্ন প্রেমে পূর্বাপর ভুলে যাওয়া। অ্যালেনের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বন্ধুরা ভাবে, নরেন্দ্র সেন জামাই-ধরা ফাঁদ পেতেছেন। অ্যালেনের ঈর্ষার কারণ প্রধানত রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ী (উপন্যাসে মৈত্রেয়ীর নাম পালটানো হয়নি, চিত্রিতার হলেও) অ্যালেনকে বাংলা শেখাবে, অ্যালেন মৈত্রেয়ীকে ফরাসি — কিন্তু ফরাসি শেখবার সময় অন্যমনস্ক মৈত্রেয়ী খাতায় লিখে চলে, রবি ঠাকুর, রবি ঠাকুর। রবি ঠাকুরের কথা অ্যালেন যখন প্রথম শোনে মৈত্রেয়ীর কাছে, অ্যালেন প্রশ্ন করেছিল, রবি ঠাকুর কে? জেনেছিল, টেগোর। অ্যালেন জেনেছিল, তেরো বছর বয়স থেকে মৈত্রেয়ী রবীন্দ্রনাথের কাছে যায়। অ্যালেন লেখে, her passion for an old man of seventy unnerved me। অ্যালেনও মৈত্রেয়ীর ঈর্ষা জাগানোর জন্য অ্যালেনের মেয়ে-বন্ধুদের কথা পাড়ে। মৈত্রেয়ী, ওই ষোলো বছর বয়সেই, সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দিতে যায়, আর বিমর্ষ হয়ে ফিরে আসে, কেননা রবীন্দ্রনাথ তার বক্তৃতা শুনতে আসেননি। অ্যালেন মৈত্রেয়ীর সঙ্গে *বলাকা* অনুবাদ করে অথবা অনুবাদ করার অজুহাতে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে গল্প করে। মৈত্রেয়ীর বাবা হঠাৎ ঢুকে পড়লে মৈত্রেয়ী বলে, বাংলা শেখাচ্ছি আর অ্যালেন অবাক হয়, মৈত্রেয়ীর অনায়াস মিথ্যাভাষণে।

Bengal Nights-এর বৃহৎ অংশ, এর পরে, অ্যালেন-মৈত্রেয়ীর প্রণয়লীলা — তাদের ভয়, সন্দেহ, সংশয়, মোহ, আচ্ছন্নতা —। আমাদের বিষয় উপন্যাসটি নয়, কতটুকু এর বাস্তব, কতটুকু এর কল্পনা, সেটা বোঝার চেষ্টা। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পারিবারিক জীবন আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু একটি উপায়, *ন হন্যতে* উপন্যাসের সঙ্গে কোথায় কোথায়

Bengal Nights-এর মিল, সেটা দেখে, জেনে নেওয়া। মনে রাখতে হবে, মৈত্রেয়ী *Bengal Nights* পড়েননি। কীভাবে তিনি মির্চার উপন্যাসের কথা জেনেছিলেন? পি.লাল তাঁর *Lessons: The Testament of a Survivor* (জুন ১৯৯৯-এ প্রকাশিত, বর্ধিত সংস্করণ ২০০২) গ্রন্থে তাঁর চেনাশোনা ব্যক্তিদের বিষয়ে লিখেছেন। মির্চা এবং মৈত্রেয়ী দু-জনেই মৃত, অতএব, এখন তাঁদের সম্বন্ধে লেখা যেতে পারে। লালের বিশ্বাস — মির্চা-মৈত্রেয়ীর প্রেম : the most innocent, poignant, enchanting romance of our century। ১৯৭২ সালে লাল মিশিগানের এক কলেজে গিয়েছিলেন ইয়েটস বিষয়ে প্রবন্ধ পড়তে। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় মির্চা ইলিয়াদের। মির্চা বেশি কথা বলেন না। তিনি তখন শিকাগোতে Professor of Religion এবং Encyclopaedia of Religions-এর সম্পাদক। লাল কলকাতা থেকে গেছেন শুনে, মির্চা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বকুলবাগান লেন চেনো? অবাক লাল বললেন, হ্যাঁ, ভবানীপুরে। মির্চা কথা না বাড়িয়ে বললেন, আমি ওখানে ছিলাম। লাল জেনেছিলেন, তরুণ বয়সে রুমানিয়ার এই ছাত্র ভারতীয় দর্শন শিক্ষার জন্য ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে পড়াশোনা করেছিলেন, গুরুর বাড়িতে থেকে। কলকাতায় ফিরে এসে লাল তাঁর স্ত্রীকে বলেন মির্চার কথা। শ্যামশ্রী তখন দমদমে মধ্যে মধ্যে কাজ করেন মৈত্রেয়ী দেবীর অনাথদের জন্য 'খেলাঘর'-এ। মৈত্রেয়ী দেবীও তখন জানতে পেরেছেন, মির্চার ওই উপন্যাসের কথা। তিনি জেনেছেন, রুমানিয়ার কনস্যুলেটের এক বিদেশি কর্মীর কাছে। তিনি শুনলেন, রুমানিয়ার সবাই নাকি 'মৈত্রেয়ী' নামটির সঙ্গে পরিচিত ওই অসম্ভব জনপ্রিয় উপন্যাসটির মাধ্যমে। মৈত্রেয়ী উপন্যাসটি পড়েননি। লালের বাড়িতে, লেক গার্ডেন্স-এ, ফাদার আঁতোয়ান পড়ে শোনালেন, উপন্যাসটির ফরাসি অনুবাদ, তর্জমা করে করে। সেখানে ছিলেন মৈত্রেয়ী আর গৌরী আইয়ুব, লাল আর শ্যামশ্রী। মৈত্রেয়ী ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁদের pure, sweet, fragrant, idealistic first love of adolescence (লালের ভাষায়) রূপ পেয়েছে lust consummated Kali-consuming passion-এ (এটাও লালের ভাষা)। মৈত্রেয়ী পরিণত হয়েছেন একটি shady lady-তে। মৈত্রেয়ী একটি ক্রুদ্ধ চিঠি লিখলেন মির্চাকে। লাল ১৯৭৩ সালে শিকাগোতে যাবেন বক্তৃতা দিতে। মৈত্রেয়ীর চিঠি মির্চাকে দেওয়ার জন্য তিনি চিঠিটি নিয়ে গেলেন। কিন্তু ফোনে মৈত্রেয়ীর নাম শুনে মির্চা ফোন নামিয়ে রেখেছিলেন। এর পর আরও দুবার লাল চেষ্টা করেন মির্চার সঙ্গে কথা বলার, কিন্তু মির্চা ফোন ধরতে রাজি হননি। অগত্যা লাল চিঠিটি পোস্টে পাঠান। তিন মাস পরে শ্যামশ্রী যখন লন্ডনে যান, মৈত্রেয়ীও যান শ্যামশ্রীর সঙ্গে। মৈত্রেয়ী মির্চার সঙ্গে শিকাগোতে দেখা করেন। সেখানে কী হয়, সেটা লাল জানিয়েছেন, মৈত্রেয়ী নিজেই লিখেছেন, তাঁর *ন হন্যতে* উপন্যাসে। মৈত্রেয়ী তাঁর উপন্যাসের শেষে মির্চার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে-কাহিনী লিখেছেন, সেটা লাল বিশ্বাস করেছেন, তাঁর নিজস্ব কোনো খবর নেই। অর্থাৎ, মির্চার সঙ্গে সাক্ষাৎকার বাদ দিয়ে, মির্চা-মৈত্রেয়ী সম্পর্কে তিনি যা জেনেছেন, তা *ন হন্যতে* পড়ে এবং *লা নুই বেঙ্গলি* শুনে। মৈত্রেয়ীর মির্চাকে চিঠি পাঠানো এবং শ্যামশ্রীর সঙ্গে ১৯৭৩ সালে মৈত্রেয়ীর লন্ডন পর্যন্ত যাওয়া ছাড়া লাল প্রত্যক্ষভাবে এই সম্পর্কের কথা জানেন না।

ন হন্যতে, যেটা লেখা *লা নুই বেঙ্গলি* না পড়ে, কিন্তু কিছুটা শুনে (ফাদার আঁতোয়ান কি

এক রাত্রেই পুরো উপন্যাসটা অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন, লালের লেখা থেকে সেটা স্পষ্ট নয়), আর *লা নুই বেঙ্গলি*-র কাল-পাত্র-ঘটনা যেখানে যেখানে মেলে, সেটুকু বাস্তব বাকিটা কল্পনা আমরা যদি ধরে নিই, তা হলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মির্চার ধারণার উৎস মৈত্রেয়ী দেবী কি না, আমাদের বোঝার একটা অবকাশ থাকে। দুটো উপন্যাসেই যে-মিল সেগুলো সংক্ষেপে এই।

বকুলবাগান লেনে মির্চা থাকতে এসেছেন ১৯৩০ সালে। ১৮ সেপ্টেম্বর মির্চা বিতাড়িত সেই বাড়ি থেকে। ঠিক কবে তিনি এসেছিলেন, কোনো উপন্যাসেই তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই, মির্চার উপন্যাসে এই সময়কাল ১৯২৯-এর শেষ বা ১৯৩০-এর প্রথম হতে পারে, মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে ১৯৩০ সাল। বাড়িটি দোতলা, দোতলায় মৈত্রেয়ীরা, একতলায় মির্চা। ১৯৩০ সালে উদয়শঙ্কর কলকাতায় তাঁর নাচ দেখান আগস্ট মাসে, তাতে মির্চা আর মৈত্রেয়ী গিয়েছিলেন সপরিবারে, নিউ এম্পায়ারে। ১ সেপ্টেম্বর মৈত্রেয়ীর জন্মদিনে (মির্চার উপন্যাসে বলা হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর, কিন্তু সেটা অনুবাদের সময় ভুলেই সম্ভবত) অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে নিমন্ত্রিত ছিলেন উদয়শঙ্কর। নাচের সময় ঈশ্বর মনে হয়েছিল, কিন্তু ড্রয়িং রুমে কথাবার্তার সময়, একেবারেই আকর্ষণহীন — বলা হয়েছে দুটো উপন্যাসেই। মৈত্রেয়ীর কাব্যগ্রন্থ *উদিতা* সেদিন অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, সবেমাত্র প্রকাশ হয়েছে সেটা। *ন হন্যতে* উপন্যাসে মৈত্রেয়ীর নাম অমৃতা, কাব্যগ্রন্থটির নাম *ভাসিতা*।

দুটো উপন্যাসেই মৈত্রেয়ীর মাকে দেখানো হয়েছে স্নেহময়ী মহিলা হিসেবে। বাস্তবে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের স্ত্রী হিমানীর বয়স ১৯৩০ সালে ৩২। দুটো উপন্যাসেই বলা হয়েছে, হিমানী মির্চার কাছে 'মা' ডাক শুনতে চান। তাতে মির্চার অস্বস্তি, ৩২ বছরের যুবতীকে মা বলা, যতই স্নেহময়ী হোন না। সুরেন্দ্রনাথের বয়স ১৯৩০ সালে ৪৫। মির্চার উপন্যাসে তিনি অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার, মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে দর্শনের অধ্যাপক। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ব্লাড প্রেশার বেশি, চোখের অসুখ। মির্চার উপন্যাসেও, মৈত্রেয়ীরও। বাস্তব জীবনেও, সুরেন্দ্রনাথ অসুস্থ হতে থাকলেন ১৯৩০-এর পর থেকে।

২—৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়। রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্য করার কথা ছিল, বরোদায় থাকার জন্য লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন, স্বর্ণকুমারী দেবী। এই সম্মিলনে, মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, মৈত্রেয়ী তাতে বক্তৃতা দিয়েছেন, সভায় গদ্যপ্রবন্ধ পাঠ সেটাই তাঁর প্রথম। বিষয়, সুন্দরের স্থান কোথায়? কিন্তু তাঁর মন খারাপ, রবীন্দ্রনাথ 'হায়দরাবাদ'-এ আটকে যাওয়ায় তিনি আসতে পারেননি, এবং না আসার জন্য তাঁর নিন্দামন্দ হয়েছে। এই বক্তৃতার কথা মির্চার উপন্যাসেও আছে, বিষয় essence of beauty। মির্চার উপন্যাসেও, হতাশ হয়ে ফেরেন মৈত্রেয়ী ও তাঁর বাবা সভা থেকে, কারণ অবশ্য, জটিল বিষয়টি শ্রোতারা ধরতে পারেননি। মির্চার উপন্যাসে, বাবা মনে করেন তাঁর মেয়ে এক অসাধারণ প্রতিভা। মৈত্রেয়ীর উপন্যাসেও, বাবা অমৃতাকে (মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে তাঁর ওই নাম) উৎসাহ দেন, তাঁকে সরোজিনী নাইডু হয়ে উঠতে হবে। সভা থেকে ফিরে মৈত্রেয়ী অ্যালেনকে জানায় তার মন খারাপ করার কথা, তার বক্তৃতা শুনতে রবীন্দ্রনাথ আসেননি। অ্যালেন ক্ষুব্ধ হয়, রবীন্দ্রনাথকে মৈত্রেয়ী ভালোবাসে, এমন অভিযোগ করে।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ মৈত্রেয়ীর জন্মদিন দুটো উপন্যাসেই গুরুত্বপূর্ণ দিন, যেমন ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ দিনটি, যেদিন মির্চা বিতাড়িত হন ভবানীপুরের বাড়ি থেকে। জন্মদিনের বিবরণে মৈত্রেয়ী তাঁর উপন্যাসে অনেক অতিথির নাম করেছেন: 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কামিনী রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়ংবদা দেবী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, জলধর সেন, উদয়শঙ্কর। মির্চা তাঁর উপন্যাসে, জন্মদিনের এই উৎসবে শুধু উদয়শঙ্করের আর শরৎচন্দ্রের নাম করেছেন। অন্য অজস্র অতিথি এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের নাম করেননি, সম্ভবত এঁদের নামের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন না। মির্চা অবশ্য অচিন্ত্যের নাম করেছেন— a very original, hotly discussed poet : he had just published a novel similar to James Joyce's *Ulysses* and as a consequence he now had the whole pleiade of elderly Bengali writers ranged against him। অচিন্ত্য মৈত্রেয়ীর এক গুণগ্রাহী, জানিয়েছেন মির্চা। মৈত্রেয়ী তাঁর উপন্যাসে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের নাম করেছেন। সিঁড়িতে বসে তিনি অচিন্ত্যের *অমাবস্যা* পড়ছেন। 'কল্লোল' পত্রিকায় একটি কবিতা পাঠানোর পর সেই পত্রিকার এক কবি মৈত্রেয়ীকে চিঠি লিখেছিলেন এবং সে-কথা শুনে মির্চার রাগ হয়েছিল। অচিন্ত্যের *বেদে* উপন্যাস *ইউলিসিস* না হলেও বাংলা সাহিত্যে হইচই লাগিয়েছিল।

দুটো উপন্যাসেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চিত্রিতা দেবী। ১৯৩০-এ তাঁর বয়স ১২, মৈত্রেয়ীর চার বছরের ছোটো। মির্চার উপন্যাসে তাঁর নাম চাবু, মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে সাবিত্রী বা সাবি। চিত্রিতা হিস্টিরিয়া রোগে ভোগে। দিদি সুন্দর, দিদি কবি, দিদিকে সবাই ভালোবাসে, তাকে কেউ ভালোবাসে না। মির্চাকে উপলক্ষ করে এই ঈর্ষা চরমে উঠল। দুটো উপন্যাসেই, অতিথি-অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে, তার হিস্টিরিয়ার আক্রমণ ঘটল মৈত্রেয়ীর জন্মদিনে, ১৯৩০-এ। এবং তারই কথাবার্তা শুনে মৈত্রেয়ীর মা বুঝতে পারলেন মির্চা-মৈত্রেয়ীর দৈহিক প্রণয়লীলার আসল চরিত্র, ফল, মির্চার বহিষ্কার। ১৯৩০ সালে মৈত্রেয়ীরা দুই বোন, দুই ভাই। ভাইরা খুবই ছোটো, মৈত্রেয়ী গাড়ি করে বেড়াতে যাওয়ার কথা ছাড়া ভাইদের কথা বেশি বলেননি। মির্চা তাঁর উপন্যাসে ভাইদের কথা তোলেনইনি।

দুটো উপন্যাসেই মির্চা-মৈত্রেয়ীর দৈহিক প্রেম শুরু হয় টেবিলের তলায় পা ঘষাঘষি দিয়ে। মির্চার উপন্যাসে, এই দৈহিক লীলা চরমে পৌঁছোয়, রাতের পর রাত মৈত্রেয়ীর মির্চার ঘরে যাওয়া দিয়ে। মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে এই লীলার বিস্তারিত বিবরণ নেই, তবে সম্পূর্ণ এড়িয়েও তিনি যাননি।

এই দৈহিক লীলার মধ্যেই বারেবারে রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েন। দুটো উপন্যাসেই আছে মৈত্রেয়ীর অন্যমনস্কভাবে খাতায় রবি ঠাকুরের নাম লিখে চলা, যাতে মির্চা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, *মহুয়া* কাব্যগ্রন্থ থেকে মৈত্রেয়ীর কবিতা মুখস্থ বলা, দুটো উপন্যাসেই আছে। যেটা নেই, সেটা অবশ্য মৈত্রেয়ীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শের বর্ণনা, মৈত্রেয়ী এটা লেখেননি, মির্চা বারেবারেই লিখেছেন। আগে যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়াও আছে এরকম :

1. She leaned over her book and began to write "Robi Thakur" in Bengali characters, then in European. I was irritated. Her passion for an old man of seventy unnerved me.

2. The battle lasted quarter of an hour. I took her hands, crushed them in mine. She was a charming sight, as she argued, grimaced, cried. She was doubtles invoking Tagore's help in her mind.

3. In the evening, she tells me she is in despair. Tagore has not written to her. The poet is much more than a guru to her : he is a friend, a confidant, a fiancé, a god — perhaps a lover. The declares to me that "no one suspects their relationship". Love, Bengal-style. Am I jealous ?

4. But what tortured me most of all was the spiritual rape. I was jealous of Achintya, a young poet — she had met him only once but she spoke to him on the telephone and sent him poems for the review 'Prabuddha Bharat'. I was jealous of a mathematician — he very rarely came to the house but Maitreyi had spoken of him enthusiastically, declaring that she liked great men. More than all the rest, I hated her guru, Robi Thakur.

5. I asked her again why we were forbidden to marry. She trembled. In order to test her, I asked her to repeat the mantra Tagore had given her as a talisman against impurity. She obeyed, but the spell was not broken, proving what I already knew — our attraction was more than merely physical. It was love, love reflected by the body's sincerity.

6. She showed me the box that Tagore had given her. It contained a curl of perfumed white hair.

"Do what you like with it. Burn it if you want. I cannot keep it any more. I did not love Tagore, my passion for him was a madness. He should have been nothing more to me than a guru. I thought I loved him in another way— but now I know...".

যৌন ব্যাপারে মৈত্রেয়ীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও দু একটি বিবরণ দুটো উপন্যাসেই আছে। পুরীতে ছোটোবেলায় বেড়াতে গেলে মন্দিরের মধ্যে অপরিচিত কেউ মৈত্রেয়ীর গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল। মির্চার উপন্যাসে ঘটনাটির বিশদ বর্ণনা আছে, কারণ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও আছেন। মৈত্রেয়ীর তখন বারো-তেরো বছর বয়স। যে-ছেলেটি পুরীর মন্দিরের ভিড়ে ছয়-ছয়বার মালাটি মৈত্রেয়ীর গলায় ঝুলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, সেই ছেলেটি শেষের বার মৈত্রেয়ীর মাকে প্রণাম করে অদৃশ্য হয়। ছেলেটি দেখতে সুন্দর ছিল।

She had loved that young man for years, even after she had began to love Tagore. (I held on to that detail : perhaps Maitreyi had also continued loving her guru after she had started to love me...she had told the poet about the incident. He had said that the young man was a messenger of Love and that those garlands possessed some symbolic meaning... .

মৈত্রেয়ীর উপন্যাসেও ঘটনাটির উল্লেখ আছে। হয়তো, ছেলেটির বাড়িতে কোনো মানত ছিল, সেইজন্য সে মৈত্রেয়ীর গলায় মালা দিচ্ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে, এইভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

শরীর সম্পর্কে সচেতন মৈত্রেয়ীকে নিয়ে মির্চা ঠাট্টাতামাশা করতেন। একটি বিদেশি স্বামী-স্ত্রীকে থিয়েটারে নিয়ে গেছেন মৈত্রেয়ীর বাবা। সেখানে স্বামীটি মৈত্রেয়ীর হাত ধরে টানাটানি করায় মৈত্রেয়ী তাঁকে জুতো মারবেন বলে বকে দেন, থিয়েটারের সবাই-ই প্রায় শুনতে পান সেই ভর্ৎসনা। দুটো উপন্যাসেই ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

বকুলবাগান লেনের সেই দোতলা বাড়ির একতলায় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বিরাট লাইব্রেরি ছিল। মির্চার উপন্যাসে প্রায় ৪০০০ বই, মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে ৭০০০-৮০০০ হবে। সেই বইগুলো ক্যাটালগ করতে বলেছিলেন মির্চা আর মৈত্রেয়ীকে সুরেন্দ্রনাথ। এই ক্যাটালগ করা মির্চা-মৈত্রেয়ীর পূর্বরাগ পর্যায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দুজনের একসঙ্গে *শকুন্তলা* পড়া, লাইব্রেরিতে এবং পরে খাবারের টেবিলের নীচে পায়ে-পা ঘষা দিয়ে তাদের দৈহিক প্রেমপর্বের সূচনা। ১৯৩০ সালে ২৮ জুলাই কলকাতায় ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের পরের দিন মির্চা মৈত্রেয়ীকে বই উপহার দেয়। ভূমিকম্পের পর উপহার দেওয়া নাকি পাশ্চাত্যরীতি। মির্চা দিয়েছিল গ্যেটের জীবনীর দুটো খণ্ড। মির্চার উপন্যাসেও ভূমিকম্পের পরে বই উপহারের কথা আছে, তবে বইয়ের নাম নেই, তবে বলা হয়েছে বইটি দামি।

অসংখ্য খুঁটিনাটি মিলে যায় দুই উপন্যাসে। মির্চা তাঁর উপন্যাস লিখেছেন তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞতার কিছু পরেই। ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন, ১৯৩১—৩২ মির্চা থাকেন হিমালয়ের নানান শৈলশহরে। ১৯৩৩-এ তিনি ইউরোপে ফিরে যান, ১৯৩৩-এরই জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লেখেন তাঁর প্রেমবৃত্তান্ত। উপন্যাস থেকেই জানা যায়, তিনি দিনলিপি রাখতেন এবং উপন্যাসে দিনলিপিটি ব্যবহার করেছেন। মৈত্রেয়ী তাঁর উপন্যাস লিখেছেন, ঘটনার তেতাল্লিশ বছর পরে। তিনি দিনলিপি রাখতেন কি না বলেননি, স্মৃতি থেকেই লেখা বলে মনে হয়, কিছুটা মির্চার উপন্যাসটি শুনে। তা সত্ত্বেও যে খুঁটিনাটিগুলো মিলে যায়, সেটাই বিস্ময়কর।

একটি ব্যাপারে অবশ্য দুই উপন্যাসে অমিল লক্ষ করতেই হয়। মৈত্রেয়ী লিখেছেন, মির্চাকে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। সেই দেখা করার বিশদ বিবরণ আছে তাঁর উপন্যাসে। মির্চা তাঁর উপন্যাসে এটার কোনো উল্লেখই করেননি। তিনি ব্যারাকপুর, হুগলি, চন্দননগর, বেলুড়, বাংলা দেশের নানা জায়গায় মৈত্রেয়ীদের সঙ্গে বেড়ানোর কথা লিখেছেন, কিন্তু শান্তিনিকেতনের কোনো উল্লেখ নেই। যে-রবীন্দ্রনাথকে মির্চা তাঁর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন, রবি ঠাকুরের মৈত্রেয়ীর জীবনে পদে পদে উপস্থিতি দেখে জ্বলেপুড়ে মরেন, সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলে মির্চা তাঁর উল্লেখ করবেন না, এটা বিশ্বাস করা যায় না। মৈত্রেয়ী এই সাক্ষাৎকারটি বানিয়েছেন বলেই মনে হয়, কারণ, পুরো ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাইরে ছিলেন, ফেব্রুয়ারির কয়েকটি দিন ছাড়া। ফেব্রুয়ারি মাসে সবে ভবানীপুরের বাড়িতে এসেছেন মির্চা, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি তখনও, ফলে, তখনই মৈত্রেয়ী তাঁর প্রেমিককে কবি-সন্দর্শনে নিয়ে গেছেন, এটা সম্ভবপর নয়।

ভবানীপুরের বাড়িতে লোকজন সম্পর্কে মির্চা যা লিখেছেন, সেটাও মৈত্রেয়ীর উপন্যাসের সঙ্গে মেলে। নরেন্দ্র সেনের (সুরেন্দ্রনাথের) খুড়তুতো ভাই মন্টু, বছর তিরিশ বয়স, ভবানীপুরে থাকতে এল। সরকারি কমার্শিয়াল স্কুলের শিক্ষক। ভবানীপুরের বাড়িতেই তার বিয়ে হল, কনের নাম লীলা। মন্টু আর লীলা মির্চা-মৈত্রেয়ীর প্রেমলীলায় সাহায্য করবে। এই বিয়ে উপলক্ষে আসা আর এক আত্মীয় খোকার সঙ্গে মৈত্রেয়ীর দৈহিক ঘনিষ্ঠতা মির্চার ঈর্ষার উদ্রেক করবে। ভবানীপুর থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর খোকাই হবে মির্চা-মৈত্রেয়ীর যোগাযোগের সূত্র। খোকার বোন শান্তিও মির্চা-মৈত্রেয়ীর যোগাযোগে সাহায্য করে। দুটো উপন্যাসে বর্ণিত এই চরিত্রগুলো বাস্তব জীবনেও সত্য।

খুঁটিনাটির মিল আরও আছে। ভবানীপুরে এসে মির্চা দেখে মৈত্রেয়ী ছাতিমগাছ নিয়ে কবিতা লেখে, চাবু গাছ নিয়ে গল্প বানায়। দর্শনের ছাত্র মির্চা এই বৃক্ষপ্রীতির মধ্যেই প্রাচ্যদেশীয় pantheism খুঁজে পায়। সূর্য দেখতে মির্চাকে নিয়ে মৈত্রেয়ী ছাদে ওঠে। সূর্য দেখার জন্য ছাদে ওঠা মির্চার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। দর্শনের ছাত্র মির্চা মৈত্রেয়ীর দার্শনিক কবিতা লেখা বাচ্চা মেয়ের পাকামি মনে করে, রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতা পছন্দ করেন শুনে রবীন্দ্রনাথের উপরও বিরক্ত হয়। ১৯৩০ সালে কলকাতা শহর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে, রাস্তাঘাটে এই আন্দোলনে মির্চাও অংশ নেয়। হিন্দু ধর্মে আকৃষ্ট মির্চা শেষপর্যন্ত হিন্দু হয়ে যাবে, মির্চার সাহেব বন্ধুদের এই জল্পনা সুরেন্দ্রনাথের পরিবারেও ছড়িয়ে পড়বে। জামাকাপড় পরায়, চালচলনে মির্চার বাঙালি হয়ে যাওয়া কলকাতার বিদ্বজ্জনের মধ্যে খবর হয়ে ওঠে।

মির্চা-মৈত্রেয়ীর দৈহিক ঘনিষ্ঠতা আঁচ পেয়েছিলেন মৈত্রেয়ীর মা। মৈত্রেয়ী মির্চাকে চিঠি লিখে সাবধান করে দেয় আর বলে, মা এখনও কিছু জানে না, মির্চা যেন সবকিছু বলে না দেয়। মির্চা বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলে খোকার হাত দিয়ে মৈত্রেয়ী এক খণ্ড *উদিতা* পাঠায়, আর তার পাতায় লেখে 'To my love, to my love, Maitreyi, Maitreyi.'। অন্য পাতায় লেখা : 'I have said nothing that incriminates you, only that you kissed me on the forehead. I had to admit, it was our mother and she (Maitreyi's sister) knew."। একই বার্তা পাওয়া যায় মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে। *উদিতা*-র শেষের পৃষ্ঠায় মৈত্রেয়ী লিখে পাঠিয়েছিলেন, 'Mircea Mircea Mircea— I have told my mother that you have only kissed me on my forehead.'।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ভবানীপুরের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর মৈত্রেয়ী-সংক্রান্ত যেসব ঘটনা মির্চা লিখেছেন, তার সঙ্গে মৈত্রেয়ীর উপন্যাসের কোনো মিল নেই। বিতাড়িত হওয়ার পর মির্চা তার পুরোনো বন্ধুদের আস্তানায় ফিরে আসে। খোকা মির্চার জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিয়ে যায়, মৈত্রেয়ীর পাঠানো চিঠি পায়, মৈত্রেয়ী ফোন করে, মির্চা কথা বলে। এর পরে মধ্যে মধ্যেই খোকা আসে, মির্চার কাছে টাকা ধার নিতে, পরিবর্তে দিয়ে যায় নানা খবর। চাবু মারা গেছে। মৈত্রেয়ীকে মেদিনীপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জোর করে তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু মৈত্রেয়ী হবু স্বামীকে সব কথা বলে দেবে (মির্চার সঙ্গে সহবাস) এমন ভয় দেখানোয়, মৈত্রেয়ীর বাবা-মা লোকনিন্দার ভয়ে আর বিয়ে দেননি। কিন্তু মৈত্রেয়ীকে মারধোর

করা চলতে থাকে, বাড়ির শোফারকে দিয়ে মারা হয়, খোকাকে দিয়ে মারার চেষ্টা চলে (খোকা অবশ্যই পালিয়ে যায়)। বাবা-মার বিরুদ্ধে শেষ বিদ্রোহ হিসাবে মৈত্রেয়ী এক ফলওয়ালার সঙ্গে সহবাস করে এবং গর্ভবতী হয়। তার আশা ছিল, এমন দুষ্কর্মের জন্য তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তার পর মির্চার সঙ্গে মিলিত হবে সে। কিন্তু মৈত্রেয়ীর বাবা-মা তাকে নিয়ে মেদিনীপুরে চলে যান, গর্ভপাত করান, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব তথ্য মির্চা পায় খোকার কাছ থেকে, এবং বিশ্বাস করে। মির্চা নিজেও পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে, শেষপর্যন্ত হৃষীকেশ, রাণীক্ষেতে আশ্রয় নেয়। শেষপর্যন্ত এক ইউরোপীয় রমণীর সঙ্গে সহবাস করে নিজে মৈত্রেয়ী-স্মৃতি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে।

বলা বাহুল্য, মৈত্রেয়ীর উপন্যাসে এসব ঘটনা নেই। তাকে মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অসমাপ্ত শিক্ষা আবার শুরু হয়েছে, অনায়াসেই পড়া সাঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে। মৈত্রেয়ীর উপন্যাস এর পরেও চলবে ১৯৭৩ পর্যন্ত — মির্চার উপন্যাস ১৯৩০-৩২-এই শেষ। মৈত্রেয়ী তাঁর জীবনকাহিনী বলার সময় সত্যভাষণ করছেন কি না, সেটা আমাদের বিচার্য নয়। বিচার্য, মির্চা যা লিখেছেন তা কত দূর সত্য। মির্চা-মৈত্রেয়ী সম্পর্কও আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। মির্চা রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে যেসব কথা বলেছেন, সেসব কথার উৎস কী, সেটাই বোঝার চেষ্টা আমাদের।

লা নুই বেঙ্গলি-তে কলকাতা আর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পরিবারের যে-ইতিহাস পাওয়া যায়, তার বহু অংশ বাস্তব সত্য। মির্চার সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে থাকা এবং সেখান থেকে বহিষ্কার বাস্তব সত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৯৩০ সালে মৈত্রেয়ীর সৌন্দর্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া আর সেখানে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি বাস্তব সত্য, জুলাই মাসে ভূমিকম্প, আগস্ট মাসে নিউ এম্পায়ারে উদয়শঙ্করের নাচ, ১৯৩০ সালে মৈত্রেয়ীর উদিতা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ — সবই বাস্তব সত্য। ১৯৩০ সালে কলকাতার রাস্তায় ছাত্রদের আন্দোলন, সেটাও বাস্তব ঘটনা। পারিবারিক জীবনে মৈত্রেয়ীর অভিজ্ঞতা দুটো উপন্যাসেই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে মিলে যায়, যদিও মৈত্রেয়ী মির্চার বই ভালো করে না পড়েই লিখছেন তাঁর উপন্যাস। অতএব আমরা মনে করি, রবীন্দ্রনাথের যে-ছবি মির্চা এঁকেছেন মৈত্রেয়ী-রবীন্দ্রনাথের প্রেম সম্পর্কে, সেটা তিনি এঁকেছেন মৈত্রেয়ীর মুখে শুনেই। কিন্তু ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত মৈত্রেয়ী তাঁর নিজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-প্রেমের চিত্র মির্চার কাছে তুলে ধরেছেন, তার কোনো প্রমাণ দাখিল করেননি পরবর্তী জীবনে। মির্চা মৈত্রেয়ীকে চিনতেন তাঁর ১৬ বছর বয়স পর্যন্তই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কল্পনা করে আরও এক কিশোরী, রাণু অধিকারী, এক ফ্যান্টাসির জগৎ তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রাণুকে অসংখ্য চিঠি লেখেন, যা থেকে রাণুর ফ্যান্টাসির কারণ তবু অনুমান করা যায়। মৈত্রেয়ী দেবী তেমন কোনো সাক্ষ্য দিয়ে যাননি।

স্বর্গের কাছাকাছি (মে ১৯৮১-তে প্রথম প্রকাশ, *ন হন্যতে*-র সাত বছর পরে) গ্রন্থে মৈত্রেয়ী তাঁর রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি কবির যতই ঘনিষ্ঠ হোন না কেন, ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যে হননি, সেটা *স্বর্গের কাছাকাছি*-তেই স্পষ্ট।

মির্চা জানেন, ১৯৩০ সালে ছাড়া মৈত্রেয়ী শান্তিনিকেতনে যে-কটা গ্রীষ্ম কাটিয়েছেন,

১৯২৭ সাল থেকে (তেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বই পড়ার পর)। তিনি কবির পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন, কবির বাড়িতে। রাত্রে, কতবার, মৈত্রেয়ী কবির পায়ের কাছে বসে কবির কথা শুনতেন, কবি মৈত্রেয়ীর চুলে হাত বুলোতেন। *স্বর্গের কাছাকাছি*-তে ছবিটি অন্যরকম। বাবার উৎসাহে ১৯২৭ সালে মৈত্রেয়ী প্রথম তাঁর কবিতা পাঠান কবির কাছে, যখন, যেমন মির্চা জানেন, তাঁর বয়স তেরো। জোড়াসাঁকোতে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান ওই বছর ডিসেম্বরে। কিছুদিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে দেখা করতে তিনি গেলেন বাবা-মায়ের সঙ্গেই। বাবা তাঁর কবিতা কবিকে দেখিয়ে অনুরোধ করলেন ছন্দ ব্যাপারটা মৈত্রেয়ীকে বুঝিয়ে দিতে। কবি অনুরোধ রক্ষাও করলেন। ১৯২৮ সালে কবি কলকাতায় এলে মৈত্রেয়ী দেখা করতে যেতেন। সেই বছর পৌষমেলায় শান্তিনিকেতন গেছেন, কিন্তু তখন মেলার অজস্র ভিড়, কবিকে একা পাওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মতো, তাঁর শিষ্যা মৈত্রেয়ী সনতারিখের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন, সুতরাং কখন কবে তিনি কবির সাক্ষাৎ পেয়েছেন সেটা স্পষ্ট বলা সম্ভব নয়। তবে ১৯৩০-এর আগে, শান্তিনিকেতনে বা জোড়াসাঁকোর নিভৃতে তিনি কবিকে পেয়েছিলেন তেমন দাবি তিনি করেননি *স্বর্গের কাছাকাছি*-তে। যতবার শান্তিনিকেতন গেছেন, গেছেন বাবা-মায়ের সঙ্গে। অন্যান্য অতিথিরা যেভাবে থাকেন, তাঁরাও সেইভাবেই থাকতেন। কবিগৃহে দিনের পর দিন বা রাতের পর রাত কবিকে একলা পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

কবির চুলের গোছা সংগ্রহ করার ব্যাপারে মৈত্রেয়ী *স্বর্গের কাছাকাছি*-তে লিখেছেন কবি যখন মুকুল দে-র চৌরঙ্গির সরকারি বাড়িতে ছিলেন তখন একদিন তিনি সে-বাড়িতে যান। কবি তখন নিজের হাতেই নিজের চুল কাটছেন। মৈত্রেয়ী কিছু চুল কুড়িয়ে নিলে কবি তাকে জানান, রাণু (মুখার্জি) আগেই সংগ্রহ করেছে চুল। রাণুর সংগ্রহ এখনও কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে রক্ষিত আছে। কবি চৌরঙ্গিতে ছিলেন ১৯২৮ সালের ৮ থেকে ৩১ আগস্ট। মির্চার বিবরণেও আছে দু-বছর আগে কবি মৈত্রেয়ীকে চুলের গুছি রাখার একটি সুগন্ধি কাঠের বাক্স দিয়েছিলেন। মির্চার সঙ্গে সান্নিধ্যের চরম এক মুহূর্তে মৈত্রেয়ী সেই বাক্সটা মির্চাকে দিয়ে দেয়, তার আর প্রয়োজন নেই সেই চুলে। মির্চা তাঁর উপন্যাসে লেখেননি তিনি বাক্সটা নিয়েছিলেন কি না, বা বাক্সটার কী হল। চুলের গুছি নিয়ে মৈত্রেয়ী শেষপর্যন্ত কী করলেন, তার হদিশ দেননি *স্বর্গের কাছাকাছি*-তে।

স্বর্গের কাছাকাছি-তে কবির লেখা যেসব চিঠি মৈত্রেয়ী উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে দেখা যায়, চিঠিগুলো (১৯৩০ পর্যন্ত) লেখা শান্তিনিকেতন বা কলকাতা থেকে, একটি আমেদাবাদ থেকে। সুতরাং মির্চা যখন লেখেন সেই কাঠের বাক্সে চুলের সঙ্গে মৈত্রেয়ী কবির লেখা চিঠি রাখতেন, যেসব চিঠি কবি লিখতেন জগতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, তখন মনে হয়, কবির চিঠি নিয়ে মৈত্রেয়ী মির্চার কাছে সামান্য বাগাড়ম্বর করে থাকবেন। এইসব চিঠিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ কমই আছে, বেশির ভাগই আসা-যাওয়া নিয়ে, আর কিছুটা দার্শনিক তত্ত্ব। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করতেন কবি, কারণ মৈত্রেয়ীর চিঠি প্রায়শই মৈত্রেয়ীর একার চিঠি থাকত না, তাঁর বাবাও ভাবে ও ভাষায় সেই চিঠিতে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৩০ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে-মৈত্রেয়ীকে চিনতেন সেই মৈত্রেয়ী যতটা রবীন্দ্রভক্ত বা উদীয়মান

কবি, তার চাইতে বেশি দার্শনিক সুরেন দাশগুপ্তের কন্যা। রাণুর কাছে কবির লেখা চিঠিগুলোর সঙ্গে মৈত্রেয়ীকে লেখা চিঠির পার্থক্য এখানে।

ফলে, মির্চার উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যে-ছবি ফুটে উঠেছে, সেটার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। মির্চার উৎস নিশ্চয়ই তরুণী মৈত্রেয়ীর কবিকে নিয়ে Sex fantasy।

পুনশ্চ ১

ন হন্যতে উপন্যাসে মৈত্রেয়ী দেবী কোথায়ও বলেননি, তিনি মির্চার উপন্যাস পড়েছেন। তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে মির্চার উপন্যাসের কথা শুনেছেন। *স্বর্গের কাছাকাছি*-তে মির্চার কোনো উল্লেখ নেই, মির্চাকে নিয়ে শান্তিনিকেতন যাওয়া তো নয়ই।

মির্চার উপন্যাসের কথা মৈত্রেয়ী কবে থেকে শুনছেন? *ন হন্যতে* উপন্যাসে তিনি জানিয়েছেন, ১৯৩৮ সালে তিনি প্রথম শোনেন মির্চা তাঁকে একটি বই উৎসর্গ করেছেন এবং উৎসর্গপত্রে মৈত্রেয়ীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। খবরটি দিয়েছিলেন মৈত্রেয়ীর বাবা। বাবা এটাও জানান, পর্নোগ্রাফি লেখার জন্য মির্চার জেল হয়েছে। মৈত্রেয়ীকে কেন মির্চা বই উৎসর্গ করবেন, ক্ষমাই বা চাইবেন কেন, পর্নোগ্রাফি কি ওই বইটাই — মৈত্রেয়ী কিছুই বুঝলেন না, এবং বইটি সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই হল না তাঁর। ১৯৫৩ সালে স্বামীর সঙ্গে ইউরোপে বেড়াতে গেলে, সুরেন্দ্রনাথের এক ইউরোপ-প্রবাসী ছাত্রের মুখে মৈত্রেয়ী আবার শুনলেন, মির্চা, মৈত্রেয়ীকে বই উৎসর্গ করেছেন। মৈত্রেয়ী এবারও কথা বাড়াননি। সে-বছরই প্যারিসে জনৈক নিকোলাই স্তানেস্কু দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয় মৈত্রেয়ীর। ওঁরা মির্চার দেশের লোক, তখন দেশ থেকে নির্বাসিত। মৈত্রেয়ী শ্রীমতী স্তানেস্কুকে জিজ্ঞাসা করলেন, মির্চা নামে কোনো লেখককে তিনি চেনেন কি না। উত্তরে শ্রীমতী স্তানেস্কু মৈত্রেয়ীকে দিলেন 'যোগ'-এর উপর মির্চার লেখা একটি বৃহৎ গ্রন্থ। মৈত্রেয়ী অবাক হলেন, বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে। যে-সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে তাড়িয়েছেন, তাঁকেই উৎসর্গ। এ তো একেবারেই কেরিয়ারিস্ট কচ! স্তম্ভিত এবং ক্রুদ্ধ মৈত্রেয়ীকে শ্রীমতী স্তানেস্কু জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিই কি মির্চার প্রথম প্রণয়িনী? এবারেও মৈত্রেয়ী কথা বাড়াননি। নানা শহরে বেড়িয়ে প্যারিসে আবার ফিরলেন যখন তখন আবার এক রুমানিয়ান ভদ্রলোক হোটেলে মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিই কি মির্চার মৈত্রেয়ী? তাঁর হাতে মৈত্রেয়ী মির্চাকে চিঠি লিখলেন — মির্চা তখন প্যারিসেই আছেন এবং মৈত্রেয়ীদের হোটেলের কাছেই — মির্চা কি লন্ডনে দেখা করতে পারে? মির্চা চিঠির উত্তর দেননি, দেখাও করেননি। ১৯৫৬ সালে মৈত্রেয়ী আবার ইউরোপে। একটি সভায় একটি মেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তিনিই কি মির্চার মৈত্রেয়ী? মেয়েটি তাঁকে জানাল, মির্চা ফ্যাসিস্ট হয়ে গেছেন। ১৯৫৮ সালে মৈত্রেয়ী আবার শুনলেন মির্চার কথা। তাঁর পরিচিত কোনো গবেষক তাঁকে এক লাইব্রেরিতে জানালেন, প্যারিসে মির্চার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, মির্চার উপন্যাস তিনি পড়েছেন এবং জেনেছেন, মৈত্রেয়ী রবি ঠাকুরকে ভালোবাসতেন, তা হলে আর সুরেন্দ্রনাথের উপর মৈত্রেয়ীর রাগ কেন (সুরেন্দ্রনাথ-সুরমার প্রেমের ইঙ্গিত দিয়ে)। উত্তর না খুঁজে পেয়ে মৈত্রেয়ী বাড়ি ফিরে গেলেন। ১৯৭১ সালে মৈত্রেয়ী আবার মির্চার বইয়ের কথা শুনলেন। জনৈকা পার্বতী তাঁকে জানালেন, বছর-দুই আগে তাঁর সঙ্গে 'জ'-এর আলাপ হয়েছিল। 'জ'-এর সঙ্গে মির্চার পরিচয় হয়েছিল, মির্চা 'জ'কে একটি বই

দিয়েছিলেন, যাতে বাংলায় লেখা ছিল মৈত্রেয়ীর কথা, মৈত্রেয়ী কি তাঁকে মনে রেখেছেন, ক্ষমা করেছেন? পার্বতীর কাছ থেকে 'জ'-এর ঠিকানা নিয়ে, 'জ'-এর কাছ থেকে মির্চার ঠিকানা নিয়ে মির্চাকে চিঠি দিলেন, উত্তর এল না। ১৯৭১ সালেই এক বাঙালি দম্পতির কাছে মৈত্রেয়ী শুনলেন, একটা বই পড়ছেন তাঁরা, মৈত্রেয়ীর নাম আছে তাতে, সে কি তিনিই? মৈত্রেয়ী আবার এড়িয়ে গেলেন। ১৯৭২ সালে মৈত্রেয়ী কলকাতায় খোঁজ পেলেন রুমানিয়ার সেরগেই সেবাস্টিন-এর। তিনি জানালেন, মির্চার বই থেকে রুমানিয়ার সবাই মৈত্রেয়ীকে চেনে। মির্চা, তারা জানে, মৈত্রেয়ীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু হিন্দু-খ্রিস্টান ধর্মবিরোধে বিয়ে হয়নি। এই প্রথম মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, বইটিতে কী আছে? সেবাস্টিন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে গল্পটা বলল। রাত্রে মৈত্রেয়ী মির্চার ঘরে যেত শুনে মৈত্রেয়ী ক্রুদ্ধ হলেন, মিথ্যা কলঙ্কলেপনে। জিজ্ঞাসা করলেন, মৈত্রেয়ীর নাম করেই উপন্যাসটি লেখা কেন? ভদ্রলোক বললেন, নামের বন্ধন কাটানোর জন্যই নামটি দিয়েছে মির্চা। তিনি আরও জানালেন, মৈত্রেয়ীর মির্চাকে দেওয়া কবিতার বইটি সেবাস্টিনের কাছেই আছে, যাতে মৈত্রেয়ী লিখেছিলেন, কপালে চুমু খাওয়া ছাড়া আর কিছু যেন মির্চা স্বীকার না করে।

বইটি না পড়েও মৈত্রেয়ী বইটির অনেক খুঁটিনাটি জানতেন, এটাই আশ্চর্যের। দুই উপন্যাসের যেখানে মিল আছে, সেই মিল বাস্তব সত্য বলেই হয়তো আছে। কিন্তু দু একটি ক্ষেত্রে সংশয় থেকেই যায়। মির্চাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তার পরেও, মৈত্রেয়ী মির্চার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে শুনে সুরেন্দ্রনাথ মির্চাকে লেখেন : তুমি ছিলে তৃণাচ্ছাদিত সর্প আর সাপ যখন মাথা তোলে তখনই তাকে মারতে হয়। এই চিঠির কথা বা ভাষা মৈত্রেয়ীর জানার কথা নয়। কিন্তু ওই ভাষাতেই সুরেন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছিলেন, মির্চা জানিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে : ...but I see now that you are like a snake in the grass whose head must be cut off... । এই ধরনের মিল থেকে সন্দেহ জাগে মৈত্রেয়ী কি সত্যই উপন্যাসটি পড়েননি? রুমানিয়ান বা ফরাসি কোনো ভাষাই তিনি জানেন না, কিন্তু পুরো উপন্যাসটির অনুবাদই কি তিনি শুনেছিলেন? না হলে, খুঁটিনাটির মিল কীভাবে সম্ভব। অবশ্য এটা সম্ভব, সুরেন্দ্রনাথের এই চিঠিটির কথা মৈত্রেয়ী তখনই জেনেছিলেন খোকার মাধ্যমে, যে-খোকা মির্চা আর মৈত্রেয়ীর যোগসূত্র ছিল অল্প কাল, মির্চার বিতাড়নের পরে।

পুনশ্চ ২

স্বর্গের কাছাকাছি-তে রবীন্দ্রনাথের যেসব চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে, মির্চা প্রসঙ্গে তার দুটি বিবেচনা করা যেতে পারে। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ৮ জানুয়ারি ১৯৩০ তারিখের চিঠিতে লেখেন, 'তোমার অল্প বয়স, সর্বদা নিজের মনটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়'। মৈত্রেয়ী জানিয়েছেন, তাঁর মনের কোন্ উদ্‌বেগের কথা তিনি কবিকে জানিয়েছিলেন, তাঁর মনে নেই। এটা মির্চা-সংক্রান্ত কোনো উদ্‌বেগ হওয়ার কথা নয়। মির্চা ১৯৩০ সালের প্রথমেই ভবানীপুরের মৈত্রেয়ীদের বাড়িতে থাকতে এসেছে, ৮ জানুয়ারির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের আর-একটি চিঠির সঙ্গে মির্চার যোগ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। ১৪ শ্রাবণ ১৩৩৮-এর এই চিঠিতে কবি লিখেছেন, 'তোমার চিঠিতে যে বেদনা প্রকাশ পেয়েছে তাতে

আমি অত্যন্ত পীড়া বোধ করলুম'। এই চিঠিটা মৈত্রেয়ী *ন হন্যতে* উপন্যাসেও ব্যবহার করেছেন, মির্চার প্রসঙ্গেই। *স্বর্গের কাছাকাছি*-তে মির্চা নেই।

উদিতা কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন রবীন্দ্রনাথ ২৬ নভেম্বর ১৯২৯ (১১ মাঘ ১৩৩৫ সালে। এ-সময়ে মৈত্রেয়ীর বয়স ১৫। বন্ধুকন্যাদের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লেখা রবীন্দ্রনাথের নতুন নয়। মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা দেবী (১৯০৬—১৯৩১) বা বুলার কাব্যগ্রন্থ *বাতায়ন* ওই একই সময়ে (২৪ এপ্রিল ১৯৩০) প্রকাশিত হয়েছিল, ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা সরযূবালা দাশগুপ্তার *বসন্ত-প্রয়াণ*-এর ভূমিকা লিখেছিলেন বহু আগে, ১৯৩১ সালে। *উদিতা*-র কাব্যমূল্য সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবী বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি তাঁর *ন হন্যতে* বা *স্বর্গের কাছাকাছি*-তে। সম্ভবত, *উদিতা*-র কবিতায় সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবের জন্যই, যে-দার্শনিকতা মির্চার কাছে হাস্যকর লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, চিঠিতে দার্শনিকতা ছেড়ে নিজের কথা লিখতে।

বুদ্ধদেব বসু পাঠের ভূমিকা

অমিয় দেব

প্রথম যৌবনে তাঁর এক পাণ্ডুলিপির (২২ মার্চ ১৯২৯) তলায় বুদ্ধদেব বসু লিখে রেখেছিলেন, 'I am feeling so perfectly happy that I cannot proceed any further'। কবিতাটি প্রায় একটানা লেখা, চোদ্দো লাইনে মাত্র দু-জায়গায় ঈষৎ দ্বিধার চিহ্ন আছে। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে (মার্চ ১৯৭৪) *মহাভারতের কথা*-র 'মুখবন্ধ' তিনি বলেছিলেন, 'আমার অত্বর-তৃপ্ত শোধন-স্পৃহার তাড়নে, আদি রচনার অনেক অংশ ক্রমে-ক্রমে নতুন ক'রে লিখেছি, যোগ করেছি অনেক নতুন প্রসঙ্গ ও টীকা — প্রুফ সংশোধনের সময় পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার বিরাম ছিলো না'। ত্বর-তৃপ্তি থেকে অত্বর-তৃপ্তিতে এই উদ্‌বর্তন বোধ করি বুদ্ধদেব বসু পাঠের এক প্রধান সূত্র, নইলে একই সঙ্গে *বন্দীর বন্দনা* আর *যে-আঁধার আলোর অধিক* আমরা পড়ে উঠতে পারব না, কিংবা *সাড়া* আর *প্রেমপত্র*। আর পড়তে তো আমাদের হবে একই সঙ্গে, এমনকী হয়তো বইয়ে বইয়ে মিলিয়ে-মিলিয়ে, কারণ আমরা বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বেড়ে উঠিনি, তাঁকে খুলে বসেছি এখন। আর যারা আমাদের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে তাঁর লেখা পড়তে শুরু করেছি তারা হয়তো সেই পাঠের স্মৃতিকে অতিক্রম করে উঠতে পারি না। চাই বা না চাই, ফিরে যাই সেই সময়েই, কিন্তু তিরিশকে-চল্লিশকে পুরো মেলাতে পারি না তার সঙ্গে; খালি পঞ্চাশের অনুরূপ রচনাভঙ্গির স্বাক্ষর খুঁজি। *বন্দীর বন্দনা* কী *কঙ্কাবতী* কি তেমন সুখের হয় *আটচল্লিশের শীতের জন্য*-র পরে! অতএব স্বাগত জানাই সেই নবীন পাঠককে যার পাঠ পুরোপুরি নতুন, যে স্মৃতির নিগড় থেকে মুক্ত।

ত্বর-তৃপ্তির এক ব্যাখ্যা হয়তো আছে প্রেরণা নাম্নী ইন্দ্রজালে এবং যৌবনে বুদ্ধদেব বসুর তাতে আস্থা ছিল। ১৯৩৮-এ বিষ্ণু দে-র *চোরাবালি*-র যে-পত্রসমালোচনা তিনি 'কবিতা' পত্রিকায় লিখেছিলেন তার শেষে ছিল : 'সুধীন্দ্রনাথের মারফৎ জানলুম (*চোরাবালি*-র সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কৃত 'মুখবন্ধ' থেকে) যে আপনার মতো ''এলিয়ট-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না।'' তবে কিসের তাড়নায় লেখেন?' (*কালের পুতুল*-এ সংকলিত, ২য় সংস্করণ, পৃ ৭৯)। আর এর আগেই সুধীন্দ্রনাথের *অর্কেস্ট্রা* কাব্যগ্রন্থের রিভিউ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কবিদের মধ্যে দুটো জাত আছে : যাঁরা ঝোঁকের মাথায় লেখেন, আর যাঁরা ভেবে-চিন্তে লেখেন; যাঁরা কবিতা লেখেন না-লিখে পারেন না ব'লে, আর যাঁরা লেখেন লিখতে হবে ব'লেই। কোনো-কোনো কবি আছেন স্বভাবতই মাতাল, কোনো কোনো কবি নিতান্ত প্রকৃতিস্থ। প্রথম জাতের কবিদের আবেগই হ'লো উৎস, দ্বিতীয় জাতের কবিরা বুদ্ধিনির্ভর। কবিতায় এই দুটি ভাবে কখনো মেলামেশা হয় না এমন নয়, তবু এই আলাদা দুই জাত স্পষ্ট চেনা যায়। শেলি, ওয়র্ডস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাতের; মিলটন, মধুসূদন, মোহিতলাল দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত' (তদেব, পৃ ৬৪)। বুদ্ধদেব বসু নিজে কোন্ দলের তাতে বোধ হয় সংশয় নেই। আর তাঁকে তখন সুধীন্দ্রনাথের মনে হত 'সহজ কবি'। 'মনে পড়ে আপনার একেবারে প্রথম যুগের এক পুস্তক-সম্বন্ধে জনৈক বন্ধু আমার মতামত জানতে চাওয়ায় আমি তাঁকে বলেছিলুম যে সমসাময়িক বাংলায় আপনিই বোধহয় একমাত্র সহজ কবি'। (১মে ১৯৫৩-তে 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি

থেকে, 'কবিতা', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-স্মৃতিসংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭, পৃ ৩৪)। আর পরের একটা চিঠিতে এই কথাটাই একটু অন্যভাবে বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, '...আপনার মতো লেখকের মানসজীবনে কবিতাই সর্বাগ্রগণ্য — অর্থাৎ আপনি বা রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞানত সব সময়েই কাব্যরচনায় ব্যস্ত, এবং সেই জন্যে যখন কাগজ-কলম নিয়ে আপনারা স্পষ্টত লিখতে বসেন, তখন মনে হয় আপনাদের লেখনী যেন তৈরী লেখা লিখে যাচ্ছে'। (৩ জুলাই, '৫৩, তদেব, পৃ ৩৪-৩৫)।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বুদ্ধদেব বসুর 'সহজতা'কে কীভাবে বুঝেছিলেন তার চাইতেও এই মুহূর্তে আমাদের কাছে জরুরি তাঁর ত্বর-তৃপ্তি আজ আমাদের চোখে কেমন লাগে। বুদ্ধদেব বসুতে সুধীন্দ্রনাথ বিপ্রতীপ দর্শন করেছিলেন, আমরা বুদ্ধদেব বসুর ত্বর-তৃপ্তিতে বুদ্ধদেব বসুরই অত্বর-তৃপ্তির বৈপরীত্য অবলোকন করছি। সুতরাং বুদ্ধদেব বসু এক নন, বুদ্ধদেব বসু দুই, হয়তো প্রস্তাবনায় তাই। হয়তো পরিণতিতে পৌঁছে দেখব দুই বুদ্ধদেব আসলে এক, কিন্তু এই মুহূর্তে তো তা দেখছি না। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যৌবনের উচ্ছ্বাস আর প্রৌঢ় বয়সের সংযম, একদিকে শব্দের জাদুতে উদ্‌বেল হয়ে ওঠা, অন্যদিকে শব্দের মোহ থেকে মুক্তি, একদিকে আয়াসহীন স্বাচ্ছন্দ্য, অন্যদিকে কঠিন আয়াস। 'ভুলে যা ঝংকার, ঝর্না, বরদাত্রী কঙ্কাবতীরে/যার ঠোঁট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্বরলিপি শিখেছিলি তুই' — বলছেন যৌবনোত্তীর্ণ কবি, এবার শ্রমিকের সেতুবন্ধন। 'যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবর যুবতী'-র মতো শব্দপ্রয়োগ কি ভাবা গিয়েছিল সেই 'তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো'-র কালে! কোথায় গেল সেই দেহোত্তর আত্মপ্রত্যয় : 'আমি যে রচিব কাব্য, এ-উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার।/তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার!' বদলে শুনছি 'শিল্পীর উত্তর':

...কিন্তু সেই প্রতারক, সমর্থ, সজ্ঞান,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি বেছে নেন উত্তরচরিতে
তুচ্ছ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন গুপ্ত ঋতে
গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে তূণ?
সারথি নিস্পৃহ যবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।

বদলে শুনছি :

কিন্তু মাছ ধরা বড়ো শক্ত কাজ। দেয় হানা রাক্ষস ভোঁদড়।
মাঝে-মাঝে অজন্মা বছর যায়। কখনো বা বাতে সে অক্ষম।
কিংবা প্রতিযোগিতায় ধূর্ত মাছ আরো ধুরন্ধর।
চেষ্টা তাকে তবুও দেয় না ছুটি। চাই ধৈর্য, বড়ো বেশি শ্রম।

এমনকী দেখি এক 'বৃদ্ধ কবি'-কে :

স্ত্রী তাকে বলেছিলেন লোলচর্ম কুৎসিত লম্পট —
তারও পরে বহুদিন গত হ'লো; এখন সে নয় আর একা।
আছে এক নিত্য-সঙ্গী— আগন্তুক, নির্বোধ, উদ্ভট,
সে বোঝে না তার ভাষা, ভিন্ন জাতি, অন্য পৃথিবীর —

অস্ত্রোপচারের পরে যন্ত্রণায় যার পেয়ে দেখা
ভেবেছিলো : 'কী আশ্চর্য! এই তবে আমার শরীর!'

ত্বরতা-অত্বরতার আর-একটা তফাত বোধ করি ভাবপ্রবণতা বনাম বস্তুনিষ্ঠা তথা বিষয়ী বনাম বিষয়ের নিরিখেও দ্রষ্টব্য। বস্তুর সঙ্গে আড়ি পাতিয়ে কবি হওয়া যায় না, কিন্তু ভাবের প্রাবল্যে অনেক সময়ই বস্তু ভেসে যায়; কেবল নামরূপই থাকে তার, রূপ থাকে না। *বন্দীর বন্দনা*-র 'মানুষ' নামক কবিতাটির প্রথম স্তবকে বর্ণনা আছে, কিন্তু তা বিবমিষারঞ্জিত, ফলে বিশেষণবহুল, অতিকৃত :

যেখানে পেতেছে কাম আপনার স্বর্ণ-সিংহাসন,
রক্তবর্ণ পঙ্কফল ঝুলে রয় যে-কল্প-উদ্যানে;—
যেথায় স্ফুরিছে নাসা কটিলগ্ন স্বেদের আঘ্রাণে,
বাতাসে ভাসিছে যেথা জন্মবীজ, রতি-সম্মোহন;...

সারঙ্গ-সংগীতস্বনে শিহরিছে উৎসব-উৎসুক
হেমচ্ছটাবিচ্ছুরিত বাতায়ন প্রতি পণ্যস্ত্রীর।...

উজ্জ্বল বসনবর্ণ, বিষবাষ্প উত্তপ্ত নিশ্বাস,
কৃত্রিম-রক্তিম ওষ্ঠে লালসার বলিষ্ঠ বিলাস...

শুনতে শুনতে মনে হতে পারে চিহ্নের তুফান বইছে, যার উৎস চক্ষু-কর্ণ-নাসা নয়, পুস্তক। কী মনোযোগী পাঠক যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু! চার দশকপরের 'বেশ্যার মৃত্যু' কবিতায় কিন্তু আর পুস্তক নেই, আছে বস্তুর তিতিক্ষা আর বস্তুলগ্ন অনুপুঙ্খের সন্ধান:

তারই বোন-সতিনেরা কাঁধে ক'রে নিয়ে এলো তাকে;
মাথা হেঁট, চোখে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম, দুর্বল পা ফেলা,
গুটি কয় গম্ভীর বালিকা যেন, অকস্মাৎ ভুলে গেছে খেলা
ঈষৎ বিব্রত হ'লো আকাশ ও লোকজন দেখে।...

হারালো অস্তিত্ব এই ভিন্ন দেশে, নিঃস্ব হলো নারীত্ব, যৌবন,
যেহেতু কোথাও আর নেই যেন কামুক পুরুষ।
এক বোবা, নিশ্চল দুপুর শুধু; আর যেন মদ গিলে বিলুপ্ত, বেহুঁশ,
অনাক্রমণীয় ঘুমে মগ্ন একজন।...

এদিকে শহরে সন্ধ্যা, অন্য ক-টি ঘরে ফিরে চলে,
চোখ টেপে ল্যাম্পোস্ট, গলির গন্ধ উৎসাহ বাড়ায়;
পায়ে শক্ত মাটি পেয়ে ভগিনীরা আবার দাঁড়ায়
দগ্ধ হতে ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার অনলে।

'বেশ্যার মৃত্যু'-র রচনাকাল ১৯৬৭। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুতে বস্তুর বীক্ষণ শুরু হয়ে গেছে তার অনেক আগে, ১৯৩৮-এ লেখা 'ব্যাং' কিংবা 'ইলিশ'-এ। তবে বিষয়ীব্যতিরিক্ত বিষয়ের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা ঘটেনি 'ব্যাং' বা 'ইলিশ'-এ। 'ব্যাং'-এ আছে এক প্রচ্ছন্ন কীর্তন, প্রায় মুগ্ধতা, যার

প্রমাণ রয়ে গেছে কবিতাটির প্রধান উপঘাতে : 'কাচ-স্বচ্ছ উর্ধ্বদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরেরে খোঁজে/ধ্যানমগ্ন ঋষি-সম'। একাগ্রতার আর সংকল্পের মূর্ত রূপ ব্যাং কি হয়ে উঠছে না এক আদর্শ : 'মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বার আমরা আরামে শয্যাশায়ী;/স্তব্ধ পৃথিবীতে শুধু শোনা যায় একাকী উৎসাহী/একটি অক্লান্ত সুর'? ঋষি তো বলাই হয়েছে, কবি বলতে কী আপত্তি! তবে যে-নির্মোহ দৃষ্টি আমরা 'মাছ ধরা' বা 'বৃদ্ধ কবি'-তে পড়ছি তার আভাসও এতে নেই। অথচ ব্যাং নামক আপাত-অকিঞ্চিৎকর প্রাণীটির এক আংশিক বিশেষ্যসংগত বর্ণনা এতে আছে। আংশিক বর্ণনা 'ইলিশ'-এও আছে : 'রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে/জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি রাশি ইলিশের শব'। কিন্তু সেই বর্ণনার সঙ্গে মিশে আছে মন্তব্য, বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণ, এবং বেশ ভারী বিশেষণ : 'নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়'। তাই 'ইলিশ'-এও বিষয়ের পরাকাষ্ঠা পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল বিষয়ের উপস্থিতিহেতু বিষয়ীর উপলব্ধি। এবং সেই উপলব্ধি রীতিমতো সমাজসংগত, শ্রেণিবৈষম্যের আভাসসমন্বিত,'প্রাণপণে ফ্যালে জাল, টানে দড়ি/অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল'। আর মাছ ধরার যে-নাটকীয় বিবরণ আছে এই কবিতাতে তা আদৌ প্রৌঢ় বয়সের 'মাছ ধরা'-র মতো নিরম্বু নয় : 'মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল/আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি/ছোটো নৌকাগুলি'।

বিষয় ও বিষয়ীর দ্বৈত সহজে ঘোচে না। কোনো কোনো কবির বেলা দেখা যায় বিষয়ীতে শুরু করে বিষয়ে শেষ করছেন, কেউ কেউ আবার বিষয়ের রাজ্য পেরিয়ে গিয়ে বিষয়-বিষয়ীর অদ্বৈতে পৌঁছোন। যে-উদাহরণ এক্ষুনি মনে পড়ছে, এবং বুদ্ধদেব বসুর কাব্যসমগ্র সামনে খুলে আছি বলেও বোধ করি, তা রিলকের। রিলকের শুরু আকৃতিতে, ক্রম-উত্তরণ বস্তুবীক্ষণে, অন্তিম উত্তরণ সমগ্রতায়। রিলকেই তাঁর মধ্য পর্বে, বোদলেয়ার পড়ে, রদ্যাঁর সেক্রেটারির কাজ করে, 'ডিং' বা বস্তুর আত্মীয়তা প্রচার করেন। তাঁর 'নতুন কবিতা' তারই সাক্ষী। কিন্তু তাঁর 'ডুইনো এলিজি' ও 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট'-এ আছে এক নির্বিশেষ চেতনক্রিয়া যা বস্তুসিদ্ধ কিন্তু বস্তুর বিশেষ্যমুখিতা অতিক্রান্ত। এবং রিলকের পাঠক হিসেবে এই বিষয়ী-বিষয় বৃত্ত বুদ্ধদেব বসুর কাছে অবশ্যই প্রতিভাত হয়ে উঠছিল, নইলে কেন তিনি ১৯৪৬-এই রিলকে অনুবাদ শুরু করবেন যদিও শেষ করবেন দুই দশক পরে। তবে বস্তুসাধনায় তাঁকে কেবল রিলকেই টানেননি, টেনেছিলেন বোদলেয়ার এবং কালিদাসও। বোদলেয়ারের বস্তুবৈভব তো বিখ্যাত, আর সংস্কৃত কবিতার অনাধুনিকতা বিষয়ে তাঁর *মেঘদূত* অনুবাদের ভূমিকায় তিনি যাই বলে থাকুক না কেন, তাতে যে-বস্তুজাগতিক উপস্থিতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার দ্বারা তাঁর মুগ্ধ না হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। এ আমার অনুমান হতে পারে, কিন্তু *মেঘদূত*-এর দূরবর্তী জগতে তিনি খালি অনুবাদকর্মের শৃঙ্খলায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এটা বিশ্বাস করা শক্ত। আর সংস্কৃত কবিতা অনুবাদ করতে করতে তাঁর শব্দব্যবহারে যে-সংহতি ও ঘনত্ব আসে তার প্রতিভাস তাঁর নিজের কবিতায়ও পরে দেখা যায়, কিংবা অন্য অনুবাদে।

অবশ্য অনুবাদকর্মের মধ্যেই এক বিষয়ীব্যতিরেকী বিষয়নিষ্ঠা আছে। রদ্যাঁর কর্মপ্রাণতার উদাহরণ থেকে নিরন্তর পরিশ্রমের যে-মন্ত্র রচনা করে নিয়েছিলেন রিলকে তাকে শিরোধার্য করে বুদ্ধদেব বসু পৌঁছেছিলেন তাঁর অন্তিম রচনাপর্বে। এবং রিলকের 'মাল্টে লাইরিডজ

ব্রিগগে'-র কথাও তিনি বারবার বলেছেন যেখানে অনুবাদের মতো শৃঙ্খলাবিধায়ক কর্মেরও প্রস্তাব আছে। তাঁর জীবনের শেষ দশকে যাঁরা বুদ্ধদেব বসুকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁদের মনে থাকবে কী কঠোর শ্রম তিনি তখন করছিলেন। সেটা সেই সময় যখন কলকাতা প্রায়ই নিস্প্রদীপ হয়ে যাচ্ছে, লিখতে বসে মাঝে মাঝেই কলম গুটিয়ে নিতে হচ্ছে লেখকদের। একটি মাটির থালায় কয়েকটি মোমবাতি সাজিয়ে তখন লিখতে বসতেন বুদ্ধদেব বসু। আর অপরাহ্ণে ক্রমবিলীয়মান দিবালোকের কথা মাথায় রেখে টেবিল বদলাতেন। অত শ্রমসাধ্য জ্ঞানরঞ্জিনী টীকা যে লিখতে পারেন বুদ্ধদেব বসু তা তাঁর প্রথম যুগে কে ভেবেছিল! প্রতিভাই সেই যুগে ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। যা আসত তা অবলীলায় আসত। এবং শব্দোচ্ছ্বাসের আগমন-প্রত্যাশায় ছিপ ফেলে বসে থাকতে হত না, বসলেই আসত, যেন ভিতরে ভিতরে তিনি অহরহ লিখে চলেছেন। তবে পরিশ্রমী তিনি বরাবরই যদিও শ্রমের অর্থ তাঁর কাছে ধীরে ধীরে পালটেছে। একদা তিনি বলতে পেরেছিলেন,

> দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
> রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
> ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
> বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
> মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।...

কেবল দরকার এক 'মায়াবী টেবিল'-এর:

> তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, মায়াবী টেবিলে
> সংকীর্ণ আলোর চক্রে মগ্ন হও,....
>
> যে-দীপের ছায়া
>
> ঘাস, গাছ, রোদ্দুরের অন্তহীন আশ্চর্য কাপড়ে
> পৃথিবীরে রূপ দেয়, যে-রূপেরে লক্ষ হাতে হাওয়া
> যদিও নিত্যই ছেঁড়ে, তবু পাতাঝরার চীৎকার
> হার মানে, স্তব্ধ হয়, ছন্দ পায় যার প্রতিভায়।...

'তাহ'লে উজ্জ্বলতর করো দীপ, করো অঙ্গীকার/সেই আলো, যে দেয় জীবনে মুছে, যৌবনে নিবায়'— সেই অঙ্গীকার ভোলেননি বুদ্ধদেব বসু, আমরণ লগ্ন হয়েছিলেন তাঁর মায়াবী টেবিলে। ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের সেই ঘরের স্মৃতি যাঁদের আছে তাঁরা বলতে পারবেন, বুদ্ধদেব বসু কত বেশি আরাম পেতেন তাঁর দরজামুখো আরামকেদারার দু-দণ্ডের গল্পগুজব, এমনকী সরব আড্ডা ছেড়ে তাঁর দেয়ালমুখো টেবিলে উঠে যেতে। কত আরাম সত্যিই পেতেন সেখানে বসে একটি সিগারেট ধরিয়ে কাগজের সুকুমার শ্বেতে কৃষ্ণ অক্ষরমালা সাজিয়ে তুলতে। এবং বুদ্ধদেব বসুর পাঠকমাত্রেই জানেন কত লক্ষ লক্ষ অক্ষর তিনি আপনি সাজিয়ে তুলেছেন, গদ্যে-পদ্যে অভেদ! এবং ওই মায়াবী টেবিল থেকেই (ততদিনে 'কবিতাভবন' উঠে গেছে নাকতলায়) এক আত্মজৈবনিক আখ্যান লিখতে লিখতেই তিনি উঠে গিয়েছিলেন ১৯৭৪-এর ১৭ মার্চ, আর ফেরেননি। কিন্তু তার অনেক আগেই তাঁর টেবিল তাঁকে জানিয়ে

দিয়েছিল, 'কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাঁকে একদা 'সহজ কবি' বলেছিলেন, তাঁর এই অসহজতা-বোধ যে নিতান্ত আপতিক নয়, এর সঙ্গে যে তাঁর তৎপরবর্তী চৈতন্যের যোগ আছে, তা তাঁর নির্দিষ্ট পাঠকমাত্রেই খেয়াল করবেন। যে-কথা তিনি কয়েকবছর আগে 'কোনো মৃতার প্রতি' নিবেদন করেছিলেন, "ভুলিবো না" — এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে/জীবন করে না ক্ষমা', তা-ই, তাঁর মায়াবী টেবিল-লগ্ন অঙ্গীকার সত্ত্বেও, আরও তীব্র হয়ে উঠতে লাগল। 'শিল্পীর উত্তর'-এর সেই পঙ্‌ক্তিগুলি কি ভোলা যায় : 'আমি কে, তা মনে রেখো। সহজেই লক্ষ্যবেধ ক'রে/না-বুঝে, প্রথম বার, তারপর থেকে সহজেরে/অসহ্য আত্মীয় জেনে কেবল খুঁজেছি ঘুরে-ফিরে/মায়াবনবিহারিণী নিমিত্তচেতন হরিণীরে'? কিন্তু স্পষ্টতর বোধ বোধকরি প্রকাশ পাচ্ছে 'ভিনদেশী' নামক একটি চোদ্দো লাইনের কবিতায় যা লিখতে চারদিন লেগেছিল বুদ্ধদেব বসুর। কবিতাটির অভিজ্ঞতার ক্রম এইরকম: 'প্রেমিকারা মৃত আজ...', 'বন্ধু সব মৃত...', 'প্রকৃতিও মৃত...', 'শুধু—যতক্ষণ/গাছে-গাছে ডাকিনীরা মুণ্ড নাড়ে, তাল দেয় শূলবিদ্ধ বিড়ালীর আর্তনাদ—/ বৃষ্টির অস্পষ্ট রাতে ফুটপাতে প'ড়ে থাকে এক/ভিনদেশী হৃৎপিণ্ড/ক্রমশ বিদ্বান'। কী বিদ্যা হচ্ছে এই হৃৎপিণ্ডের তা হয়তো-বা 'বৃদ্ধ কবি'-র শেষ স্তবকে আছে:

...আর মাঝে-মাঝে এক হৃৎপিণ্ড—ধূমল, বিশাল,
তন্দ্রার গুণ্ঠন ছিঁড়ে, মাংস ফুঁড়ে, কাঁদিয়ে কঙ্কাল,
প্রতন, আবহমান, আগ্নেয় অভ্যাসে
অকস্মাৎ ন'ড়ে উঠে — ফুলকি জ্বেলে — থেমে যায়।

এই মুক্তির কথা একটু অন্যভাবে আছে 'কবির বার্ধক্য'-তেও — একই কথা, কেবল একটু শান্ত স্বরে বলা :

কিন্তু সে এখন ভালো হ'য়ে গেছে। বুঝে নেয় অত্যন্ত সহজে
তালশাঁস কেমন স্নিগ্ধ, তরুণীরা কত মনোরমা,
কেননা কিছুই আর ক'রে নিতে হয় না তর্জমা
বিপজ্জনকভাবে শব্দবন্ধে, প্রকুপিত পিত্তের গরজে।...

শেষ বিন্দু নিংড়ে নিয়ে কবে যে বেরিয়ে গেলো সেই মুক্তাফল,
যা তাকে আঁকড়ে ছিলো বহুকাল — নিষ্ঠুর, নাছোড়।
এতদিনে স্বাস্থ্যবান, শান্ত ও নিশ্চল,
সমুদ্রের আস্ফালনে অবিরাম-ধ্বনিত সৈকতে
যে-কোনো পিকনিকে-আসা বালকের কৌতূহলী পথে
প'ড়ে আছে একটি খোলশমাত্র — লোকশ্রুত সত্তর বছর।

ঠিক এরই বিপরীত মুক্তির অভিলাষ প্রকাশ পেয়েছিল চার দশক আগে:

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী ক'রে রচেছো আমায় —
নির্মম বিধাতা মম!...

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার

অমৃতের তরে।
না হয় ভুলিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম চিরন্তন সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।...

আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর —
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে।

এই 'বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে'ই রচিত হয়েছিল পুরো *বন্দীর বন্দনা*, এক বিষয়ীমুখর বিষয়-উদাসীন কাব্যাদর্শের পরাকাষ্ঠা। উলটোটাই দেখা যাচ্ছে উপরের দুই কবিতাতে, বিষয়ীর অন্তরালবর্তিতা। এবং কোনো ত্বরাও নেই উচ্চারণে। শব্দসমূহেও নেই কোনো সহজ আর্তি। পক্ষান্তরে শব্দ হয়ে উঠতে চাইছে বস্তুর প্রতিমান। কিন্তু একেবারে শেষের কয়েকটি কবিতাতেও এসে, অর্জিত অন্তর কোনো ব্যত্যয় না ঘটিয়ে, বস্তুর স্বপ্রতিষ্ঠ অধিকার খর্ব না করে, বিষয়ীকে ফিরিয়ে আনলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষয়ের তৃতীয় নয়নরূপে। বিষয়ীর সঙ্গে এল খানিক আবেগও, কিন্তু পরিশোধিত, নিরুচ্ছ্বাস। তাঁর মায়াবী টেবিল-জাত এই শেষ মায়ার সার্থক উদাহরণ 'সন্ধিলগ্ন', আত্মজৈবনিক তবু নিতান্তই আত্মজৈবনিক নয়, উপলব্ধিঋদ্ধ, দার্শনিক। আর শব্দে নেই কোনো নিত্যব্যবহারের অতিনৈকট্য, বরং আছে এক অনিবার্য দূরত্ব যাতে সাধারণীকরণ ঘটতে পারে অভিজ্ঞতার। বাংলা কবিতায় সুখপাঠ্য ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুর প্রধান পরিচয় এখনও *বন্দীর বন্দনা*-র কবি হিসেবে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তো 'সন্ধিলগ্ন'-রও কবি। আর তা যত দিন প্রতিষ্ঠা না হবে তত দিন বুদ্ধদেব বসু পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'বিভাব' যেখানে পাবেন

পাতিরাম

(কলেজ স্ট্রিট)

ইস্টার্ন বুক এজেন্সি

৮/সি, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি-র কাছে
(কলেজ স্ট্রিট)

সম্পাদকীয় দপ্তর

৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৬৮
দূরভাষ : ৪৭৩ ৩৬০০

বিভাবের পুরনো এবং নতুন সংখ্যা পাবার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করুন

অতুলপ্রসাদের গান : পুনর্বিবেচনা

সুধীর চক্রবর্তী

বাংলা গানের আধুনিক পর্বের যে-চারজনের কথা আমরা একবারে উচ্চারণ করি তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩), রজনীকান্ত (১৮৬৫) ও অতুলপ্রসাদ (১৯৭১)। লক্ষ করার মতো তথ্য এই যে ১৮৬১-৭১ এই ১০ বছরের বৃত্তে বাংলা গানের নির্মাণ — আধুনিক বাংলা গানের মূল কাঠামোর নির্মাণ হয়েছে। সেই নির্মাণ প্রসঙ্গে এ-কথা মানতেই হবে যে, বাংলা গানের যদি কোনো আধুনিকতা থেকে থাকে তবে তার সূচনা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে এবং এ-ধারা এখনও পর্যন্ত চলে আসছে নতুন নতুন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। এ-নিয়ে অবশ্য আমাদের গ্রহণীয়তা বা বিতর্কের শেষ নেই। তবে চলমানতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আছে। এই চারজনের সংগীতসাধনা যেভাবে গড়ে উঠেছিল তাকে একটি উপমা দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। কামারশালায় কামার যেমন আগুনে-তাতানো গরম-লাল লোহাকে দ্রুত পিটিয়ে পিটিয়ে একটা অবয়ব দেয় তেমনই রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের অনবরত আঘাত বা হ্যামারিং-এর ফলে বাংলা গানের একটি রূপ তৈরি হয়েছে। বলতে গেলে এই রূপটিই এখন আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের আনন্দের উপচিত অংশটুকু আমাদের গান। এখনও আমাদের গান গাইতে বললে আমরা এইসব নির্মাতার গান গাই। একশো বছর অতিক্রান্ত — তা সত্ত্বেও এইসব গান আজও আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক। তার কারণ এসব গানে একটা আন্তরিকতা আছে, একটা মেলডি আছে, সর্বোপরি আত্মনিবেদনের এমন একটা নিগূঢ় সুর আছে যা আমাদের আধুনিক জীবনে ক্রমশই হারিয়ে ফেলছি। এই ধ্বস্ত, বিচ্ছিন্ন টেনশনের জীবনে কোনোদিন যদি অন্ধকার ঘরে বসে একমনে অতুলপ্রসাদের একখানি গান শুনি, তা হলে সারাদিনের বেদনা-বিষণ্ণতার পর মনে যেন শান্তির প্রলেপ লাগছে বলে মনে হয়। রজনীকান্তের গানে এই অনুভব আরও প্রবল হয়। তবে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করব না। তাঁর গানে বৈচিত্র্য ও গভীরতা এত বেশি এবং আমি বলব পৃথিবীর মধ্যে তিনিই একমাত্র গীতিকার যিনি গান নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর গান কীভাবে গাইতে হবে তা নিয়ে সারাজীবন ধরে ভেবেছেন ও সেভাবে শিখিয়েও গিয়েছেন, সর্বোপরি গানের তত্ত্ব নিয়ে *সঙ্গীতচিন্তা* নামে একটি বই-ই লিখেছেন বলা যায়। সংকলন তৈরি হয়েছে, গান নিয়ে তাঁকে এত ভাবতে হয়েছে যে তাঁর নিজের গানের নতুনত্ব ও বিশেষত্ব বোঝাবার জন্য অনর্গল তিনি কলম চালিয়ে গিয়েছেন। রাগাশ্রয় থেকে মিশ্র রাগিণীকে মিলিয়ে দিয়েছেন, পূর্ব-পশ্চিমের নানা অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দিয়েছেন, মিলিয়ে দিয়েছেন লোকসংগীতকেও— সব মিলে বাংলা গানকে তিনি নতুন দিশার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বা যা শুরু করেছিলেন তা থেকে অন্য স্থপতিদের সম্পর্কে আমরা অনুমান করতে পারি। ধরা যাক একটা বড়ো হার — ইন্দ্রমণির হার তৈরি হচ্ছে। নানা ধরনের রত্ন যোগ করে সেটিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এর মাঝে আছে একটা নীলকান্তমণি। মনে রাখতে হবে নীলকান্তমণির যে-বিভা, যে-ছটা তা নির্ভর করছে বাকি সব পাথরগুলোর উপর। সব মিলে এক আশ্চর্য বিচ্ছুরণ সৃষ্টি হচ্ছে বটে, তবে তা থেকে নীলকান্তমণিকে আলাদা করে চেনা

যাচ্ছে। একটা সোজাসাপটা সোনার হারে নীলকান্তমণিটিকে সেট করলে কিন্তু এমনটি হত না। এখন রবীন্দ্রনাথ যদি ইন্দ্রমণির হারের নীলকান্তমণি হন তবে সে-হারের অন্যান্য রত্ন হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ। তাই আধুনিক বাংলা গানের নির্মাণ জানতে হলে শুধু রবীন্দ্রনাথকে জানলেই চলে না, পাশাপাশি এই মানুষগুলি সম্পর্কেও জানা দরকার।

আমার চেনা-জানার পরিধির মধ্যে এমন অনেককেই আমি সুনিশ্চিতরূপে জানি যাঁরা অতুলপ্রসাদকে খুব ভালো করে জানেন, অতুলপ্রসাদের গান তাঁদের হৃদয়ের গান এবং তাঁরা সে-গানের স্পর্শে সঞ্জীবিত হন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর জীবনকাহিনী এবং তাঁর মূল লড়াইটা, গানকে নিয়ে তাঁর যে-সংগ্রাম — সংগ্রাম শব্দটি এখনকার দিনে খুব খেলো হয়ে গিয়েছে — তাঁর এই যে আত্মসংগ্রাম, আত্মদীক্ষা — একজন মানুষকে যখন আত্মপ্রকাশ করতে হয় তখন তাঁর ভিতরকার যে-লড়াই সেটা অনেকসময় অনুক্ত থেকে যায়। বস্তুত অতুলপ্রসাদের জীবনের তথ্য আমরা খুব কমই জানি — তাও যদি তাঁর জীবনটাকে 'বায়োগ্রাফিকাল স্ক্রিপ্ট'-এর মতো মোটামুটি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরি এবং বোঝার চেষ্টা করি তা হলে অনুধাবন করা যাবে তাঁর গান কেন এমন হল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে এমন একটা ধারণা আছে প্রতিভা ইত্যাদি বিষয়গুলি এক ধরনের ঐশী ব্যাপার, যেন উপর থেকে পাওয়া আশীর্বাদের মতো। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের যোগ করতে হবে অতুলপ্রসাদের মতো একটা মানুষ, একটা জীবন, তার আধুনিকতা, প্রতি পদে তাঁর লড়াই, তার মধ্যে থেকে গড়ে-ওঠা জীবন-দর্শন, তার যে-বিচ্ছুরণ, তা কিন্তু গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই সেই মানুষটিকে বাদ দিয়ে কেন গানগুলি শুনব? তাই আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি মানুষ অতুলপ্রসাদ সেনকে তাঁর দেশ-কাল সহ সকলের কাছে তুলে ধরতে।

আসলে অতুলপ্রসাদ সেনের গান গাওয়ার বা রচনার কথাই নয়। এর কারণ কী? তাঁর পিতৃ-পিতামহের যে পরিবেশ তা এখনকার বাংলাদেশের ফরিদপুরের সাধারণ একটি গ্রাম, নাম মগর। সেখানকার সেন পরিবারের একজনের দুই মেয়ে আর তিন ছেলে। এই তিন ছেলের মধ্যে সেজো ছেলের নাম হল রামপ্রসাদ। পিতৃবিয়োগের ফলে এঁরা বোনের বাড়িতে মানুষ হয়েছেন। এই রামপ্রসাদই হলেন অতুলপ্রসাদের পিতা। ইনি এমন এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন যে সেই গ্রাম্য পরিবেশ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে তিনি ডাক্তারিবিদ্যার চর্চা করলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত শুরু করলেন। এই কথাটি মনে রাখার যে, তখনকার গ্রাম্য মানুষ তিনি, কলকাতায় এসে ব্রাহ্মসমাজের এনলাইটেনমেন্টের মধ্যে এসে পড়েছেন — চেতনার মুক্তি হচ্ছে, সংস্কারের মুক্তি হচ্ছে, নতুন যুক্তি-বুদ্ধি-আবেগে নতুন যুগ বোনার চেষ্টা করছেন। এই রামপ্রসাদ পেশায় চিকিৎসক, দীক্ষিত হচ্ছেন ব্রাহ্মমন্ত্রে। অতঃপর তিনি ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসা শুরু করলেন। অতুলপ্রসাদের বয়স ষোলো বছর হওয়ার আগেই তাঁর পিতা মারা যান। কিন্তু মানুষটি চরিত্র ও মননে ছিলেন অসামান্য। তার প্রমাণ তাঁর একটি উক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁর প্রয়াণের আগে মানুষটি তাঁর স্ত্রী হেমন্তশশীকে বলেছিলেন, 'আমি মারা যাচ্ছি; তা আমি মারা গেলে তুমি আবার বিবাহ কোরো'। মনে রাখতে হবে সময়টা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক এবং এইখানেই অতুলপ্রসাদের জীবনে ট্র্যাজেডির সূচনা।

অতুলপ্রসাদের যখন ষোলো বছর বয়স ঠিক সেই সময় তাঁর মা হেমন্তশশী যাঁকে বিয়ে করলেন তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠা দুর্গামোহন দাশ। এই বিয়ে সম্ভব হয়েছিল

ব্রাহ্মসমাজের জন্যই, নতুবা আমাদের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে গণ্ডগোল সৃষ্টি হত। কিন্তু এই বিয়ে — যাকে অসম-অস্বাভাবিক বিয়েই বলব, এর ফলে অতুলপ্রসাদের মনের মধ্যে একটা গূঢ় আঘাত লাগল। তাঁর বোনেরা সব ছিলেন বটে, তবে তিনি আশ্রয় পেলেন দাদামশায় ও মামাদের কাছে। অতুলপ্রসাদের দাদামশায় ঢাকার সাধু কালীনারায়ণ গুপ্ত নিজে ব্রহ্মসংগীত গাইতেন, গান বাঁধতেও পারতেন। ছোটো খোল নিয়ে অতুলপ্রসাদ সংগত করতেন এবং দাদুর সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতেন। ওই যে কী জাদু ওই বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে — অতুলপ্রসাদের গানে যে লোকায়ত প্যাটার্নটা আমরা পাই, খুব মন দিয়ে শুনলে বোঝা যায় ওর মধ্যে বাউল-কীর্তনের একটা ফিউশন আছে। এই ফিউশনটা কিন্তু তিনি ঢাকার পরিবেশ থেকেই পেয়েছিলেন। তখনকার ব্রাহ্মসমাজের গানের মধ্যে বাউল-কীর্তনের একটা অপূর্ব মিশ্রণ আছে। ব্রাহ্মসমাজের গানের গঠন ও স্বরলিপি নিয়ে আমরা বিশেষ কাজ করিনি। ব্রাহ্মসমাজের গানকে আমরা নিছক ধর্মীয় সংগীত বলে সরিয়ে না ফেলে যদি আজ তার সাংগীতিক পরিচয়টি দেখি তা হলে দেখা যাবে ওর মধ্যে বাউল-কীর্তনের ফর্ম আছে, যেমন তার একটা অংশ ধ্রুপদাঙ্গ যা রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন, ঠাকুরবাড়ির লোকেরা নিয়েছিলেন। বাউল-কীর্তনের একটা চমৎকার মিশ্রণ অতুলপ্রসাদের গান শুনলে বেশ বোঝা যায়। আসলে মানুষটা ওই গানের পরিবেশে ছোটোবেলা থেকে বড়ো হয়েছেন। মামারা অল্পবয়সে অতুলপ্রসাদকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে আনলেও মাকে তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন। মায়ের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা ছিল জীবনের মস্তবড়ো একটা দোলাচলের লক্ষণ। মা-র পুনর্বিবাহে অতুলপ্রসাদের জীবনে যেটা ঘটে গেল, আমি বলব জীবনটা অস্বাভাবিক হয়ে গেল। তাঁর নতুন পিতা ও তাঁর মা দুজনেই অতুলপ্রসাদকে কাছে টানলেন, কিন্তু তিনি যেতে পারলেন না। তিনি মামার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়লেন। অতঃপর তাঁর সেজো মামা বেশ টাকাপয়সা খরচ করে অতুলপ্রসাদকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। যখন ব্যারিস্টারি পড়তে যাচ্ছেন তখন গণ্ডোলাচালকের কণ্ঠে গান শুনতে শুনতে সেই সুর থেকে 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' গানটি তিনি কম্পোজ করে ফেললেন। গানটি শুনলে ওর মধ্যে যে বিদেশি সুরের চলন আছে তা বোঝা যায়। আমাদের বাংলা গানের যাঁরা রূপ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ — এই তিনজনের গানের মধ্যে একটা বিলিতি সুরের চলন আছে। লক্ষণীয়, প্রত্যক্ষ বিলিতি গান শোনার অভিজ্ঞতা তিনজনেরই হয়েছে এবং তিনজনের ইংল্যান্ড যাওয়ার ব্যাপারটায় কোথায় একটা যোগ আছে। রজনীকান্ত এই সুযোগটা পাননি বলে তাঁর গান অনেকটাই বাঙালি গান, তাঁর মধ্যে এই ফিউশনটা নেই।

যাই হোক অতুলপ্রসাদ যদিও বিলেতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বিলিতি গান শিখেছিলেন এ-কথা বলা যায় না। যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ গান শিখেছিলেন, যে-অর্থে দ্বিজেন্দ্রলাল টাকা খরচ করে বিলিতি গান শিখেছিলেন, এমনকী দ্বিজেন্দ্রলাল গলায় মডিউলেশন ও বিশেষ স্বরক্ষেপ পর্যন্ত শিখে এসেছিলেন, সেদিক থেকে বিচার করলে অতুলপ্রসাদ কিন্তু অনেক বেশি ব্যাপৃত ছিলেন জীবিকা নিয়ে, জীবন নিয়ে। ভাবছেন আমাকে বাঁচতে হবে, আমাকে নিজের জীবন তৈরি করতে হবে, আমাকে লড়াই করতে হবে। তিনি যখন ব্যারিস্টারি পড়ছেন তখন তাঁর সঙ্গে আর যে-তিনজন ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ছেন তাঁদের নামগুলি জানলে চমকিত হতে হয় — চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ এবং সরোজিনী নাইডু। এই সময় এবং

ওই ব্যক্তিদের যোগাযোগটা মাথায় রাখলে অতুলপ্রসাদের গানে স্বাদেশিকতার কারণটা কতকটা ধরা যায়। এইরকম আশ্চর্য স্বদেশসেবকদের সঙ্গে তিনি তাঁর যৌবনের প্রথম দিনগুলি কাটিয়েছেন। বলা বাহুল্য অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন-সরোজিনী যেখানে আছেন সেখানে অতুলপ্রসাদ স্বদেশদীক্ষা ছাড়া আর কী পেতে পারেন? তবে তাঁর গানে স্বদেশি মন্ত্রটা খুব সহজে এসে গেলেও সেই অর্থে কখনও তিনি স্বদেশি আন্দোলন করেননি, যেমন করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত। বলা যায় তাঁর গানের মধ্যে স্বাভাবিক যে স্বাদেশিকতা তার কারণ হচ্ছে এসব মানুষের সংস্পর্শ, যেমন দিলীপকুমার রায়ের গানের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব খুব বেশি পড়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁরা সহপাঠী ছিলেন, একসঙ্গে লন্ডনেও ছিলেন। স্বাদেশিকতা ছিল তাঁদের রক্তগত।

১৮৯৫ সালে অতুলপ্রসাদ যখন এ-দেশে ফিরে এলেন — ফিরে এসে ওকালতি ব্যাবসায় বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। তাঁর মামার মেয়ে হেমকুসুমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল এবং তাঁরা ঠিক করলেন যে তাঁরা বিবাহিত হবেন। যেহেতু ভাই-বোনের সম্পর্ক, কোনোভাবেই বিবাহযোগ্য নয়, তাই অতুলপ্রসাদ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন। স্কটল্যান্ডের একটি বিশেষ গ্রামে (গেটনাগ্রিন) এই ধরনের বিবাহ আইনসিদ্ধ ছিল। সেই গ্রামে গিয়ে তাঁরা রেজিস্ট্রি বিবাহ করলেন ১৯০১ সালে। তাঁদের দুটি যমজ সন্তান হল — দিলীপ আর নীলিপ। কিন্তু লন্ডনের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে নীলিপের মৃত্যু হল। এই দুঃখটা কোনোদিনই হেমকুসুম ভুলতে পারেননি যে দারিদ্রের জন্য যথাযোগ্য ঠাণ্ডানিরোধক বস্ত্র না থাকায় তাঁদের সন্তান মারা গিয়েছে। হেমকুসুমের জীবনের যে-মানস জটিলতা — তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত এটা একটা অদ্ভুত অসম বিবাহ। দ্বিতীয়ত এই সন্তানবিয়োগ। ফলে পরে তাঁর মনে হয়েছে সমস্ত পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, জীবন থেকে আমি — আমরা দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। সত্যিই তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। এই সময়ে অতুলপ্রসাদের এক মুসলমান বন্ধু ব্যারিস্টার মমতাজ হোসেন তাঁকে লখনউ গিয়ে সেখানে প্র্যাকটিস করার পরামর্শ দিলেন। সেইমতো অতুলপ্রসাদ লখনউ চলে গেলেন।

এইখানে মনে রাখতে হবে তাঁর জীবনটা তো ৬৩ বছরের। তুলনামূলকভাবে একটু বলে রাখি যে, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবৎকাল ৫০ বছরের আর রজনীকান্তের মাত্র ৪৫ বছরের। আর রবীন্দ্রনাথের জীবনটা হচ্ছে ৮০ বছরের। এই তথ্যগুলি মনে রাখবার। রবীন্দ্রনাথের গানের যে এত পূর্ণতা তার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘজীবনের এই ব্যাপ্তি খুবই জরুরি। শান্তিনিকেতনের জীবন, তাঁর নানারকম নিরীক্ষা, তাঁর শান্তি-সাহচর্য, ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ, এগুলো সব ভুলে গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বড়ো করে ফেলেছি। এবার রজনীকান্তের কথা ধরা যাক। নিঃসঙ্গ গ্রামের মানুষটি মাত্র ৪৫ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর জীবনে এমন কী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন, কাজেই আমাদের বাংলা গানকে আর কত কী দিতে পারবেন! এবারে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা। অসামান্য প্রতিভাবান এই মানুষটি মাত্র ৫০ বছর বেঁচেছিলেন। ৪০ বছর বয়সে তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়। নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষের দশ বছর তিনি তাঁর — একটি পুত্র ও একটি কন্যা, দিলীপকুমার ও মায়াদেবী — নাবালক সন্তানদের জন্য ব্যয় করেছেন। পরিচারিকার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। ছেলেটি হয়তো না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অফিস থেকে ফিরে সেই ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন।

লোকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে একটিকে দেখিয়ে বলতেন 'যথা', অন্যটিকে 'সর্বস্ব'। এই যথাসর্বস্বকে নিয়েই তাঁর জীবনের শেষ দশটি বছর কেটেছিল। সন্ন্যাসরোগে মৃত্যুর আগে এই বছরগুলি এত করুণ ও মর্মন্তুদ ছিল যে গান রচনার শান্ততা তাঁর জীবনে থাকতে পারে না। সেই সময় তিনি নাটক করছেন, নাটকের মধ্যে গান লিখছেন। একসময় মাদকে আশ্রয় নিয়েছেন এবং বলেছেন যে 'সমস্ত জীবনের, সারাদিনের গ্লানি ঝেড়ে ফেলার জন্য আমাকে সামান্য একটু মদ্যপান করতে হয়, তোমরা কি আমাকে ক্ষমা করবে না?' এইরকম একটা দ্বিধাছিন্ন মানুষ পঞ্চাশ বছর বয়সে চলে গেলেন। রজনীকান্ত নিরন্তর গান গাইতে ভালোবাসতেন, অনবরত গান গাইতে গাইতে তাঁর গলাতেই ক্ষত হয়ে গেল এবং তিনি মারা গেলেন কর্কট রোগেই। তখন কর্কটরোগের কোনোরকম চিকিৎসাই বেরোয়নি — মেডিক্যাল কলেজে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অতুলপ্রসাদের জীবনের তেষট্টি বছরের মধ্যে শেষ বত্রিশটি বছর তিনি ছিলেন লখনউয়ে প্রবাসী বাঙালি। তাঁর গান যে বাংলা দেশে সেভাবে প্রচারিত হয়নি তার প্রধান কারণ তিনি প্রবাসী। তেমনই দিলীপকুমার রায়ের গান যে আমরা বিশেষ শুনিনি তার কারণ এই যে তাঁর সমস্ত জীবনটাই প্রায় পণ্ডিচেরি আর পুনাতে কেটে গেছে। একই ভাবে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী — তুলনা করলে আমার মনে হয় যে আমরা অমিয় চক্রবর্তীকে একটু কম পড়েছি, ওই প্রবাসী হওয়ার কারণেই। বস্তুত এইরকম প্রবাসীর জীবন আর আমাদের কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের জীবনে একটা ফারাক আছে। অতুলপ্রসাদ যখন লখনউতে থাকতেন তখন তিনি সেখানে খুব ভালো ঠুংরি শিল্পী — কালকাদীন, বিন্দাদীন প্রমুখর গান খুব মন দিয়ে শুনতেন। তখন লখনউতে যেসব বিখ্যাত সানাইবাদক বা বড়ো বড়ো ওস্তাদ ছিলেন অতুলপ্রসাদ যে শুধু তাঁদের গানবাজনা শুনতেন তাই নয়, তাঁদের বাড়িতে নিয়ে এসে মেহফিল করতেন। তাঁকে গানবাজনা শোনাতে আসতেন নবাব আলি, আহমদ খলিফ খাঁ, ছোটে মুন্নে খাঁ, বরকত আলি খাঁ, আবিদ হোসেন। লখনউতে তখন অতুলপ্রসাদের পরিচয় ব্যারিস্টার এ.পি.সেন। অসম্ভব সফল ব্যারিস্টার এ.পি.সেন আইনজীবী হিসাবে প্রচুর টাকা করেছেন। দয়ালু ছিলেন। খুব খেতে ভালোবাসতেন মোগলাই খানা। অথচ হজমশক্তি ছিল খুব কম। রসিকতা করে বলেছেন, 'আমার রুচিটা হচ্ছে মোগলাই, আর পেটটা হচ্ছে বৈষ্ণব'। তা বৈষ্ণবের পেটে তো আর মোগলাই খানা সহ্য হয় না, তাই প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। গানপাগল এই মানুষটির এক বন্ধু হলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্যজন শ্রীকৃষ্ণ রতনঝঙ্কার। ভাতখণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, মাঝে মাঝে আসতেন আবদুল করিম। লখনউ মরিস কলেজে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং রাধাকুমুদ-রাধাকমলের মতো intellectual ছিলেন তাঁর বন্ধু। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে যে একটা বুধমণ্ডলী, যেখানে বাঙালি intellectual-রা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের দিন কাটত। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, অতুলপ্রসাদ গান গাইতেন, গান শুনতেন, আমরাও গান শুনতাম। উনি শতরঞ্চিতে বসে গান শুনতেন আর মুখ দিয়ে 'ওয়া! ওয়া!' করতেন। গান এত ভালো লাগত যে শতরঞ্চিটা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে যেতেন, এগিয়ে একেবারে শিল্পীর সামনে চলে যেতেন, এর জন্য তিনি ওকালতিতেও ফাঁকি দিতেন। গানের জন্য প্রচুর রোজগারের সুযোগও ছেড়ে দিতেন।

ধূর্জটিপ্রসাদকে বলতেন — শোনো, গান যখন শুনি, আমি তো একদম মাত হয়ে যাই, তুমি তখন আমাকে সামলিয়ো'। বলেই বলছেন, 'তোমাকেই আবার কে সামলায়'। এ-হেন ব্যক্তি মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে উনি তাঁকে নিজের গান শোনাতেন, রবীন্দ্রনাথের গানও শুনতেন। এই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেনদেন, এর উপর জোর দেব এইজন্য যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন গীতিকারের সান্নিধ্য তিনি পাচ্ছেন অথচ তাঁর দ্বারা একটুও প্রভাবিত হচ্ছেন না। যেমন অতুলপ্রসাদের গান শুনলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গানের যেটা সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ— সঞ্চারীর ব্যবহার — অতুলপ্রসাদ সেই সঞ্চারীর ব্যবহার করেননি। পরপর তিনটি বা দুটি অন্তরা দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে তাঁর গান কোনোভাবেই রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, কী সুরে কী ফর্মে।

কিন্তু গভীর শোচনার বিষয় হল, ইতিমধ্যে তাঁর ব্যক্তিজীবনটি একদমই ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কারণ হেমকুসুমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি আর কিছুতেই তৈরি হল না — কারণ ওই অসম বিবাহ। তাঁর মা আবার বিধবা হয়ে অতুলপ্রসাদের কাছে ফিরে এলেন। মাকে তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন, প্রতিদিন সকালে মাকে প্রণাম করতেন। মাকে তিনি নিজের কাছেই এনে রাখলেন। ১৯৩১ সালে তাঁর সংগীতসংগ্রহের প্রথম খণ্ড যখন বের হল তখন মা মুমূর্ষু, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, এককথায় মৃত্যুশয্যায়, অতুলপ্রসাদ সেই মুমূর্ষু মায়ের পায়ের কাছে বইটা নিবেদন করে বলেছেন, 'মা, এই গানের বই তোমাকে দিলাম'। লক্ষণীয় এই যে মাতৃময় গৃহ সেখানে কিন্তু স্ত্রী হেমকুসুম কোথাও নেই। অথচ হেমকুসুম ওই লখনউ শহরেই অতুলপ্রসাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আছেন। সেখানে তিনি পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছেন, অতুলপ্রসাদেরই গান গাইছেন, 'নিদ নাহি আঁখিপাতে, তুমিও একাকী আমিও একাকী এমন বাদল রাতে'। দুজনেরই আত্মকণ্ঠ একটি গানের মধ্যে রয়েছে অথচ দুজনে মিলতে পারছেন না। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। একবার রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের বাড়িতে এসেছেন। কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষে সংবর্ধনা হচ্ছে, এই সূত্রে অতুলপ্রসাদ 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাড়িতে রয়েছেন বলে হেমকুসুম দিনকতকের জন্য এসে সংসারের হাল ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলে আবার হেমকুসুম তাঁর জায়গায় ফিরে গেলেন। 'আজ আমার শূন্যঘরে আসিল সুন্দর/ও গো অনেক দিনের পর' কি এই সময়েই লেখা? একবার দেখা যাচ্ছে, হেমন্তশশী মারা যাওয়ার পর হেমকুসুম এসেছেন। তখন তাঁর পায়ে কিছু একটা হয়েছে, হুইল চেয়ারে ঘুরছেন। একটার পর একটা ঘর ঘুরতে ঘুরতে এক ঘরে এসে দেখলেন সে-ঘরে হেমন্তশশীর একটা বিরাট ফোটো টাঙানো হয়েছে। তা দেখে হেমকুসুম বললেন, 'She is still here to guard my house?' বলে তিনি ফিরে গেলেন। এই যে তিনি নিজের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে সহ্য করতে পারছেন না, তার জন্য অতুলপ্রসাদের সমস্ত জীবনটা ছিন্ন হয়ে গেল তার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। একদিন ফিটনগাড়ি করে কোর্ট থেকে ফিরে দেখলেন হেমকুসুম তাঁর প্রিয় যাবতীয় সাহেবি পোশাক — অত্যন্ত শৌখিন স্যুট-প্যান্ট সব একত্রিত করে উঠোনে ফেলে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। তাই দেখে অতুলপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ফিটন ঘুরিয়ে নিলেন। সেদিনই লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গান 'আমি যাব না যাব না যাব না ঘরে'। সত্যিই তো কোন্ ঘরে যাবেন। তাই মনে হয় যে অতুলপ্রসাদের জীবনের প্রত্যেকটি গানের প্রতিটি উচ্চারণ আসলে

ওইরকম অর্থবহ, সমুদ্রশঙ্খের মতো তার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের হাওয়াটা যেন পুরো বেরিয়ে আসছে। তাঁর গানগুলি তাঁর আত্মজীবনের এক-একটি নির্যাস। এবং সম্ভবত এতটাই আত্মসম্পৃক্ত বলে তাঁর গানের সংখ্যা মাত্র ২০৮টি।

তেষট্টি বছরের জীবন আর ২০৮খানি গান। এই অঙ্কটা কিন্তু কিছুতেই মেলানো যায় না। অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা এত কম তার প্রধান কারণ, গীতিকারকে দিয়ে গান তো তৈরি করিয়ে নিতে হবে, গানের তো উপলক্ষ চাই। রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবনটা খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে তাঁকে দিয়ে পরপর গান লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছোটোদের পুজোর ছুটির আগে বায়না একখানা নাটকের। গুরুদেব লিখে দিলেন *শারদোৎসব*, সঙ্গে সঙ্গে গান তৈরি হল। শৈলজারঞ্জন একের পর এক স্লিপ পাঠিয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ গান লিখে গিয়েছেন। বলা যায় তাঁকে সারা জীবন নানাভাবে গানে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আপনি বেহাগে একটা বর্ষার গান করুন, এবার বাগেশ্রীতে একটা বর্ষার গান করুন — সমানে তাঁকে উত্তেজিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এসব নিয়ে পরিহাস করতেন আবার নানারকম গান লিখেও ফেলতেন। এই যে চারিদিক থেকে অহরহ চাপ — 'আপনাকে লিখতেই হবে গাইতেই হবে' — আশি বছর জীবৎকালে তাতে প্রচুর গানের সৃষ্টি হয়েছে। নানা নিরীক্ষা, নানা প্রণোদনা, নানা উৎসব ও ব্যক্তিগত অনুরোধে তাঁকে গান লিখতে হয়েছে সারাজীবন। মৃত্যুর দু-বছর আগে *তাসের দেশ*-এর মতো নাটক লিখেছেন, সুর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন যে, শেষ জন্মদিনে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে তাঁকে বলেছেন, 'আপনি এতরকম গান লিখছেন, মানুষের জয়গান করে একটি গান লিখবেন না?' তখন আশি বছর বয়স। 'ঐ মহামানব আসে' গানটি সেই দিন লিখলেন। সৌমেন্দ্রনাথ সমকালে রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর মনে হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো গীতিকারের মানুষের জয়গান করা একটা গান থাকবে না। এই যে চারদিক থেকে ঘনিয়ে-তোলা গান, রবীন্দ্রনাথের জীবনকে কিন্তু এটাই পরিতৃপ্ত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এদিক থেকে নিঃসঙ্গ ছিলেন, রজনীকান্তের সে-অর্থে কোনো বন্ধুই ছিল না, অতুলপ্রসাদ ছিলেন প্রবাসী এবং তাঁকে দিয়ে কে গান লিখিয়ে নেবে?

অতুলপ্রসাদের সমস্ত জীবন অন্তর্বেদনায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে, একদিকে আইনজীবীরূপে ব্যবহারিক সাফল্য, অন্যদিকে পারিবারিক ব্যর্থতা। সারাজীবন ধরে একটি অসম সম্পর্ককে ঘিরে অসম লড়াই করে গেলেন। যেন তারের উপর দিয়ে এক পা এক পা করে চলে যাওয়া জীবন অতুলপ্রসাদের। সেদিক থেকে বিচার করলে মাঝে মাঝে মনে হয়, ২০৮খানি গান লিখেছেন — এই যথেষ্ট। কিন্তু এই গানের অন্তরালে কী বেদনা রয়ে গিয়েছে আজকের দিনে সেটা প্রাসঙ্গিক। লখনউতে সে-আমলে প্রচুর দাদরা, ঠুংরি শোনা যেত। শোনা যেত বেনারস-ঘরানার গান, তার সঙ্গে শাওন, ঝুলা, হোরি এবং উত্তর ভারতীয় লচাও ঠুংরির নানারকম নমুনা। অতুলপ্রসাদ এসব গান জীবনে অনেক শুনেছিলেন। তাঁর গানের যদি আমরা সমীক্ষা করি তা হলে দেখব তার বারো আনাই প্রবাসী বাকিটা বাংলা। তিনি বাংলা গানে বিদেশির অঞ্জলি দিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর জন্য আমরা কী করলাম? তাঁর ২০৮টি গানের মধ্যে মাত্র ৭১টি গান স্বরলিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই স্বরলিপি করেছেন দিলীপকুমার রায় ও সাহানা দেবী যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। এই স্বরলিপিবদ্ধ গানগুলিই *কাকলি* নামে দু-খণ্ডে ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়েছিল (১৩৩৬ এবং ১৩৩৭ সালে), এখন আর পাওয়া যায় না। বাঙালির শ্রদ্ধেয়

মানুষদের সম্পর্কে উত্তরাধিকারবোধ এত শোচনীয় যে একজন গীতিকারের ২০৮টি গানের মধ্যে মাত্র ৭১টি রক্ষা করে বাকিগুলি জলাঞ্জলি দিয়েছি।

পরে, ব্রাহ্মসমাজ থেকে নীহারবিন্দু সেনের সম্পাদনায় অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি বই *কাকলি* বেরিয়েছে (যার মোট ৬ খণ্ডে ১২০টি গান ছিল)। সে-বই কি এখন পাওয়া যায়? এছাড়া গায়ক-সুরকার সন্তোষ সেনগুপ্ত অতুলপ্রসাদের ১২খানি গানে সুর দিয়ে প্রচার করেছিলেন। সেসব গান রেডিয়োতে সম্প্রচারিত হয়েছে, রেকর্ডেও গাওয়া হয়েছে — কেউ ধরতে পারেননি যে সেসব গান খাঁটি অতুলপ্রসাদি নয়। এ-ব্যাপারে সন্তোষ সেনগুপ্তের বক্তব্য : 'অতুলপ্রসাদের যেসব গানের কোনো প্রামাণ্য সুর পাওয়া যায়নি — যেসব গান শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় মুদ্রিত হয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে — তাতে যদি নবতর সুর সংযোজন করে পুনর্জীবিত করা যায় এবং তা যদি রসোত্তীর্ণ হয় — যদি তাতে অতুলপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং সংগীতরসিকসমাজ তা যদি গ্রহণ করে — তাতে আপত্তি করবার হয়তো কিছু নেই একমাত্র গোঁড়ামি ছাড়া। বিচারের ভার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত'।

সন্তোষ সেনগুপ্তের কথাগুলির সারবত্তা আছে কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? মাত্র ২০৮খানি গান যিনি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে ১৫ থেকে ২০খানি গানও কি আমরা এখন গাই? সন্তোষবাবুর সুরারোপিত ১২খানি গানের মধ্যে কটাই বা প্রচলিত হয়েছে? বাঙালি বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি ঠিকই কিন্তু গানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে উত্তরপুরুষের গায়ন ও শ্রবণের উপর, গানের ভালোমন্দের উপর তত নয়। নিরপেক্ষ বিচারে মনে হবেই যে, অতুলপ্রসাদের গানে সুরের বৈচিত্র্য কম, বাণীর দুর্বলতা প্রবল, খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক এবং আঙ্গিকের মুক্তধারা একেবারে নেই। এসবের কারণ কী? কারণ হল তাঁর গান লিরিকের ধর্ম থেকে মুক্তি পায়নি। নাটকে প্রযুক্ত হয়নি এবং উৎসব-সমাবেশ-সভায় ব্যবহৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত গানরচনার পাশে বহুতর কবিতা (রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন বহু নাটক ও নাট্যসংগীত) এবং হাসির গান লিখেছেন । কিন্তু অতুলপ্রসাদ শুধুই লিখেছেন গান এবং তাও মাত্র ২০৮খানি। তাঁর রচিত কোনো কবিতার হদিস মেলেনি এটাও আশ্চর্য কিন্তু সত্য।

তা হলে আজ, এতদিন পরে, আমরা অতুলপ্রসাদের গানকে খুব কি উচ্চাসন দিতে পারি? অন্তত রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সঙ্গে কি এক নিশ্বাসে তাঁর নাম উচ্চারণযোগ্য? সংখ্যাগতভাবে ও বৈচিত্র্যে তো নয়ই, এমনকী পরবর্তীকালের গায়কসমাজের সমাদরের প্রশ্নেও কথাটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কজন বড়ো পারফরমার অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছেন বা গাইছেন? তাঁর গানের ধরন কতটাই বা আধুনিক বাংলা গানকে সঞ্জীবিত ও প্রভাবিত করেছে? তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন, তাঁর গান সুরের দিক থেকে কতটা মৌলিক? তাতে কি প্রধানত উত্তর ভারতীয় ঠুংরি ও গজলের ঢং অনুসৃত হয়নি? বাংলা গানে অতুলপ্রসাদ নিঃসন্দেহে একটি নতুন তার বেঁধে গেছেন, যোগ করে গেছেন এক সন্তপ্ত বেদনাতুর আত্মকণ্ঠ, ভক্তিবিনত এক ধরনের নম্রতাও — কিন্তু সামগ্রিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তাঁর গান আজ অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক। তাতে সচল মনের লীলা নেই, নেই স্ববিরোধী সত্তার আর্তনাদ। 'চিরসখা ছেড়ো না'-র মতো মর্মস্পর্শী আধুনিক উচ্চারণ কি একটাও আছে?

গানের কবিতা, সমাজের আয়না

অরুণকুমার বসু

১.

বাংলা আধুনিক গানের শ্রোতা হিসেবে তো বটেই, অন্যতম কবি বা গীতিকার রূপে এই গানের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধকারের সংযোগ অর্ধশতাব্দী কালেরও বেশি সময়ের। তা ছাড়া নিছক জিজ্ঞাসায় অথবা গবেষণার শৌখিন ইচ্ছেয় এই গানের নাড়ি-নক্ষত্র কিংবা ইতিহাসের উপকরণ নিয়েও বহুকাল নাড়াঘাঁটার অভিজ্ঞতা তাঁর। গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি ১৯৪৮-৪৯ থেকেই। বাংলা গানের নজরুল-পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সলিল চৌধুরীর সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধকারের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা আরও প্রাচীন, তাঁর বাল্য-কৈশোর থেকেই। বলা যেতে পারে, সলিল চৌধুরী যে-আধুনিকতার, যে-আন্দোলনের, যে-নতুন যুগভাবনার প্রতিনিধি ও অধিনেতা, তার বর্ণপরিচয় বর্তমান প্রবন্ধকারের জীবনে তিনিই ঘটিয়েছিলেন।

সমাজমনস্কতা বা সমাজসচেতনতা শব্দটি আজ এতই ব্যবহারজীর্ণ যে সে-শব্দের অর্থ বা শর্ত, সংজ্ঞা বা সংখ্যা নিয়ে টীকাভাষ্যের কোনো দরকার নেই। নতুন প্রজন্মের তো কথাই নেই, আজ যাঁরা দিনান্ত-বয়সি, তাঁরাও তাঁদের কৈশোর থেকেই শিখেছেন জেনেছেন বিশ্বাস করেছেন যে, শিল্প হবে জীবনের বাস্তব অনুঘটক। যে-শ্রেণিসংঘাত সমাজ-পরিবর্তনের মূল সূত্র, সাহিত্য-শিল্পকলা-ললিতকলার ভিতর দিয়ে লেখক-কবি-শিল্পী-নাট্যকার-চিত্রকর সেই শ্রেণিবিরোধের তত্ত্বে বিশ্বাস সমর্পণ করে সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে জীবনসংগ্রামকে শিল্পিত করবেন। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের অন্য কোঠায় সেই শিল্পায়ন যেমনই হোক, গানের ক্ষেত্রে যে হতাশ হওয়ার পরিমাণই বেশি, তাতে অন্তত অর্ধশতাব্দী আগে আমাদের কোনো সংশয়ই ছিল না। গণনাট্য ও প্রগতি আন্দোলনের কর্মীরা চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বিশ্বাস করতেন, বাংলা গান ছিল সেকালে একেবারে জোলো, পানসে, একপো দুধ-মেশানো একসের জল। ওই একপো দুধটা হল কবিদের সমাজমুখিতা, আর তিনপো জল হল তাদের অশিক্ষিত পটুত্ব, সমাজবোধহীন তরল কল্পনাবিলাস, রঙিন বেলুনের পেটভরতি হাওয়া। তাই তাঁদের গান দিনকে-দিন হয়ে উঠেছিল নির্জীব নীরস অভ্যাসক্লান্ত জীবনস্পর্শবিহীন যান্ত্রিক। বস্তাপচা শব্দে রোমান্টিক কিছু পরিবেশ বা একস্‌প্রেশানকে ফুটিয়ে তোলার একঘেয়েমি তখনকার গীতিকারদের আড়ষ্ট করে রেখেছিল। আমরা লক্ষ করতাম, তখনকার বেশির ভাগ গানেই কৃষক-শ্রমিক নিম্নবিত্ত মানুষের দুঃখযন্ত্রণার ক্ষুধাতৃষ্ণার কোনো হাহাকার নেই। ফুল-তারা-চাঁদ, পাপিয়া-কোকিল, বর্ষা-বসন্ত দুই মার্কা-মারা ঋতু, সংক্রামকবিরহ, পরজন্মে দেখা হওয়ার ফাঁপা আওয়াজ, এইজাতীয় শত শত অক্ষম কানাখোঁড়া ভাবালুতার ভিখিরি-শোভাযাত্রাই হয়ে উঠেছিল আধুনিক বাংলা গান।

হয়তো এই ভাবনার সবটাই সত্যি ছিল না। কিন্তু মিথ্যেও ছিল না।

২.

আমাদের সময়টা ছিল তখন তেজি ঘোড়া, তার খুর হয়ে উঠেছিল গোঁয়ার ও অসহিষ্ণু। তখন আমরা সমাজমনস্কতার ঠিকেদারি নিয়েছিলাম। আমাদের বিশ্বাসের দলিলে যাঁরা সই করতেন না, তাঁদের দিকে ভ্রূকুঞ্চনের তির ছুঁড়তাম। বহু স্মরণীয় গানের রচয়িতা প্রণব রায়ের 'জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা/মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল' এই জনপ্রিয় গান শুনে কৌতূকোজ্জ্বল চোখে জানতে চাইতাম, এই জীবনে ও মরণের মধ্যে কত বছরের ব্যবধান? মোহিনী চৌধুরীর অনেক গানই ছিল সেকালে সুপারহিট, কিন্তু আমাদের কটাক্ষের উর্ধ্বে নয়। 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়'- জাতীয় গানকে সহজেই বলা যেত 'ইনফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার'। 'পৃথিবী আমারে চায়' গানকে আমরা সমাজসচেতনতার প্যারডি বলে সুখ পেতাম। 'রিকশা চালাই মোরা রিকশাওয়ালা' শুনে স্বয়ং রচয়িতা দিলীপ সরকারকেই বলেছিলাম,' এটা রিকশাওয়ালার গান হয়নি, রিকশা-চড়া বাবুর গান হয়েছে। মোহিনী চৌধুরীর 'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে তোমারে করেছে রানী'-কে রবীন্দ্র-নজরুলের কপিবুক ভাবতে ভালো লাগত। প্রণব রায়ের একটি গান নিজেরাও সর্বদাই গেয়েছি, কিন্তু কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারিনি:

যেথা গান থেকে যায় দীপ নেভে হায়
মিলনের নিশিভোরে
যদি মনে পড়ে সেথায় খুঁজিও মোরে।

আজও পারি না। এখন বেশ কিছু গানকে স্বর্ণযুগের গান বলে পিঠ চাপড়াই। কিন্তু সেদিন সেসব গানকে রোমান্টিকতার জানলায় ঝোলানো সস্তা ভাবালুতার পর্দা বলেই ভাবতাম। অজয় ভট্টাচার্য মোহিনী চৌধুরী প্রণব রায় শৈলেন রায় প্রমুখ দিকপাল গীতিকাররা অঢেল জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের তরুণ বয়সের সমালোচনা তাঁদের ছেড়ে কথা বলেনি। 'তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন আমারে', 'যাদের জীবন-ভরা শুধু আঁখিজল', 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই', 'কতদিন দেখিনি তোমায়', 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে হায়', 'নাই বা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনও বাকি', 'তুমি আজ কত দূরে', 'মাধবীর স্বপনে এসেছে ফাগুন', 'কোন্ পাখি ধরা দিতে চায়', 'তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই'...এমন অনেক তুমি-আমির গুজগুজ-ফিসফিস নিয়ে কী সুখীই ছিলেন এসব কবি! রেশন-তোলার ঝামেলা ছিল না, চাকরির ধান্ধায় ঘোরার তাগিদ ছিল না, বাপের বোধ হয় অগাধ টাকা, হাতে দামি সিগারেট, পায়ে শৌখিন জুতো, সমাজটাকে ভালো করে চেয়েও দেখতে শেখেননি। জীবন সম্পর্কে এঁদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই! এইসবই ভাবতাম।

ধরা যাক সমাধি শব্দটি। গীতিকারদের এটি একটি প্রিয় শব্দ, অপব্যবহারে ক্লিশেতে পরিণত হয়েছিল। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মতো প্রতিভার কলম থেকেও বেরিয়েছিল —

জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো
সমাধি 'পরে মোর জ্বেলে দিয়ো।

নজরুলের গানে কিংবা গজল-জাতীয় রুবাইয়াতের কল্যাণে আমাদের কবিরা শব্দটিকে করুণ বিচ্ছেদী গানের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। অবশ্য যে-শ্রোতৃবৃন্দের

জীবনমৃত্যুর কোনো স্তরেই সমাধি শব্দের কোনো প্রয়োগ নেই, তাঁদের প্রেমিক বা প্রেমিকাকে সমাধিস্থ করার অসংগতি অন্তত আমাদের আধুনিক গানের শ্রোতাদের বিব্রত করেনি। তাই অরূপ ভট্টাচার্যের লেখা গান 'সমাধিতে মোর ফুল ছড়াতে এলে' সেই ক্লিশে থেকেই উৎসারিত হয়েছিল, অভিজ্ঞতা থেকে নয়। 'জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা' প্রণব রায়ের এই গানেও সমাধি-ভাবালুতার গন্ধ লেগে আছে। বাংলা গানে তাজমহলের কাছ থেকেই এই ভাইরাসটি সংক্রামিত হয়েছিল। সমাধির মতো আর-এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া ছিল বৈষ্ণব পদাবলী থেকে ধার-করা শব্দে। সেই যমুনা, বাঁশি, শ্যাম, রাধা, রাই, কদম কানন, এইসব নিয়ে আমাদের গীতিকারদের দুর্বলতাকে যথেষ্ট তিরস্কার করত আমাদের উদ্ধত তারুণ্য, সে-গানের শিল্পী যেই হোন না কেন। 'আমি স্বপন দেখেছি কাল রাতে, দোলে রাই ফুল-দোলনাতে' (চারু মুখোপাধ্যায়), 'প্রেমযমুনায় হয়তো কেউ ঢেউ দিল ঢেউ দিল রে' (মোহিনী চৌধুরী), 'রাধিকাবিহনে কাঁদে রাধিকারমণ' (অনিল ভট্টাচার্য), 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি' (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার), 'বৃন্দাবনে শ্যাম নাই'(পবিত্র মিত্র), 'ও আমার মন-যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাবতরঙ্গে কতই খেলা' (শ্যামল গুপ্ত); তালিকা বাড়িয়ে কী হবে! মোটের ওপর একটা সময় ছিল, যখন বাংলা গানে এইসব পদাবলী-র দগ্ধচিহ্নগুলো দেখলে আমরা সমাজ-মনস্কতাহীন খোসপাঁচড়া বলে মুখ সিঁটকে থাকতাম। প্রেম নরনারীর সামাজিক সম্পর্কের একটি স্তর। এই সম্পর্ক সামাজিক কারণেই দুটি মানুষকে নৈকট্যে বাঁধে, সামাজিক জীবনের ছন্দে গ্রথিত করে। অথবা সামাজিক কোনো কারণেই সেই সম্পর্কের জোড় খুলে যায়। কিন্তু বাংলা গানের গীতিকাররা প্রেম নিয়ে যেসব নাকে-জল-ঝরানো হাঁচি, গলা-খুশখুশ কাশি, ঘুম-না-আসা ফোঁসফোঁস শব্দ করতেন, তাতে আমাদের মনে হত, তারা যেন এই সমাজের মানুষ নন, তারা বোধ করি 'ফিরিচঞ্চুসের চিকচাক্স্ আমদানি'।

৩.

বর্তমান প্রবন্ধকারের বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গ, সমাজমনস্কতার প্রেক্ষিতে আজকের বাংলা গান। 'আজকের' শব্দটি খুবই ঝাপসা ও আত্মপ্রতারক অভিধা মাত্র, কারণ তার স্পষ্ট এলাকা কোথাও চিহ্নিত হয় না। আর সমাজমনস্কতাও একটি কৃত্রিম শব্দ এই অর্থে যে, গীতিকারের জীবনবোধ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকলে কেবল গানের ভাষা থেকেই এই সমাজমনস্কতার অস্তিনাস্তি শনাক্ত করা উচিত নয়। অন্তত চাঁদ ফুল জোছনা আকাশ নদীর নাম জপলেই কোনো গানকে সমাজমনস্কতাহীন বলে নির্বাসিত করা যায় না। সমাজমনস্কতাকে কবিতা করে তুলতে না পারলে গান হয়ে যায় নিছক প্রবন্ধ, তা সুরে তালে গাইলেও। আর সমাজমনস্কতার ব্যাকরণকৌমুদী না মানলেও গান গান হয়ে উঠতে পারে কবির সহজাত সমাজবোধে, জীবনের স্বতঃস্ফূর্তি দায়বদ্ধতায়। একালে বাংলা গানে গীতিকার-কবির অভাব নেই, কিন্তু সত্যি বলতে কী, অভাব যথার্থ প্রতিভার, অভাব ভাষা ও শব্দের ভারসাম্যরক্ষারও বটে। চলে-যাওয়া কালের গানে একটা পর্ব ছিল যখন সমাজমনস্কতার নামে অতি-বাম বাহুল্যও কিছু শ্রবণদুষ্টতা ঘটিয়েছিল। হয়তো সেই প্রতিক্রিয়ায় কেউ কেউ গান লেখার প্রয়োজনে বেঁকেই বসেছিলেন এই ভেবে যে, ওই ঝান্ডা আর বিপ্লব, ওই কৃষক আর শ্রমিক, ওই লাল সূর্যোদয় আর ধানের গোলা, এইসব শব্দ গানে ব্যবহারই করবেন না। একালের এক জনপ্রিয় সংগীতকারের একটি চেনা গান অনেকটা সেই অভিমানী মনোভাবকে যেন মনে করিয়ে দেয়:

আঁকো ফুল নদী আর প্রজাপতি
আঁকো মিকি মাউস অগতির গতি
আঁকো কুঁড়ে ঘর যদিও তোমরা
পাকা বাড়িতেই থাকো।
এঁকো না কখনও স্বদেশের মুখ
তোবড়ানো গাল ভেঙে-যাওয়া বুক
মরো মরো তার পরান-ভোমরা
বসে আঁকো বসে আঁকো।
আঁকো আলপনা আঁকো লতাপাতা
আঁকো মহেন্দ্র দত্তর ছাতা
আঁকো ইংলিশ মিডিয়ামে-পড়া
টুইঙ্কিল টুইঙ্কিল লিটল স্টার।
এঁকো না কখনও চেনা রাস্তায়
কাগজ-কুড়িয়ে-ভরে-বস্তায়
যে-ছেলেটো রোজ একা চলে যায়
তার মুখ কদাকার।

সুমন চট্টোপাধ্যায় : বসে আঁকো

আজকালকার গীতিকারদের কাছে সমাজমনস্ক হওয়ার জন্যে কি কোনো সাধনার দরকার হয়? বরং সমাজমনস্কতার শর্তগুলিকে রপ্ত করে নেওয়া মোটেই কঠিন হয় না। বাণিজ্যের কারণে গানকে কনজিউমার গুড তৈরি করে তোলার আর্ট শেখা যে সহজ, তা এই গানের ভাষাই বলে দেবে:

প্রিয় শব্দেরা বন্দি
আমি করেছি সন্ধি
বাজারের সাথে বাজারি হয়েই
করেছি যে সন্ধি
ফিট হতে হবে ফিট হতে হবে
এমন কথাই চাই
তাই কাব্য ছাড়ি কবিতার সঙ্গে আড়ি
হয়ে গেছি গান-ব্যাপারি সবাই।
এটা রুচি ছাড়াই রুটির লড়াই
কত ইচ্ছে-অনিচ্ছের পায়ে
দিয়েছি শেকল পরিয়ে
হাসিকান্নার রেট বুঝে মার্কেটে
গানগুলো দিই ছড়িয়ে
কত প্রিয় কথা-কবিতাকে
নিজ হাতে খুন করে যাই।...

পার্থ ভট্টাচার্য

একে কি সমাজমনস্ক গীতিকারের আত্মবিক্রয়ের জবানবন্দি বলা যায়?

সমাজমনস্কতা কবিতাকে শাসন করলে তা কখনও কখনও তীব্র তীক্ষ্ণ হয়েও উঠতে পারে। সমাজমনস্ক গান আমাদের হতচকিত করতে পারে, গায়ে ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিতেও পারে। একালের তথাকথিত জীবনমুখী গানের খুব চেনা কয়েকটি চরণ তুলে দিচ্ছি:

পৃথিবীটা বড়ো রঙিন, ভাবত এ-কথা খোকন
তাকে ঘিরে কত হাসি আনন্দ থাকত ঘিরে যখন।
ছোট্ট খোকন বাবা আর মা, দুপুররাত্রি সকাল সন্ধ্যা
সুখের সাতকাহন।...

ছুটির দিনেতে নিকো পার্কেতে কিংবা চিড়িয়াখানায়
সারাদিন শুধু ছুট আর ছুট ক্যাডবেরি আইসক্রিম ডালমুট
খেলা আর খেলা
মার লিপস্টিক বাবার সাদা জামায়
বাবার চওড়া কাঁধেতে আরামে ঘুমোত সে যখন।
খোকন এখন হস্টেলে থাকে। রঙিন পৃথিবী কালো
বাবা করেছেন বিয়ে আবার মা করছেন লিভ টুগেদার
খোকন ছাড়া মোটামুটি আর সবাই রয়েছে ভালো।
দুটো পার যদি এক হতে না চায় সেতুর কী প্রয়োজন
বিষের প্যাকেট খোকনের হাতে ভাবছে খোকন যাবে কোন্ খাতে
অনাহুত হয়ে বেঁচে থাকা নাকি মৃত্যুর আয়োজন।
বিষ হাতে নিয়ে খোকন, ভাবছে এ-কথা খোকন।

নচিকেতা

এমন বিষয়কে গানের উপাদানে পরিণত করার স্পর্ধা যে-কবির আছে, নিছক সমাজমনস্কতার শংসাপত্র তাঁর পক্ষে অবান্তর। তবে এ-গান শুনে গায়ককে বাহবা দেওয়া যাবে না। আত্মগ্লানির দুঃসহতায় নীরব হয়ে যেতে হবে।

আজকের গানে সমাজমনস্কতা তাই কোথাও কোথাও অতি কঠিনতপ্ত লৌহশলাকার মতো। গানের নন্দনতত্ত্ব তছনছ হয়ে যায়। বিখ্যাত সব ললিত কাব্যপঙ্‌ক্তি বিপরীত অর্থের পাঁকে পা ডুবিয়ে করুণ অসহায় মূর্তি ধারণ করে। নচিকেতার আর-একটি গানের কথা মনে আসে যেখানে হাসপাতালের বেডে রোগীর পাশে খেলা করে শুয়োরের বাচ্চা এই কথাগুলো উচ্চারিত হয়, আর তারই ব্যাকগ্রাউন্ডে 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' শুনিয়ে ভারি বিচ্ছিরি অস্বস্তি ঘনিয়ে তোলা হয়। 'আকাশভরা সূর্যতারা' শব্দগুচ্ছকে ধাক্কা দিয়ে কোথায় এনে ফেলেছিলেন অঞ্জন দত্ত তাঁর একটি গানে, শুনেছেন সবাই:

আকাশভরা সূর্যতারা আকাশমুখী সারি সারি
কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়া ঠাসাঠাসি বাক্‌সোবাড়ি
এখান থেকেই চলার শুরু এখান থেকেই হামাগুড়ি
এখানটাতেই আমার বাসা আমার বাড়ি।

ঠিক এমনি ঢঙেই তপন সিংহ ছোটোদের খেলার ছড়ার কয়েকটি ছত্রকে বল করে নিয়ে সমাজমনস্কতার উঁচু পাঁচিল থেকে আলতো করে ছুঁড়ে দেন প্রমোটারের থাবার মধ্যে:

বাড়ির পাশে সবুজ ঘাসে অনেকটা জমি ফাঁকা
আজকাল যার মূল্য অনেক, কয়েক লক্ষ টাকা
বিকেলে খেলত বাচ্চাগুলো
সারাগায়ে মেখে সবুজ ধুলো
এলাটিং বেলাটিং সই লো,
কীসের খবর আইল?
প্রমোটার মশাই এই জমিটা চাইল।

সমাজবাস্তবতার এই জ্বলজ্বলে চেহারা মুহূর্তে গানের ফ্রেমের কাচ ভেঙে যেন ভ্যাংচায়। শিশুদের খেলার মাঠ চুরি, বহুতল বাড়ি ওঠা, চোরাকারবার, বধূহত্যা, কফিহাউসের আড্ডা, রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও হকার, বিজ্ঞাপন, রেশন, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, টিভি, ভোলে বাবা পার করেগা লাইন, লরি-ট্রাকের হেলপার জগাই, সদ্য-চাকরি-পাওয়া সেই ছেলেটি যে বেলাকে ফোনে খবরটা জানাতে চাইছিল, লোডশেডিং, বসে-আঁকো প্রতিযোগিতা, বানতলা, সফদর হাশমি, চুনি কোটাল — এইজাতীয় সব সমাজমনস্কতার ঢেউ আজকের বাংলা গানের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে। বিশ-তিরিশ বছর আগে এসব অবিশ্বাস্য ছিল। অবশ্য সলিল চৌধুরীর গানে আর গণসংগীতে বেসুর কিছু বেজেছিল, তবু তাদের উপেক্ষা করেই জনপ্রিয় গীতিকাররা বাংলা গান বলতে বুঝতেন 'মউল ফুলে জমেছে মউ হিজল ডালে ডাহুক ডাকে' কিংবা 'মউবনে আজ মউ জমেছে বউ কথা কও ডাকে'। নব্বই-এর দশকের স্পর্ধিত দুঃসাহস, নিয়ম-ভাঙা স্বাধীন স্বেচ্ছাচার, রোমান্টিকতার ড্যাম্প-লাগা দেয়াল থেকে সব পলেস্তারা খসিয়ে দিয়েছে। জীবনমুখী শব্দের যত সমালোচনাই করি না কেন, এই জীবনমুখী গানের রচয়িতারাই বাংলা গানের বস্তুতন্ত্রহীন শ্যাওলা-গায়ে ঝামা ঘসে দিয়েছে। গণনাট্য সংঘ ও সলিল চৌধুরীর যুগ পেরিয়ে একালের জীবনমুখীরাই রোমান্টিকতার শেষ পেরেকগুলো উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন।

৪.

তাই বলে, পঞ্চাশ-ষাটের দশকের গীতিকাররা কি সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ আড়ি বাধিয়ে বসেছিলেন? নিশ্চয়ই তা নয়। অথচ গত দু-তিন দশকে বাংলা গানের জমিতে বহু আগাছা এঁদের প্রশ্রয়েই বেড়ে উঠেছিল। তার কারণ এই নয় যে এঁদের মধ্যে সমাজমনস্কতার অভাব ছিল। তার আসল কারণ, এঁরা সমাজমনস্কতা নিয়ে মাঝেমাঝেকটুকাটব্য করতে ভালোবাসতেন। নইলে ভবেশ গুপ্তর মতো কবি কেন লেখেন:

ও কালো কোকিল তুই যা রে ফিরে যা রে
এই শহরের পিচঢালা পথে তুই
ফাগুন খুঁজিস নারে।

তাই প্রথামাফিক গানের কথা নিয়ে অপটু ছেলেমানুষি নির্ভয়ে খেলাচ্ছলে অনেকেই করেছেন।

আশ্চর্য, সুরকার বা শিল্পীরাও উচ্চবাচ্য করেননি। সিরিয়াস গান না বিশুদ্ধ রসিকতা বুঝতে পারিনি, যখন শুনেছি এই গান:

যাব গো সেই দেশে যেখানে প্রেম অজানা
কাজ নেই শুধু শুধু খাল কেটে কুমির আনা!
প্রেমের ভূত যদি একবার ধরে গো
ওঝা সে ভূত ঝাড়ে না।

এর রচয়িতা স্বপন চক্রবর্তী, যিনি অনেক ভালো গানও রচনা করেছেন। তবু এইজাতীয় গান লিখে হয়তো নিজের সঙ্গেই তামাশা করেছেন! গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মতো শক্তিশালী গীতিকার যখন লেখেন:

তুমি বাজ পড়লেই চমকে উঠে জড়িয়ে ধরো আমায়
সময় কাটাই তাই তো আকাশ দেখে
মেঘ করবে বাজ পড়বে কখন আকাশ থেকে
হায় হায় মেঘ করে না বাজ পড়ে না।

তখন শুনে আশঙ্কা হয়, সমাজমনস্কতাকে জিভ ভ্যাংচানোই বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। একই উদ্দেশ্যে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কবিও চোখ বুজে লেখেন:

তোমায় পেয়ে সবই পেলাম
এত সুখ কি আমার সইবে
দুরু দুরু করে মন
কে জানে কতক্ষণ
এমনই দখিন হাওয়া বইবে।

এ-জাতীয় গান পঞ্চাশ বছর আগেও লেখা যেত। অথচ এঁরা সব আধুনিকতার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে বেড়াতেন। গৌরীপ্রসন্নের কলম থেকে এমন-সব গান বেরিয়েছে শুনে অবাক হই না। কারণ সমাজমনস্কতা এঁদের বিশ্বাসের দেয়ালে কোনোদিনই ফাটল ধরায়নি।

তা সে যাক। আজকের গানের আসরে সবাই যে শক্তিশালী দক্ষ পটু কবি-গীতিকার, তা হয়তো নয়। তবে জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতায় এঁদের কোনো ত্রুটি নেই। হয়তো কখনও কখনও কবিত্ব হোঁচট খেয়েছে, এই যা। সুধীন দাশগুপ্ত মূলত সুরকার, তবুও লিখে গেছেন কয়েকটি গান। যেমন:

একঝাঁক পাখিদের মতো কিছু রোদ্দুর
বাধা ভেঙে জানলার শার্সি-সমুদ্দুর
একঝাঁক পাখিদের মতো কিছু রোদ্দুর
এল আঁধারের শত্তুর।

শেষ বাক্যটি দুর্বল যোজনা হয়ে গেছে। হয়তো সলিল চৌধুরীরও কোনো কোনো রচনা সমাজমনস্কতার তীব্রতায় প্রবন্ধ হয়ে গেছে, স্লোগান হয়ে গেছে। সে-কথা কবুল করায় সংকোচ

নেই। যথা :

আমার প্রতিবাদের ভাষা
আমার প্রতিবাদের আগুন
দ্বিগুণ জ্বলে যেন দ্বিগুণ
দারুণ প্রতিশোধে করে চূর্ণ ছিন্নভিন্ন
শত ষড়যন্ত্রের জাল যেন
আনে মুক্তির আলো শত লক্ষ প্রাণে।
আমার প্রতি নিশ্বাসের বিষে
বিশ্বের বঞ্চনার ভাষা
দারুণ বিস্ফোরণ যেন
ধ্বংসের গর্জন হানে।
যত বিপ্লব-বিদ্রোহের আমি সাথী
আমি মাতি যুদ্ধের হেথায়-সেথায়
মানুষের মুক্তির বিপন্নতায়
আমারই রক্ত ঝরে দেশে দেশে
বন্দরে শত মরুকন্দরে গৌরীশিখায়
মিলনের তীর্থের সন্ধানে।

সমাজমনস্কতা ও নন্দনতত্ত্ব এ-দুয়ের দ্বান্দিক সম্পর্কের মধ্যেই থাকে গানের শিল্পকৌশলের রহস্য।

গণনাট্য সংঘের গানে আমরা যারা একদা অংশ নিয়েছিলাম, তখন আমাদের পিছনে নন্দনতত্ত্বের ভূত তাড়া করে ফেরেনি। তখন সমাজমনস্কতাই হয়তো আমাদের একমাত্র মূলধন ছিল। লড়াইয়ের জামা আর স্লোগানের প্যান্ট গানের রঙে চুবিয়ে জনগণের সভায় শুকোতে দিতাম, হাততালির বাতাসে খুব তাড়াতাড়িই সেগুলো শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে যেত। সেগুলোকে কাব্যশাস্ত্রের ইস্তিরি বুলিয়ে মসৃণ স্মার্ট ভদ্র ফিটফাট করার দুর্ভাবনা আমাদের ছিল না। চুনোপুঁটি ল্যাটা খয়রার তো কথাই নেই। রমেশ শীল গুরুদাস পাল নিবারণ পণ্ডিত থেকে শুরু করে বিনয় রায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরেশ ধর সাধন দাশগুপ্ত সুরেশ বিশ্বাস দিলীপ সেনগুপ্ত অনল চট্টোপাধ্যায় প্রবীর মজুমদার — এঁরাও কমবেশি তাই করেছেন। কারণ, গানকে কবিত্বের কোয়ালিটি কন্ট্রোল পরীক্ষায় পাস করিয়ে আই.এস.আই. স্ট্যাম্প মারার দিকে গণনাট্যের শিল্পীদের তেমন সতর্কতা ছিল না। ফলে গানের জায়গায় স্লোগান, কাব্যের বদলে বক্তৃতা, কল্পনার চেয়ারের বদলে ক্যাটকেটে সত্যের শতরঞ্চি, এইসব একটু বেশি প্রশ্রয় পেয়েছিল। তাই :

আমি কর্ত্তাভজার দলে
বাইরেতে বোষ্টমি আমি ভিতরে দুর্নীতি চলে
বাস্তুহারার ক্যাম্পে গিয়ে ভাসি চোখের জলে
যদি কচে বারো করতে পারি ইলিকশানটার তলে তলে

— গুরুদাস পালের অতিসরল এই গানে হইচই করেছি, নন্দনতত্ত্বের রুমাল নাকে ধরে

জীবনমুখী গানের জ্যাঠামশায়ের মতো বলিনি, 'গণসংগীত আর জনগণের সংগীত নেই, তা হয়ে উঠেছে পার্টির জয়গানের মাধ্যম'। শুধু তাই নয়, গণসংগীত ব্যাপারটাই এখন এত ক্লিশে হয়ে গেছে যে অতিবড়ো বামপন্থীও দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে চান না।

তবে আমরা শুনতাম। বিনয় রায় গাইছেন, হাজার হাজার শ্রোতা স্তব্ধ হয়ে শুনছেন :

কমলাপুর শহিদ ডাকে আয় রে আয় আয় রে
ডোহাঁজোড়ার শহিদ সুরেন তাদের পানে চায় রে
চন্দন পিঁড়ির সরোজিনী অহল্যার মা
তাদের খুনের অর্পণ হল না
সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে ফলাল সে সোনা
তার মা-বোনের রক্তে হল সোনার মাটি লোনা,
রক্তের ধার বেঁধে মোদের প্রতি গ্রামে গ্রামে
কবে বল কবে শুধব তা
প্রাণ আর মানে না।

সমাজমনস্কতার শর্তে অনেক ক্লিশেকে তখন আমরা সহ্য করেছি, এ-কথা সত্যি। তাতে একটু আতিশয্য নিশ্চয়ই ছিল। সমস্যা তো সেখানেই — সমাজমনস্কতা কখনো গান হয়, কখনো শুধু মুষ্ট্যাঘাত হয়, সমাজচৈতন্য কখনো ধান হয়, কখনো শুধুই খড় হয়, ভাষা কখনো কবিতা হয়, কখন শুধুই প্রবন্ধ হয়! বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা শেষপর্যন্ত কবিতা বলেই গনগনে সমাজসত্য, খবরের কাগজ-জ্বালানো দাউদাউ আগুন নয়। যথা :

রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
দিন বদলায় না।
গোটা পৃথিবীকে গিলে খেতে চায়
সেই যে ন্যাংটো ছেলেটা
কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার
লড়াই চলছে চলবে
পেটের ভিতর কবে যে আগুন জ্বলছে এখনও জ্বলবে।

অথচ ওই একই দোষে সলিল চৌধুরীর মতো মহান গণসংগীতকারও প্রচারের দায়ে মুখ-থুবড়ে-পড়া ভাষার আঁচল ধরেন ভুল করে; ও আয় রে ও আয় রে গানে :

চাষি হবে জমির মালিক স্বরাজ হলে শুনি
এখন মালিক যত ঘুঘু শালিখ পেশাদারি খুনি
আর নেতা বড়ো বড়ো
সব বক্তৃতাতে দড়
এখন নিজ হাতে ভাগ্য গড়ার এসেছে সময় রে।

অবশেষে ত্রুটি-সংশোধনের সুযোগ পেয়ে সমাজমনস্কতার ভিজে সপসপে গামছা ছেড়ে কবিত্বের শুকনো ফরসা ধুতিটা পরে নেন তিনি। ওই একই গান ঝলমল করে ওঠে:

এই মাটিতে কলিজার আশা স্বপ্নের বীজ বুনি
আর চোখেরই জল সেচ দিয়ে ফসলের কাল গুনি
খেতের আলে আলে
আজ সোনালি ঢেউ খেলে
আহা মাটি মাতা
আমরাই তো বিধাতা
এই মাটিতে নবজীবনের রংমশাল বানাইরে।

সুতরাং সমাজসচেতন বুদ্ধিজীবী লড়াকু হলেই ভালো গান লিখতে পারেন এমন নয়। আবার সমাজমনস্কতার অসহিষ্ণু লাঠি-হাতে তাড়া করলেও গানের বাগান থেকে চাঁদ তারা ফুল চুরি বন্ধ হবে না। সুরের লগি ঠেলে গানকে অশ্রাব্যতার চর থেকে উদ্ধার করলেই গান তরতরিয়ে পাল তুলে চলবে, এমন বিশ্বাস নেই। সমাজমনস্কতা আর কবিত্ব, তা হলে কি অনেকটা শিং-গুতোনো দুই বুনো মোষ? উপমাটা পছন্দ না হতে পারে, তবে অনেকটা এইজাতীয় উপমা নিয়ে জনৈক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা গান লিখেছিলেন, প্রতুল মুখোপাধ্যায় সেটা সুর দিয়ে গাইতেন। একেবারে শক্ত নিরেট সমাজমনস্কতার ধাতু দিয়ে তৈরি ছিল গানটা, তার গায়ে কবিত্বের ছিটেফোঁটাও হয়তো নেই। তবু গানটা শেষ হয়ে গেলে মনে হত, একে 'ধুত্তেরি' বলে ভুলে থাকা যাচ্ছে না, কান থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না। গানটা ছিল এইরকম:

স্লোগান দিতে গিয়েই আমি চিনতে শিখি
নতুন মানুষ জন
স্লোগান দিতে গিয়েই আমি বুঝতে শিখি
কে ভাই, কে দুশমন।
হাট-মিটিঙে চোঙা ফুঁকেছি
গেট-মিটিঙে গলা ভেঙেছি
চিনছি শহর গ্রাম
স্লোগান দিতে গিয়েই আমি
সবার সাথে আমার দাবি
প্রকাশ্যে তুললাম।
স্লোগান দিতে গিয়েই আমি
ভিড়ে গেলাম গানে
গলায় তেমন সুর খেলে না
হোক বেসুরো পর্দা-বদল
মিলিয়ে দিলাম সবার সাথে
মিলিয়ে দিলাম গলা।...

জুটল যত আমার মতো
ঘরের খেয়ে বনের ধারে
মোষ-তাড়ানো উলটো স্বভাব,
মোষ-তাড়ানো সহজ নাকি?
মোষের শিঙে মৃত্যু বাঁধা
তবুও কারা লাল নিশানে
উশকে তাকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে।
স্লোগান দিতে গিয়েই আমি
জেনেছি এইসব
সাবাস যদি দিতেই হবে
সাবাস দেব কার —
ভাঙছে যারা ভাঙবে যারা
খ্যাপা মোষের ঘাড়।

হঠাৎ এ-গানের কাটা-কাটা সমাজবিপ্লবের কথায় স্পেনের বুল ফাইটের ইমেজারির সূক্ষ্ম আভাস দিয়ে কবি রচনাটিকে সুন্দর উতরে দিলেন। সম্ভব হলে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে গানটি শুনে নেবেন।

তবে সব উতরোয় না। যেমন সলিল চৌধুরীরই আর-একটি গান। শুনতে যেমনই লাগুক, আমার নান্দনিক বোধ তৃপ্তি পায় না এর আত্মতৃপ্ত স্বীকরণে:

এ-জীবন বেশ চলছে সবকিছু বেশ চলছে
একটু শুধু যা অন্ন নাই মা ও বোনেদের বস্ত্র নাই
কর্ম নাই এ-বেকার জীবন আর সব ঠিকঠাক বেশ চলছে।
বাজারেতে সবকিছু আকাশ-ছোঁওয়া
কয়লা-বিনাতেই ভাই উঠছে ধোঁয়া
বড়ো বড়ো নেতা জনতার হাতে
ধরিয়ে যে দিচ্ছে ভাই মুড়ির মোয়া
আর কী কব চারদিকে চুরি আর ঘুষখোরি
কালোবাজারিতে দেওয়া-নেওয়া।
আর সব ঠিকঠাক বেশ চলছে।
পথে পথে ভরে গেছে ভিখারি
বিলডিং উঠছে ভাই সারি সারি
লাখে লাখে কত না ডিগ্রিধারী
পারছে না ঘোচাতে তার বেকারি
আর কী কব
সবকিছু বুঝে মুখ বুজে বুজে
সয়ে যাব আমরা কী করতে পারি।

এই গানটার সঙ্গেই মনে আসতে পারে গণসংগীতশিল্পী অজিত পাণ্ডের একটি গানের কথা।

কয়েক বছর আগে নাগপুর শহরের রাস্তায় নিরীহ আদিবাসীদের তাজা শরীরের উপর দিয়ে মৃত্যুর ট্রাক চলে গিয়েছিল আকস্মিকভাবে। অজিত পাণ্ডের এ-গানের ভাষায় বেদনা ও বিদ্রূপ কী গভীর ক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। অথচ অজিত পাণ্ডের এ-গান কবিতার শর্ত লঙ্ঘন করেনি কোথাও, সমাজমনস্কতা কবিতাকে জিভ ভ্যাঙায়নি। অজিত গাইছেন :

খাচ্ছি-দাচ্ছি প্রেমিকের ঠোঁটে মুখ রাখছি
শনিবারে জিটিভি এমটিভি ভিটিভি
ডিডি আর চ্যানেল থার্টিস
রবিবার গেস্ট-ফেস্ট পার্টি পিকনিক
বেশ আছি ভালো আছি
চালাও পানসি বেলঘরিয়া
কেয়া হ্যায় জিন্দেগি...
কিন্তু ... নাগপুর? তুমি একা বড়ো একা।
বউবাচ্চা হারিয়ে মংরু মাঝি
এখনও খোঁজে খোঁজে আর কাঁদে
মুন্নি বুধনি কাঁহাকে গৈল্ হো
বুটে আর বেয়নেটে হারিয়ে গেল।
কিন্তু আমরা?
বেশ আছি ভালো আছি
কখনও ম্যান্ডেলা কখনও ভিয়েতনাম
কখনও আরাফত কখনও সাদাত
এই নিয়ে মেতে আছি
নিয়ে আমাদের সংহতি
বেশ আছি ভালো আছি
খাচ্ছি দাচ্ছি প্রেমিকের ঠোঁটে মুখ রাখছি...
চালাও পানসি বেলঘরিয়া
কেয়া হ্যায় জিন্দেগি...
কিন্তু নাগপুর...তুমি একা।...

সংবাদকে কাব্য করে তোলার ক্ষমতাই আমরা কবি-গীতিকারের কাছে প্রত্যাশা করি। সেই-জন্যেই ভালো লাগে সৈকত কুণ্ডুর অনেক গানের মধ্যে এই গানটি :

প্রতিদিন খবর আসে খবর কাগজ সুপ্রভাতে
প্রতিদিন মরছে মানুষ কাশ্মীরে কি জেহানাবাদে
সচিত্র বর্ণমালায় থমকে-থাকা স্বপ্নের লাশ
প্রতিদিন নতুন খবর রোমাঞ্চিত চায়ের গেলাস
কাটা-গলা কাটা-মাথা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়
রক্তের ফিনকি লেগে শুকনো ভাতের থালার উপর
ধড়হীন মুণ্ডমালার সমবেত অট্টহাসি

আজকের টাটকা খবর দিন ফুরোলেই কালকে বাসি।
বলো বলো কী আসে যায় তোমার আমার
রাজনীতি মারবে যাদের তারা তো লাশ সংখ্যা গোনার
অনন্ত সংখ্যা দেখো গুনছে চেনা আঙুলগুলি
উদাসীন আকাশ দেখে গণদাহের দীপাবলি।
দেখো দেখো ভালোমানুষ নিছক দেখায় কী বা ক্ষতি
উলঙ্গ চাঁদও দেখে ছিন্ন হওয়া গর্ভবতী
সচিত্র খবর দেখো শিউরে উঠছে গোপন সুখে
অশ্লীল রক্ত লেগে তোমার আমার সবার মুখে।
মৃত ওই গর্ভ আবার যন্ত্রণাতে উঠবে হেসে
ছড়াবে বিশেষ নেশা মায়ের স্তনবৃন্তে মিশে
নীরব চাঁদের নীচে জন্ম নেব তুই ও আমি
প্রতিটি শবের দেহ আমার নতুন জন্মভূমি।

৫.

হালের গান নিয়ে আরও দু চার কথা মনে আসে। মৌসুমী ভৌমিক তাঁর একটি পরিচ্ছন্ন রচনায় শুনিয়েছেন, কেন পুরোনো মূল্যবোধকে একেবারে আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। তাঁর গানের ভাষা এই :

কিছু ফেলতে পারি না
পুরোনো চামচে পড়ে-থাকা ছেঁড়া মোজাজোড়া
ছেঁড়া সোয়েটার
তোশকের নীচে জমানো প্যাকেট
মরচে পড়েছে কৌটোতে তবু ফেলতে পারি না
ছিঁড়ে-যাওয়া জুতো ভাঙা টর্চসেল বাঁটি
কবেকার চিঠি...
মরা প্রজাপতি পুরোনো ঝিনুক
কিছু ফেলতে পারি না আনাচে কানাচে
জমে ওঠে ধুলো মাথার ভিতর আগাছা ঘনায়

ছোটো ছোটো শব্দের দৃশ্যচিত্রে সাবেক মূল্যবোধের প্রতি মমতাকে খুব সততার সঙ্গে তুলে ধরা গেছে গানটিতে। শুভেন্দু মাইতি তেমন-কিছু বেশি গান লেখেননি, তবু দু একটি রচনায় প্রসন্নতা এনে দিয়েছেন। যেমন এই গানটি :

বুকের মধ্যে সাতটা সাগর ঢেউয়ে ঢেউয়ে তুফান তোলে
বুকের মধ্যে মঘাই নাচে গ্রিমতাকতাক মাদল-বোলে।
মরচে ধরে কারখানাটার লোহার গেটে
খিদে দাপায় বউ-ছেলে-বাপ-মায়ের পেটে

খিদে দাপায় তোমার মাথায় আমার মাথায়
তবু স্বপ্ন দেখি শুয়ে ছেঁড়া কাঁথায়।

স্বপ্ন দেখার মতো ক্লিশেকে বিলাসিতা বলে উড়িয়ে না দিয়ে শুভেন্দু গেয়েছেন :

স্বপ্ন দেখার সাহস করো
স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে নাকি
স্বপ্ন ছাড়া কেমন করে গান গাইবে পাখি
স্বপ্ন আর ফুলের জন্যে মরতে হলেও মরো।
জীবন কি তা দূরের নৌকো
স্রোতে কিংবা হাওয়ায় যাবে ভেসে
সামাল মাঝি নৌকো ভিড়াও সব পেয়েছি-র দেশে
ঢেউয়ের দাপট ঝাপট
মারুক ঝাপটা শক্ত হাতে হালটা চেপে ধরো।
ভাঙাচোরা মানুষ মানেই স্বপ্ন গেছে ভুলে
তোমার স্বপ্ন হারিয়েছে কার মেঘকালো চুলে।
মানুষ আবার হয় নাকি হে ভাঙাচোরা
ছোট্ট স্বপ্ন হারিয়ে গেছে
স্বপ্ন দেখো জগৎ-জোড়া।
মানুষ মানেই জীবন
জীবন মানেই ওলট-পালট নতুন কালের বোধন
ইতিহাসের জীর্ণ পাতা নতুন করে আবার পড়ো।

ফুল নিয়ে কম গলাগলি ও গালাগালি হয়েছে? এখনকার কবিদের কাছে তবু ফুল একেবারে অচ্ছুত হয়ে যায়নি। এমন একটি গান :

ট্রেন থেকে নামি ভোরবেলা ঠিক জানি না কোথায়
রাঙা মাটি পথ মিশে গেছে আকাশের মোহানায়
মাথার মধ্যে মৃত্যুর নেশা জ্বরে পুড়ে যাই
একটি পলাশগাছের আদরে থমকে দাঁড়াই
পলাশ কুড়িয়ে সাঁওতাল ছেলে কী যেন হাসে
যেন ও এনেছে প্রথম আলো ভোরের আকাশে
অপুষ্ট দেহ জোটে কী জোটে না দুটি খুদকুঁড়ো
তবু সে কুড়োবে ভোরের পলাশ আকাশের চুড়ো —

এই গানের গীতিকার পল্লব কীর্তনীয়া। নিজেকে নিয়ে, না কি সমাজমনস্কতাকে নিয়ে, তিনি আত্মবিদ্রূপ করেছেন যে-গানটিতে তার শাণিত ভাষা উপভোগ না করে পারা যায় না:

মানুষের খিদে নিয়ে গান লিখে যাই
সেই গান বেচে ফের পেট ভরে খাই

চামড়ায় রোদ্দুর উছলে তো ওঠে
পোশাকের ভাঁজে জ্যোৎস্না ফোটে।
গলফগ্রিনে অ্যাপার্টমেন্ট বিশ লাখ দাম
তোমাদের খিদে বেচে আমি কিনলাম
গাড়ি কিনি বাড়ি কিনি খুশি কিনি কত
সাগর পাহাড় কিনি ইচ্ছামতো।
আভিজাত্যও কিনি, কিনি সম্মান
কেন না আমার মুখে খিদে নিয়ে গান...
বাঘাবাঘা যুক্তিতে শান দিয়ে বলি
আমি তো শিল্পী শুধু নেই দলাদলি।
কিন্তু যুক্তিশেষে তলানি যা থাকে
সেখানে কান্না কেন ঘিরেছে আমাকে
তবে কি আমিও চাই খিদেটাই থাক
খিদের লড়াই আরও রক্ত ঝরাক
আমিও রক্ত আর খিদে লিখে যাই
রক্তের সুর বেচে ভক্ত নাচাই রক্ত বাড়াই
তোমার খিদেও বাড়ছে যত বাড়ছে আমার গানের দাম
তোমার খিদে নিলাম করি নিলাম করি লাল সেলাম।

একালের গীতিকার-সুরকার-শিল্পী নচিকেতা লিখেছেন গেয়েছেন অনেক গান, যথেষ্ট সমাজমনস্ক তিনি। সংক্ষেপে সংকেতে বলার চেয়ে অতি স্পষ্ট সত্যের উচ্চারিত পাঁচালিতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। তাঁর গানের কিছু ভাষা নিয়ে তো একসময় খুব বিতর্ক উঠেছিল। সেই যে তিনি লিখেছিলেন, আগে যে-গানের উল্লেখ করেছি —

যেদিকে তাকাই না দেখি জন-অরণ্য
সে-অরণ্যে দেখি মানুষেরা বন্য
বধূকে পোড়ানো হয় অধর্ম জয়ী হয়
মানুষের রক্তেই দিনলিপি সই হয়
হাসপাতালের বেডে টিবিরোগীর সাথে
খেলা করে শুয়োরের বাচ্চা
তবু রেডিয়োটা টিভিটার সাথে
সুর ধরে সারে জাঁহাসে আচ্ছা।

এইজাতীয় লক্ষ্যভেদী ঢিল ছোঁড়ায় নচিকেতা পটুত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গানের কথা গনগনে আঁচের ধারে কানকে টেনে আনে। প্রণব রায় অজয় ভট্টাচার্য শৈলেন রায় মোহিনী চৌধুরীরা এই ভাষা শুনে হতচকিত হতেন, আমরাও হই। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের মা-বাবাদের বাচ্চাকে স্কুলে-ভরতি-করা নিয়ে সেই ভয়ংকর ঘামে-ভেজা অভিজ্ঞতা তাঁর গানে শুনতে পেয়ে আমরাই লজ্জা পাই :

৭

বাচ্চা হবেই শুনে চারিদিকে খোঁজ খোঁজ
কোথা ভালো স্কুল আছে... কারা কটা ছেলে নেবে
প্রপার এডুকেশান মোটা মোটা ডোনেশান
ক্ষতি নেই যদি দাও ওভার ওভার ডোজ
রাত জেগে বাবাদের লাইন দিয়ে ফর্ম তোলা
ডোনেশান দিলে পরে পিছন-দরজা খোলা...
এর পরে পড়ে থাকে ভরতির পরীক্ষা
ছেলে নয় মা-বাবার অগ্নিপরীক্ষা
চুকে যায় জীবনের দাম্পত্যের সুখ
গ্রাম-দেশে বিয়ে-করা বাবা আনে হাতে-ধরা
মায়েদের জন্যে ইংরেজি ওয়ার্ডবুক
তিনজনে শিক্ষিত হতে চায় রাতারাতি...
বাচ্চার হয়ে গেলে মা-বাবার প্রতীক্ষা
কবে স্কুল ডাকে নিতে তাদেরও পরীক্ষা
সবকিছু ভালোভাবে যদি শেষ হয়ে যায়
বাবা গর্বিত হয়ে মুখ দেখে আয়নায়...
শিক্ষার আয়নায় সমাজকে চেনা যায়
সমাজ কি দেখে মুখ শিশুদের আয়নায়

ভেবে ভেবে মনে হয়, একদিন যাঁরা গানের আধুনিকতায় মুগ্ধ ছিলেন, তাঁদের কানে গুঞ্জরিত হত,

এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি
মাঝখানে নদী ওই বয়ে চলে যায়।

এই মাঝখানের নদীটা কীসের? অর্থাভাব, সামাজিক বৈষম্য, জাতি-বর্ণগত বাধা, বেকার জীবন? তাঁরা গানে তার সঠিক উত্তর না পেলে কিছুই প্রশ্ন করতেন না। কিন্তু সে-গান আজ যেন দূরের স্টেশন, সেখানে নতুন নতুন ট্রেনগুলো দাঁড়ায় না।

নারী রোমান্টিক কবিতার চিরকালের নায়িকা। কিন্তু সমাজমনস্ক কবির চোখে নারী সম্পর্কে কতবার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। সলিল চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি-কে দেখেছিলেন কলকাতার ফুটপাথের ভিখারিনিরূপে :

হয়তো তাকে দেখনি কেউ কিংবা দেখেছিলে
ছিন্ন শত আঁচল ঢেকে জীর্ণ দেহখানি
ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে
কী জানি কী ঝড়ে
গেছে বুঝি ঝরে
জীবনের তরু থেকে...

তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে সেই মেয়ে
দুটি শীর্ণ বাহু তুলে ও সে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে
অগ্নি মেগে মেগে ফেরে প্রাসাদ পানে চেয়ে
কে জানে হায় কোথায় বা ঘর কী নাম কালো মেয়ে।

হয়তো বা সেই ময়নাপাড়ার মাঠের কালো মেয়ে
মেঘলা দিনের কবির স্বপ্নের ছবি সেই মেয়ে—

ময়নাপাড়ার মাঠের কৃষ্ণকলি পঞ্চাশের মন্বন্তরে হয়তো কলকাতার ফুটপাথে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিল। এখনকার কবি নচিকেতা তাকে এবার আবিষ্কার করেছেন — বলতে সংকোচ আর নেই — রেডলাইট এরিয়ায় :

যখন ঘনায় রাত্রি পাথুরে শহরে
যখন ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস আকাশে অঝোরে
ঠিক তক্ষুনি সস্তার মেকআপেতে মুখ ঢেকে
লাজলজ্জার সংস্কারকে পিছে রেখে
সেই সাধারণ মেয়েটাই শহরে বিলোতে প্রেম
রাস্তায় এসে দাঁড়ায়
প্রেমহীন শহরের কদর্য লোকগুলো
তার কাছে প্রেম চেয়ে দু-হাত বাড়ায়
ঠিক তক্ষুনি মন্দির-মসজিদ-গির্জায়
শুরু হয় পুজো-আরাধনা
বিশ্বপ্রেমের পাঠে শিক্ষিত হয় লোক
আঁকে প্রেমের আলপনা
সব পাপ দিয়ে আসে মানুষ দেবস্থানে
দেবতারা হাসে তুলে মাথা
মাঝরাত্তির হলে ফিরে যায় সেই মেয়ে
ঘরে রোজগার বারো টাকা।...

৬.

মাঝে মাঝে সমকালের গানের আসরে বসে ক্লিশের মহাভারত শোনার অভিজ্ঞতা হয়। সমাজমনস্কতার অভাবের অভিযোগ নয় — আসলে নতুনভাবে জীবনকে দেখার বা দেখানোর আগ্রহ নেই, হঠাৎ কারও জন্যে গান লেখার সুযোগ পেয়েছেন বলেই যেন বর্তে গেছেন, ভাষা শুনে এমনই মনে হয়। জনৈক সঞ্জয় বণিকের লেখা একটি গানের বাণী শুনুন :

তোর সাথে যে নদীর অনেক মিল
নদীর নামে তোকে যে তাই ডাকি
রোদ পড়লেই নদীটা ঝিলমিল
তোকে ভেবেই নদীর ছবি আঁকি।

এ-গান দু এক মুহূর্তের ভালো-লাগার বেশি কিছু দিতে পারে না। মাঝে মাঝে শুনি কোনো অর্ণা শীল রচিত গানের বাণী, যদিও তা টাটকা রুটিতে ক্লিশের জ্যামই পুরু করে মাখানো মনে হয়। তাই শুনতে হয় একালের সম্ভাবনাময় শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্যের কণ্ঠে:

একঘর মুখের সে-ভিড়ে
যেই চোখ খেলে লুকোচুরি
চাদরে লুটিয়ে-পড়া রোদে
ছুঁয়ে যায় স্বর্গের বুড়ি —
সেই চোখ স্বপ্নের তুমি
কেউ নয় সে নিছক তুমি।

ভালোবাসার গানে অর্ণা শীল নতুন শব্দ যোজনা করে তাঁর সমাজমনস্কতার প্রমাণ দিতে চেয়েছেন হয়তো, তবে তা ভাঙা কুলোয় আঁকা আলপনার মতো ঈষৎ বিসদৃশ লাগে:

এখনও পাতা-ঝরার সময় চোখে জাগে বিস্ময়
মুখে ভাষা
ভাঙাচোরা এই শহরের বুকে ভেঙে-যাওয়া শরীরে
জেগে ওঠে ভালোবাসা।
হাতের মুঠোয় একফালি চাঁদ
একলা দুপুরে পড়ে-থাকা ছাদ এখনও
ইটের পাঁজরে হঠাৎ সবুজ
আদুরে চোখের প্রশ্ন অবুঝ এখন...

সঞ্জয় বণিক অর্ণা শীল সপ্তর্ষি রাউথ প্রমুখ কয়েকজন গীতিরচয়িতা নতুন চেতনাকে স্পর্শ করেও গতানুগতিকের ঝুল পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। চাঁদ-তারা-ফুল বকুল-জ্যোৎস্নায় আপত্তি নেই, স্বপ্ন দেখাতেও বিরোধ নেই, প্রকাশের সামর্থ্যেই তাদের মেনে-নেওয়া চূড়ান্ত হবে। যেমন তপন সিংহের এই গানে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়:

যুগটাই বড্ড খারাপ, সব চুপচাপ, ঝড় উঠবে
হয় সব ঝরবে পাতা, নইলে আবার ফুল ফুটবে —
সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই নীল, নইলে নামা পাতালপুরী
এভাবেই নতুন করে বেঁচে ওঠার ইচ্ছে-কুঁড়ি
স্বপ্নতে, প্রতিদিন স্বপ্নতে।

বর্তমানে কয়েকটি গোষ্ঠী বাংলা গানে নতুন সুর নতুন কথায় একটা রূপান্তর আনার চেষ্টা করছেন যাদের 'ব্যান্ড' নামে পরিচিতি হয়েছে। এঁদের নানা নাম, নানা আয়োজন। গান এঁদের নাড়িতে, সবাই গুণী এঁরা, নিজেরা গাইতে-বাজাতে পারদর্শী, লিখতে-সুর করতেও পটু। তাঁদের জনপ্রিয় প্যাকেজে সুরজিৎ অভিজিৎ সৌমিত্র চন্দ্রাণী এই চার গীতিকারের নাম পেয়েছি। অবশ্য কবিতাকে এঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না, যতটা পরিবেশন-শিল্পকে দেন। তাই কবিত্ব এঁদের হাতের বাদ্যযন্ত্রের মতো পোষ-মানা নয়। তাই এঁদের গানের ভাষায় ছেলেমানুষির চড়ুইভাতি হয়, একঘেয়েমি মৌরসিপাট্টা গাড়ে। কবিতার চৈত্রসেলে এঁদের মহাফূর্তি। এঁরা যে উড়ান নামের একটি ক্যাসেট আমাদের উপহার দিয়েছেন, তাতে নাকি ভারতীয় শাস্ত্রীয়

সংগীত, র‍্যাপ, রেগে, কেলটিক, ওয়ালট্‌জ, ব্যালাড, ফোক এসবের মারমার-কাটকাট মিশেল। তাঁদের যন্ত্রানুষঙ্গে আছে বেহালা, ইংলিশ ফ্লুট, জেম্বি, বালাইকা, সাম্বা, হুইসল, ব্লুজ হার্প — অর্থাৎ মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার এলাহি আয়োজন। আর গানের বাণী নাকি fly through many fascinating situations of life which is an integral part of this colourful universe, শুনে মনে হয় বেশ উত্তেজিত হওয়ার মতো প্রতিশ্রুতি। তারই একটা উদাহরণ শোনা যাক:

মনটা আমার জুড়াইলি খেয়ে আমার নজেনরে
টকঝালমিষ্টি মশলা আমার, মাখি আদা রসেরে
সেটাই আমি বেচি বলে নতুন চ্যবনপ্রাশরে।
টাকায় দু-পিস নজেন আমার দু-টাকায় ফাইভ পিস বেচিরে
কেবল তোর জন্যে টোটাল ফ্রি তুই আমার রসকদমরে।

নতুন কালের শ্রোতারা এই আদার রসমাখা টকঝালমিষ্টি 'নজেন' নতুন চ্যবনপ্রাশ বলে কতটা গ্রহণ করবেন, আমাদের জানা নেই।

চন্দ্রবিন্দু ব্যান্ডের নামডাক হয়েছে। তাঁদের গানও শোনা গেল। তাঁদের গানের গীতিকারও সব গুণী ছেলেমেয়ে, গানে-বাজনায় সবাই সরস্বতীর বরপুত্র। তাঁদের গান-রচয়িতারাও ডাকনামে নিজেদের চেনান, সার্টিফিকেটের পুরো নামটা সুটকেসেই রেখে দেন। এঁদের গীতিকাররা হলেন অনিন্দ্য ও চন্দ্রিল, দুজনেই নতুন দিনের ভাষায় কথা বলতে শিখেছেন। সমাজমনস্কতা-জাতীয় শব্দ-টব্দ এঁদের কাছে ক্লিশে, কারণ এঁরা একুশ শতকের নাগরিক। এঁদের একটি গান এইরকম :

যা বেবি দৌড়ে যাবি শিখবি মালটিমিডিয়া
গবলু-গাবলু স্বপ্নে পেল ডাবলু-ডাবলু আইডিয়া
ই-মেলে যুক্ত হল হনলুলু হলদিয়া
দুনিয়া ডটকম দুনিয়া ডটকম দুনিয়া ডটকম নমো নমঃ।
রাতবিরেতে রাখছি পেতে ইঁদুর কল
পড়লে ধরা বাঁচবে মড়া গঙ্গাজল
অরুণপ্রাতে ফ্লপি হাতে জলদি চল্।
বাউন্ডুলে ছেলেপিলে মাউস ছুঁলে ফাস্টোক্লাস
বকলে বাবা শিখবি জাভা সুমিত্রা বা সি প্লাস প্লাস
রণে বনে ব্রেনে ড্রেনে যদি প্রাণে বাঁচতে চাস
দুনিয়া ডটকম...
আয়রে খোকা পোঁয়া পাকা মাধ্যমিকে চিৎপটাং
ছুটবে ঘোড়া ল্যাংড়া খোঁড়া কিনবি তোরা এক্সট্রা ল্যাং
গেল ভোগে কম্পু রোগে জেনারেশান চিৎপটাং
দুনিয়া ডটকম...

'আমরা গান গাই' এক হিসেবে সমাজমনস্কতারই গান। এ-গানের তরুণ গীতিকার নীলাঞ্জন নন্দী অনেকটা কৃত্রিম বুদ্ধি দিয়ে ধরে নিয়েছেন যে, আগের যুগের গানমাত্রই সস্তা রোমান্টিকতা, হালকা ন্যাকামোর চড়ারং-পোস্টার। সে-গানের সীমাবদ্ধতা কোথায়, তা ভালো করে তাঁরও

জানা নেই। না বুঝেই ঘোষণা করেছেন :

আমরা গান গাই গান গাওয়ারই আনন্দে
মেতে গিয়ে সুরছন্দে নেই যে লাভ কোনো দ্বন্দ্বে
জীবনেরই খানাখন্দে ভালোবাসার হাত বাড়াই।
আনবই আনবই নতুন সুরে গাওয়া গান
থাক না থাক না পড়ে চাঁদ ফুল ন্যাকা অভিমান
ধোঁয়া ধুলো আর কংক্রিটে ভরা এ-শহরে
আমরাই কেন ঝরে যাব অনাদরে
তর্কবিতর্ক নিন্দে ভুলে গিয়ে
শুধুই আনন্দে ভালোবাসার হাত বাড়াই।

কথায় নতুনত্ব আনতে এবং আজকের ভোকাবুলারি ব্যবহার করতে গিয়ে এই নীলাঞ্জন নন্দী ভালোবাসার সঙ্গে একটা অঙ্ক মেলাতে চেয়েছেন তাঁর অন্য এক গানে:

বাবুমশাই তোমারে জানাই
এখন ভালোবাসা করতে হলে অঙ্ক শেখা চাই
এখন ভালোবাসায় মনের দেওয়া-নেওয়া চলে না
সে কাঁটা বিঁধে গেলে জীবনেরই অঙ্ক মেলে না
সত্যি করে কাউকে ভালোবাসলে চলে না
বাবুমশাই তোমারে জানাই
যোগবিয়োগ গুণভাগ হিসেব করে দেখো
ভালোবাসা পেতে হলে খরচ হবে কত
রাজনীতি প্রেমলীলা কিংবা চাকুরি
অঙ্কই মহাগুরু অঙ্কই হার
অঙ্কতে কাঁচা হলে জিতবে না ভাই।

'অঙ্কতে কাঁচা হলে জিতবে না ভাই' অতি সত্যি কথা। কিন্তু গানের কবিত্বে কাঁচা হলে গানেও যে জেতা যায় না, এই সত্যটা অনেকেই বোঝেন না। সমস্যাটা সমাজমনস্কতার নয়, কবিত্বমনস্কতারও বটে। যেমন এই অঙ্ক নিয়েই সৈকত কুণ্ডুর একটি বুদ্ধিমান গান রয়েছে, যার উল্লেখ আগেও অন্যত্র বর্তমান আলোচক করেছেন :

দিগন্ত হোক সরলরেখা গাছগুলোকে লম্ব ধরো
ওই দেখো চাঁদ পূর্ণ গোলক অঙ্ক শেখো অঙ্ক করো
ওই সমতল মাটির উপর ত্রিভুজ পাহাড় উঠল জেগে
নানান বাঁকের হাতছানিতে বক্ররেখায় ছুটবে নদী
আর দেখো নীল মস্ত আকাশ মাথায় অর্ধবৃত্তাকারে
ভালো ছেলে বলব তাকেই যে সারাদিন অঙ্ক করে।

এ-গানে সমাজবিপ্লব বা শ্রেণিসংগ্রামের কথা নেই বলেই সমাজ-উদাসীন ছিন্নমূল রোমান্টিক কল্পনা-বিলাসের দলে ফেলে দেব কি এই গানকে? এ-অঙ্ক কি আমাদের জীবনের কঠোর

সত্য নয়? ওই সরলরেখা লম্ব বৃত্ত অর্ধবৃত্তের শিক্ষা তো সমাজের জ্যামিতি থেকেই পাওয়া যায়।

শেষ করি সমাজমনস্কতার কাছে ঊর্ধ্ববাহু এবং কবিতার কাছে নতজানু একটি গান দিয়ে, একালের তরুণ কবি-গীতিকার এবং গায়ক-সুরকার কাজী কামাল নাসেরের রচনা :

সীমান্তে থাকুক না কাঁটাতার
দিনান্তে ঘনালে অন্ধকার
সীমানা পেরিয়ে ভালোবাসা নিয়ে
জেনো চলছে চলবে এই চোরাকারবার...
ও-পারের আজান এবং এ-পারের শাঁখের সুরে
মিলনের বাদ্যি বাজে হৃদয়ের অন্তঃপুরে
দু-পারেই রবীন্দ্রনাথ আগুনের পরশমণি
আকাশেও জাগিয়ে রাখেন হৃদয়ে প্রেমের খনি
সে-প্রেমেই ঘুচবে জেনো দূরত্ব সব বাধার।

বিগত ১৯ মার্চ ২০০২ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত অকাদেমির প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণ 'সমাজমনস্কতার নিরিখে একালের বাংলা গান' অবলম্বনে।

বিভাব

আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে বিভাব *বিশেষ জীবনানন্দ সংখ্যা* এখনো পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরনো সংখ্যা।

'বিভাব' প্রকাশিত যে বইগুলি পাওয়া যাচ্ছে

১. উত্তরা (চিত্রনাট্য)

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

২. The Musicians of India

by Harendra Kishore Roy Chowdhury

আগামী *কলকাতা বইমেলায়* বিভাব-এর কিছু পুরনো সংখ্যা অবিশ্বাস্য কম দামে পাওয়া যাবে। পাঠক লক্ষ রাখুন।

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

RN 30017/76

Declaration U/S of the Press & Registration of Book Act.

১। প্রকাশের স্থান : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

২। প্রকাশের কালানুক্রম : ত্রৈমাসিক

৩। প্রধান সম্পাদকের নাম : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদকের নাম : রাহুল সেন
জাতীয়তা : ভারতীয়। ঠিকানা : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

৪। প্রকাশকের নাম : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
জাতীয়তা : ভারতীয়। ঠিকানা : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

৫। একমাত্র স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা :
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। ৫০৮/এ যোধপুর পার্ক। কলি-৬৮

আমি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বা) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বাংলা শিশুসাহিত্যের অপরূপকথা

পিনাকী ভাদুড়ী

এক যে ছিল

শিশুসাহিত্যের ভোক্তা কি কেবল শিশুরাই হয়? সেই শিশু কারা? যে-বয়স পর্যন্ত কোনো বাচ্চার ট্রামে বাসে ট্রেনে টিকিট লাগে না, সেই বয়সিরাই কি শিশু পদবাচ্য? প্রকৃতপক্ষে শিশুসাহিত্য এমন একটা বিভাগ যার নিজস্ব ধরনটাই বড়ো কথা নয়, এটা নির্ভর করে এর পাঠক বা রসগ্রাহী যারা আছে তাদের উপরে। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা শিশুসাহিত্য পড়ে আনন্দ পান, কিন্তু তাঁরা আর কেউ শিশু নন। আবার *রবিনসন ক্রুশো, গালিভারস ট্রাভেলস* এগুলি শিশুদের জন্যই লেখা হয়নি, কিন্তু ছোটোরাও এগুলি পড়তে ভালোবাসে।

ছোটোরা যে গল্প, ছড়া, কবিতা শুনতে বা পড়তে ভালোবাসে, সাধারণভাবে সেই শিশু-মনোরঞ্জক রচনাই শিশুসাহিত্য। রূপকথা ও ছড়ার সাহায্যে বাঙালি শিশু চিরকাল আনন্দ পেয়েছে, হয়তো শিক্ষাও পেয়েছে। রূপকথা প্রায়শই শুরু হয়েছে, 'এক যে ছিল রাজা', এই বাক্যটি দিয়ে। রূপকথাই শিশুর সেই অপরূপ জগৎ যেখানে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সব বিপদ যেখানে কেটে যায়, সব আপদ দূর হয় এবং সবশেষে রাজার পুত্র রাজার কন্যা সুখে বসবাস করে। এরই মধ্যে শিশু দূরদেশ, দূরকাল এবং দুর্লভ জীবন লাভ করে নেয়।

পৃথিবীতে বহু আদিম প্রাণী লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি। কিন্তু মানবশিশু এখনও সেই প্রথম দিনের মতোই প্রাচীন এবং প্রথম দিনের মতোই নবীন। সে একই রকম সজীব হয়েই জন্মায়। প্রতিবারই প্রতিটি শিশু একইরকমভাবে হাসে কাঁদে আনন্দ পায় ও বিস্মিত হয়। সে নতুন, সে সুকুমার, সে মধুর, হয়তো-বা কিঞ্চিৎ মূঢ়ও বটে। যা-ই হোক না কেন, তাকে পেয়ে খুশি না হয়ে উপায় থাকে না। সবার তাকে ভালো লাগে, তারও ভালো লাগে সবাইকে।

মানুষের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ডারউইন বিবর্তনের যে-কাহিনি রচনা করেছিলেন, শুধু মানুষেরই পরিবর্তন তাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। প্রথম যুগের আর এ-যুগের মানুষের মধ্যে পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য — যে-নামই দেওয়া যাক না কেন — তার পরিমাণ বিপুল। আজকের মানুষ সেই প্রথম মানুষের আত্মীয় বলে না-ও স্বীকার করতে পারে, কারণ দু-জনের মধ্যে মিল যতটা, অমিল ততটাই শুধু নয়, অনেক বেশি।

অথচ আজকের শিশু আর সেই প্রথম শিশু — তারা বিভিন্ন সময়ে জন্মেছে বটে এবং সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ পরিজন পরিসর পেয়েছে এও সত্য — তথাপি তারা ভাবেভঙ্গিতে আচার-আচরণে একইভাবে আমাদের উদ্দীপ্ত করে।

রূপকথার ধরনে গল্প বলা শিশুরা প্রথম থেকেই পছন্দ করেছে। ইংরেজিতে *গ্রিমস্ ফেয়ারি টেলস* বেরিয়েছে ১৮১২ সালে। অ্যালিসের কাহিনীদ্বয় এসেছে ১৮৬৫ এবং ১৮৭২ সালে। আজও এসব গল্প ছোটোদের ভালো লাগে। ১৮৩০ সালের *অলিভার টুইস্ট* সরাসরি শিশুসাহিত্য নয়, নয় *ডেভিড কপারফিল্ড*-ও। অবশ্য এতে অল্পবয়সি ছেলেরাই নায়ক, যদিও এদের দুঃখদুর্দশাই এসব উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত কিপলিংয়ের *জাঙ্গল*

বুক এখনও ছোটোদের ভালো লাগে কারণ এতে বনজঙ্গল, জন্তুজানোয়ার একটি মানবকের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আছে।

শিশুসাহিত্য মূলত শিশুদের আনন্দ দেবে, এটাই এ-সাহিত্যের গোড়ার কথা। কেউ কেউ এদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন, সেটাতে কাজের কাজ কিছু হয় বলে মনে করার হেতু নেই, কারণ শিশুরা সুনীতি-দুর্নীতির বাইরে বাস করে। যদি আমরা আদ্যিকালের প্রচলিত ছড়াগুলোর কথা মন দিয়ে শুনি তা হলে মনে পড়বে শৈশবের কথা, যে-শৈশব শুধু আমাদের স্মৃতি নয়, আমাদের সম্পদ। বড়ো হয়ে যদি প্রচুর ধন ও ক্ষমতার অধিকারী হই, তবু সেই শৈশবের চেয়ে তারা বড়ো নয়। সেই শৈশবে যে-আনন্দ ছিল, অনেক সময়েই তা বিস্ময়ের আনন্দ। জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুরা চিরকাল মেলা বসিয়েছে, তারা মুক্তো খুঁজতে জাল ফেলেনি, কেবল পারাবারের বিস্ময়ের পাশে খেলতে বসেছে। সেই খেলা নিয়েই শিশুসাহিত্য গড়ে উঠেছে। 'এক যে ছিল রাজা' দিয়ে যে সাহিত্যের শুরু তার ইতিহাস ভালো করে লক্ষ করলে রূপকথার 'ময়ূরপঙ্খি' ভেসে বেড়াচ্ছে এমনটি দেখা যাবে। চোখে পড়বে সাতমহলা বাড়ি।

সাতমহলা বাড়ি

ছোটোদের জন্য যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো প্রায়ই তাদের জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করেছে। আমরা একটু দ্রুত প্রথমযুগের কয়েকটি পত্রিকার খবর নেওয়ার চেষ্টা করব।

১৮২২ সালে স্কুলবুক সোসাইটি থেকে বেরিয়েছে 'পশ্বাবলী', প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এতে বিতরণ করা হত। ১৮৩১-এ কৃষ্ণধন মিত্রের সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'জ্ঞানোদয়', এতে থাকত নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল-বিষয়ক তথ্য। রেভারেন্ড লং, কাউয়েল, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাধাকান্ত দেব, এঁদের চেষ্টায় ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি বা 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় এখান থেকে বেরিয়েছে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। সাধারণের জন্য হলেও, এতে শিশুপত্রিকার সূত্রপাত। পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন এবং বড়ো হয়ে আক্ষেপ করে বলেছেন, 'এ-ধরনের পত্রিকা একটিও নাই কেন'। এতে বহু ইংরেজি রচনার অনুবাদ বেরিয়েছে।

এছাড়া আরও কয়েকটি পত্রিকার নাম করা যেতে পারে — 'সত্যপ্রদীপ'(১৮৬০), 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৬৩), 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৬), 'বালক বন্ধু' (১৮৮১)। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকাটির কথা রবীন্দ্রনাথও লিখে গিয়েছেন। 'বালকহিতৈষী', 'আর্যকাহিনী' পত্রিকার নামও পাওয়া যায়। ১৮৮৩ সালে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় বেরোল 'সখা', ১৮৯৩-তে বেরোল 'সাথী', ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায়। ১৮৯৪-তে এই দুটি পত্রিকা একত্র হয়ে যায় এবং 'সখা ও সাথী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনাও এই পত্রিকায় ছাপা হত। এছাড়া বেরিয়েছে 'বালিকা', 'বাল্যবন্ধু', 'সুনীতি'। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রধানত ঠাকুরবাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য প্রকাশ করতেন 'বালক'(১৮৮৫)। এখানে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু লিখেছেন। তার সবগুলোকে পুরোপুরি শিশুসাহিত্য বলতে দ্বিধা হতে পারে, হয়তো সেগুলো কিশোরসাহিত্য। তাঁর 'মুকুট' নাটক এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর 'রাজর্ষি' গল্পটার শুরু হয় একটি শিশুর ব্যাকুল প্রশ্ন দিয়ে ('এত রক্ত কেন'), তবু এই গল্পটা ছোটোদের নয়। তবে

একথা মনে রাখতে হবে একটি শিশুর বিষণ্ণ বিস্ময় নিয়েই কাহিনীটা আরম্ভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'মুকুল' পত্রিকা বেরিয়েছিল ১৮৯৫-তে। প্রথম পর্যায় বন্ধ হয়ে যায় ১৯১৪-এ। তার পরে আবার বেরোল ১৯২৮-এ। বলাই থাকত যে এ-পত্রিকাটি ৮/৯ থেকে ১৬/১৭ পর্যন্ত বয়সিদের জন্য। অর্থাৎ এও ঠিক শিশুদের জন্য নয়, যদিও শৈশবস্মৃতি এখানে প্রকাশিত রচনায় থাকা বিচিত্র ছিল না। এখানে জগদীশচন্দ্র বসু 'গাছের কথা' লিখেছেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন 'আবু করিমের চটিজুতা'। আট বছরের বালক সুকুমার রায়চৌধুরী এতে কবিতা লিখেছেন — ইনিই পরে সুকুমার রায় হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে শিশুসাহিত্যের সাতমহলা বাড়িটি গড়ে উঠেছে।

১৮১৮-তে স্কুলবুক সোসাইটি *নীতিকথা* নামে ছোটোদের বই প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৩৮-এ বেরিয়েছিল *জ্ঞানচন্দ্রিকা*। স্বর্ণকুমারী দেবীর *গল্পস্বল্প*(১৮৯২) পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবু তাঁর রচনায় ঘরোয়া হাওয়া বয়ে গিয়েছে।

বিদ্যাসাগরের *কথামালা, জীবনচরিত* বা *আখ্যানমঞ্জরী, বেতালপঞ্চবিংশতি*, শিশুসাহিত্যের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করেছিল। তাঁর *বর্ণপরিচয়* যদিও অক্ষর চেনাবার জন্যই লেখা হয়েছিল, কিন্তু এতে ছোটো ছোটো গল্পও আছে — তাদের মধ্যে শিশু মনস্তত্ত্ব এবং ভাষাশিক্ষার গোড়াটুকু চমৎকার পাওয়া যায়।

১৮৬৪-তে বেরিয়েছিল একটি বিজ্ঞানগ্রন্থ *বালবোধ*, লিখেছিলেন প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়। কাঙাল হরিনাথ ১৮৫৯-এ প্রথম মৌলিক শিশু উপন্যাস লিখেছিলেন, *বিজয় বসন্ত*। ভূমিকায় বলেছিলেন, 'বালকেরা অধ্যয়ন করিয়া ক্লান্ত হয় — এজন্য রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে'। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের *জীবন আদর্শ* গ্রন্থটিকে যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'গৃহপাঠ্য ও পুরস্কারযোগ্য' বলেছিলেন। ১৮৮১ সালে রাজকৃষ্ণ রায় লিখেছিলেন *শিশুকবিতা*, একটু উদাহরণ দিই:

... খাঁকড়া, বাঁখারি শরে কলম কাটিয়ে
বাঙুলা আঁখর লেখো বড় টান দিয়ে।...
ইংরিজি আঁখর লেখা শিখিবে যখন
হাঁসের পালক পেনে লিখিবে তখন।

যদিও এটি নীতিমূলক, তবু সুখপাঠ্য।

ময়ূরপঙ্খি

সাতমহলা বাড়ি গড়ে উঠেছে, এবারে সেই সাহিত্য ভেসে পড়েছে ময়ূরপঙ্খি নৌকোয়। ভরে উঠেছে নৌকোর মণিমাণিক্যখচিত কামরা, সেখানে বসে করছেন স্বর্ণপ্রসূ সাহিত্যিকেরা। এ নৌকোর জন্য তীরে তীরে প্রতীক্ষায় রয়েছে শুধু শিশুরাই নয়, অনেক প্রাপ্তমনস্ক মানুষও। কাল প্রসন্ন, সুপবন বয়ে যাচ্ছে।

ছোটোদের জন্য অনেকদিন ধরেই পত্রিকা ও গ্রন্থপ্রকাশ চলছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি। এও দেখতে পাচ্ছি যে এগুলির অধিকাংশ, জ্ঞানগর্ভ নীতিকথায় পরিপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক এক

জিনিস, আর পাঠস্পৃহা জাগিয়ে তোলার মতো আনন্দদায়ক পুস্তক আর এক জিনিস। ওই যুগের শুরু করেছিলেন বোধ হয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ১৮৯১ সালে বেরিয়েছিল তাঁর সংকলন গ্রন্থ *হাসি ও খেলা*। এতে উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের রচনা আছে। এ-বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তা' স্কুলে পড়িবার বই, তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে যে পরিমাণ উৎপীড়ন হয়, সে পরিমাণ উপকার হয় না'। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছোটোদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই গ্রন্থপ্রকাশের আয়োজন করতেন। ১৮৯৩ সালে যখন ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায় 'সাথী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তখন তার প্রথম সংখ্যায় গ্রাহক হওয়ার জন্য আহ্বান করে যোগীন্দ্রনাথ যে-কবিতাটি লিখেছিলেন সেটি এইরকম :

কোথায় আছ ভাইটি আমার কোথায় আছ বোন
আয় ছুটে আয় শোনরে এসে সাথী'র আবাহন।
উপদেষ্টা নয় যে রে ভাই, হাতে নাইকো ছড়ি,
নাইকো তাহার উচ্চ ধমক দস্তের কড়মড়ি।

এতদিন সব পত্রিকাই বলত তারা সুশিক্ষা দেবে আনন্দের আবরণে। 'সাথী'ই প্রথম স্বীকার করল যে আনন্দই তার বিষয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা লোকসাহিত্য থেকে বেছে নিয়ে তৈরি করেছেন 'খুকুমণির ছড়া'। এর আগে এইরকম সংকলন বেরোয়নি। এই ১৮৯১-তেই নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখলেন *শিশুরঞ্জন রামায়ণ*। ১৮৯৬-তে বেরোল অবনীন্দ্রনাথের *ক্ষীরের পুতুল*। তখন তিনি *বাল্যগ্রন্থাবলী লিখতে* শুরু করে দিয়েছেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখেছিলেন *টাক ডুমাডুম, সাত ভাই চম্পা*; এদের সংলাপ ও ভাষা ছিল শিশুদের উপযোগী।

১৮৯৭-তে যোগীন্দ্রনাথ সরকার লিখলেন *হাসিখুশি*, এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ অক্ষর পরিচয়ের নান্দীপাঠ তখনও ছিল না। বিদ্যাসাগর তাঁর *বর্ণপরিচয়*-এ ছোটোদের বাংলা অক্ষর চিনিয়েছেন, সেই সঙ্গে নানা গল্প বলে শিক্ষাকে মনোরঞ্জনের পোশাক পরিয়েছিলেন। তবে মাতৃভাষার আনন্দছবি যোগীন্দ্রনাথ সরকারই প্রস্তুত করে দিলেন। সেই 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে/আমটি আমি খাব পেড়ে', এই ছড়া দিয়েই কত শিশু জীবন শুরু করেছে। বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন তিনি কিছু না ভেবেচিন্তেই লিখতে বসেছিলেন, আপনাআপনি গড়ে উঠেছে এই বই। শিশুর মন তিনি বুঝতেন, নাকি নিজেই শিশু হয়ে যেতেন কে বলবে — রুচি ছিল পরিশীলিত, রচনাশক্তি ছিল পরিপূর্ণ। এমন লেখা কোনো শিশু যদি লিখত, তবে সেইটিই যথার্থ হত, কিন্তু যেহেতু তা হওয়ার নয়, তাই যোগীন্দ্রনাথই সেই কাজটি করলেন ছোটোদের মতো করে আটপৌরে ভঙ্গিতে। যা লিখলেন তা শুধু লেখাই হয়ে রইল না, সেই সঙ্গে ছবিও হল এবং গল্পও হয়ে উঠল।

ধোপা কেমন কাপড় কাচে
নাপিত ভায়া দাড়ি চাঁচে

অথবা, কিংবা এবং,

টিয়াপাখির ঠোঁটটি লাল
ঠাকুরদাদার শুকনো গাল

কেমন অব্যর্থ ছবি হয়ে উঠছে শিশুর সামনে, পরিচিত পরম্পরা যেন। এমনকী, 'ঔষধ খেতে মিছে বলা'-র বিষাদও বেমানান হয় না, শুধু তার ছন্দ এবং সহজ সরলতার জন্য। এই বইতে সংখ্যা শেখাবার জন্য যে-কাহিনীটি তিনি বুনেছেন ('হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়') , সেখানে 'একটি কোথায় হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়' থেকে শুরু করে একটার পর একটা ঘটনার বুনুনিতে 'মনের দুঃখে বনে গেল রইল না আর কেউ'তে শূন্যে এসে দাঁড়াল গল্পটা, সংখ্যার এই উলটো চালটাই, পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'কাজের ছেলে' কবিতাটির মজা কবিতাটি বেরোনো মাত্রই বাঙালি ছেলেমেয়েকে এমন স্পর্শ করেছিল যে তারা বড়ো হয়েও সেই মজাকে ভুলতে পারেনি; কারণ ওইরকমটি আর হয়নি। 'দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল' — এইরকম একটি তালিকা নিয়ে বাজারে যাওয়ার পথেই ক্রমশ সেটি — কীভাবে 'দাদখানি বেল, মুসুরির তেল' হয়ে যায় এ রহস্যসংবাদ যোগীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন।

১৯১২-তে বরদাকান্ত মজুমদারের সম্পাদনায় 'শিশু' পত্রিকা বেরিয়েছিল। এই পত্রিকার নাকি দশ হাজার গ্রাহক ছিল। পত্রিকাটি ছিল সরল, সরস তবে এতে অলৌকিকতাকে বিশ্বাস্য করে পরিবেশনের চেষ্টা ছিল। 'সন্দেশ' পত্রিকা বেরিয়েছিল ১৯১৩ সালে, এতে থাকত বিজ্ঞান রসসাহিত্য চিত্রশিল্প। এর সম্পাদক ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ১৯২১-এ এর ভার নেন সুকুমার রায়, ১৯২২-এ ছিলেন সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়, তার পর ১৯২২ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত একা সুবিনয় রায়। এই রায়চৌধুরী পরিবারের কাছে বাঙালি শিশুরা ঋণী। উপেন্দ্রকিশোরের *টুনটুনির বই* একটি আশ্চর্য গ্রন্থ। এর গল্প শুনিয়ে যে-কোনো শিশুকে রাতে খাওয়ার সময়ে জাগিয়ে রাখা যায়। বাঘকে ঠকানো, রাজাকে ঠকানো, ভালুককে ঠকানো — কিন্তু কোনো ঠকানোই তঞ্চকতা নয়, নির্ভেজাল মজা। আবার, এই উপেন্দ্রকিশোরই *ছেলেদের রামায়ণ* শুরু করলেন এইভাবে :

রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া
সে বড় সুন্দর কথা, শুন মন দিয়া।

কী চমৎকার কথকতা, ছোটোদের ভালো না লেগে উপায় নেই। এই পরিবারের কুলদারঞ্জন পুরাণের গল্প আর রবিন হুডের গল্প পাশাপাশি লিখলেন; সুখলতা রাও লিখলেন *গল্পের বই, আরো গল্প*। এ-দুটি বই *টুনটুনির বই*-এর কাছাকাছি, যে শিশুরা পড়তে শিখেছে বা শিখছে একেবারে তাদেরই লক্ষ করে লেখা। 'সন্দেশ' পত্রিকা তখন এইসব লেখায় সাজানো থাকছে; সহজ ভঙ্গিতে স্বচ্ছ প্রবাহে এবং স্বাভাবিক লাবণ্যে রচনাগুলো ছোটোদের হৃদয়ে চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ছোটরাই যেন লিখছে বা বলছে এসব।

সুকুমার রায়ের সেই স্কুলের ছেলেদের মজার মজার গল্প — পাগলা দাশুর অবিস্মরণীয় উক্তি, 'আমি তখন পটকায়, আগুন দিচ্ছিলাম' — *খাইখাই* আর *অবাক জলপান* রচনাদুটিতে 'খাওয়া' এবং 'জল' —এই দুটি শব্দের কত রকমফের ব্যবহার হতে পারে, এসব যারা পড়ছে তারা এগুলো আবৃত্তি বা অভিনয় না করে পারেনি — তাদের মা-বাবারাও সেই স্মৃতিকে আনন্দের সঙ্গে ধরে রেখেছেন।

আবোল তাবোল আর *হ-য-ব-র-ল* যদি এমন কোনো শিশুকে পড়ে শোনানো যায় যার অক্ষর পরিচয় তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, বা সবে শুরু হচ্ছে, সে-ও এ-দুটির মজা তৎক্ষণাৎ

উপভোগ করেছে এমন উদাহরণ ভূরিভূরি পাওয়া যাবে। সুকুমার রায় বেশিদিন বাঁচেননি, কিন্তু চিরকাল বেঁচে থাকছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ যেমন অদ্বিতীয়, সুকুমার রায় তেমনই দ্বিতীয়রহিত। তিনি না এলে শিশুসাহিত্য বাংলায় যা হয়েছে তা হত না।

সুখলতা রাও প্রধানত অনুবাদই করেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে বিদেশি রূপকথা দেশীয় চেহারা পেয়েছে, বাঙালি শিশুরা এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাক। এইসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের নাম করতেই হয়, যাঁর *ঠাকুরমার ঝুলি* এবং *দাদামশায়ের থলে*। এছাড়াও রূপকথার রাশি রাশি উপহার যা কখনও পুরোনো হল না। এছাড়া তাঁর *চারু ও হারু* ছোটোদের সামনে ভালো-মন্দের দুটো চেহারা দেখায়, কিন্তু উপদেশ দেয় না, শুধু গল্প বলে। ছোটোরা উপদেশ চায় না, গল্প শুনেই তারা মনে মনে একটা কিছু খাড়া করে নিতে পারে।

সুকুমার রায়ের সমসাময়িক ছিলেন সুনির্মল বসু। কিন্তু তিনি একেবারেই অন্যরকম হয়েছিলেন। সুকুমার রায় যেখানে *খাইখাই* আর *অবাক জলপান* লিখে শুধু মজাই করেছেন তাই নয়, 'খাওয়া' এবং 'জল' এই দুটি শব্দের কত রকমফের হতে পারে, তাই দেখিয়ে বিস্মিত করে দিচ্ছেন আমাদের, সুনির্মল বসু ওসব কিছুই করছেন না — শুধু *ছন্দের টুংটাং* বাজিয়ে দিয়ে গেলেন। 'চাং-লাং-সু' কবিতায় অনুস্বার(ং)-কে নিয়েই বাজনা বাজালেন, কবিতাটি যে-ছোটোরা পড়েছে, তারা বড়ো হয়েও ভোলেনি।

সুকুমার রায়ের কাছাকাছি যান লীলা মজুমদার। ছেলেদের দুষ্টুমির সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দেন সহজাত কল্পনা, তাঁকে মনে হয় অভিজ্ঞতর, অনেক সচেতন। সুকুমার রায় তাঁর কাজিন, 'জিন' ঘটিত মিল তাঁদের মধ্যে থাকতেই পারে, তাই দুষ্টু ছেলে দু-জনের লেখাতেই আছে, কিন্তু তারা একরকম দুষ্টু নয়। আরও আশ্চর্য তাঁর গল্পে কমবয়সি মেয়ে নেই, অথচ তাতে খামতি ঘটে না, এমনই অনায়াস তাঁর বাচনভঙ্গি।

অন্নদাশঙ্কর রায় স্পষ্টত ছড়া লিখেছেন, যেগুলি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক। ছোটোদের কথা খুব সহজে বলতে পারেন তিনি। 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে', এটি সকলেরই জানা, এখানে তুলনায় একটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কবিতার কথা বলা যেতে পারে যেটি যে-কোনো শিশু শুনলেই পুলকিত হয়ে থাকে — একটি আপাত সাধারণ ঘটনা কেমন অসাধারণ হয়ে উঠেছে:

এক যে ছিল পার্বতী —
পার্বতী না ফার্বতী
ফার্বতী না মার্বতী,
তার যে আছে বেড়ালটা —
বেড়ালটা না ফেড়ালটা
ফেড়ালটা না মেড়ালটা,
বেড়ালটাকে ধরতে যাই
একটু আদর করতে চাই,
ওমা, তখন পার্বতী —
পার্বতী না ফার্বতী,
ফার্বতী না মার্বতী,

কেড়ে নিল বেড়ালটা
বেড়ালটা না ফেড়ালটা
ফেড়ালটা না মেড়ালটা।
ওদের বাড়ি যাইনে
অমন বেড়াল চাইনে,
পার্বতী ভাই পার্বতী
দিবি রে তোর বেড়ালটা?

শিশুর কাছে ওই বেড়ালটি একটি অসাধারণ আকর্ষণ। ছড়াটির ছত্রে ছত্রে তা পরিষ্কার। নাটকীয়ভাবে পড়া দরকার এটি। এটিও শুরু হয় 'এক যে ছিল' দিয়ে।

'সন্দেশ' একসময় বন্ধ হয়ে গেল। যে-কোনো ভালো জিনিসই তাই হয়ে থাকে। পরে সেটি আবার বেরিয়েছিল কিন্তু সেইরকম আর হয়নি। তার পর অনেক বছর পরে সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ'-এর পুনরুজ্জীবন ঘটালেন এবং সেটি ভালো পত্রিকাই হল — তবে সেটি অন্য পত্রিকা হয়ে গেল। মূল 'সন্দেশ'-এর সারল্য, কৌতুক এবং একান্ত শিশু-উপযোগী খাদ্যপ্রাণ এতে নেই। অবশ্য থাকবার কথাও নয়। উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার রায় থেকে শুধু সত্যজিৎ রায়ই আলাদা নন, তখনকার ছোটোদের থেকে এখনকার ছোটোরাও আলাদা হয়ে গিয়েছে।

তবে 'সন্দেশ' প্রথম যুগে বন্ধ হওয়ার সমসময়ে ১৯২০ সালে সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় বেরোল 'মৌচাক' — এটি শিশুসাহিত্যে নতুন যুগ আনল। কারণ ছোটোরা ক্রমশ বয়স্ক হচ্ছে, তার মানে হল নতুন শিশুরা আর শুধু রূপকথায় ভুলছে না, তাদের জন্য আরও পরিণত মালমশলা চাই। রবীন্দ্রলাল রায়ের 'দিনের খোকা, রাতে' গল্পেই টের পাওয়া গেছে শিশু কীভাবে তার চাহিদা বাড়াতে বাড়াতে বাবাকে পাগলা করে দেয়, সাধারণ গালগল্পে সে আর ভুলছে না। 'মৌচাক'-এর পাতায় আরও বড়ো বড়ো জিনিস লেখা হতে থাকল। 'রামধনু' বেরিয়েছিল ১৯২৭-এ, প্রথমে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আরও পরে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এটিতে চমৎকার ডিটেকটিভ গল্প, বৈজ্ঞানিক কাহিনী বের হত।

১৯২২-এ আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় বেরোল 'শিশুসাথী'। এই পত্রিকাটি সর্বপ্রথম পূজাবার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করে। তার পরে ওই রীতি অনেকেই আজও অনুসরণ করেন কিন্তু যে-কোনো প্রথমের মতোই এর আবেদন আজও অটুট। এই পত্রিকায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র (*ভোম্বল সর্দার*), স্বপনবুড়ো বা অখিল নিয়োগী (বেপরোয়া) লিখেছেন। শিশুসাহিত্যের একটি কোষগ্রন্থ লিখেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১১টি খণ্ডে, রবীন্দ্র-আশীর্বাদে গ্রন্থটি ধন্য হয়েছিল। 'মাসপয়লা' বেরিয়েছিল ১৯২৯ সাল থেকে, ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য এবং অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায়। 'জীবজন্তু' নিয়ে সরল ভাষায় যথার্থ বৈজ্ঞানিক বই লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ১৯০০ সালেই। বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে *পোকামাকড়ের* কথা লিখেছেন জগদানন্দ রায় ১৯২৪ সালে।

এর পরে এইরকম বই বারেবারেই লেখা হচ্ছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এবং দেবীদাস মজুমদারের সম্পাদনায় নানা বিজ্ঞান বই লেখা হয়েছে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। *যমের সঙ্গে যুদ্ধ, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল, শোনো বলি মনের কথা*, ইত্যাদি নাম শুনলেই

আকর্ষণ বোধ হয়। যখন লালবিহারী দে বাংলার লোকসাহিত্য লিখেছিলেন তখন থেকে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। দক্ষিণারঞ্জনের *ঠাকুমার ঝুলি* পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে লেখক 'রূপকথার ভাষা, রীতি, প্রাচীন সরলতাটুকু' অবিকল রক্ষা করেছেন, সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন তাঁর 'সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য'।

বাংলায় একসময়ে গোপাল ভাঁড় এবং নীলুখুড়ো মধুখুড়োর মজাদার গল্প খুব প্রচলিত ছিল এবং এখনও এগুলো শোনা যায়। কালের নিয়মে তাদের নাম হয়তো বা কেউ কেউ জানেন, সেই গল্পগুলোও অল্পবিস্তর পড়ে কেউ কেউ, কিন্তু ক্রমশ এদের জায়গা কমে যাচ্ছে হয়তো। উপকথার ছাঁদে এখন আধুনিক বিষয় নিয়ে লেখা হচ্ছে, যেমন ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল গিরীন্দ্রশেখর বসুর *লালকালো*, লাল ও কালো পিঁপড়েদের কাহিনী।

তেপান্তরের মাঠ

এত সব উদাহরণের মধ্যে লক্ষ করবার মতো ব্যাপার হল যে, ছোটোদের জন্য লেখাগুলোর মধ্যে ছেলেদেরই প্রাধান্য, তুলনায় মেয়েরা পিছিয়ে আছে। তারা পিছনে থাকে, ভিতরে থাকে, আড়ালে থাকে। তারা সব সয়, তাতেই তাদের ক্ষয় এবং তাতেই তাদের জয়। তবু এরই মধ্যে মেয়েদের স্বীকৃতি ছোটোদের ভুবনেও এসে হাজির হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' কবিতায় একটি ছোটো ছেলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাজার বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলে ধরে, 'কে দিল সেই সাজা/জান কে ছিল সেই রাজা?'। বোঝাই যাচ্ছে 'রাজা' এখানে 'সাজা'র মিল হয়ে কেবল আসেনি, এসেছে সমার্থক হয়ে। বিপরীত পক্ষে রানি অনেক মমতাময়ী — 'কে ছিল সেই রানী/আমি জানি জানি জানি।' সেই রানি যে সাজাকে লঘু করে দিতে চায়, ভাগ করে নে. সাজার দুর্ভোগ, তাকে তো শিশুটি ভালোবেসেই জেনে রাখবে। এই 'জানি জানি জানি'তেই রানির উত্তরাধিকারকে শিশুটি অধিকার করে নেয়।

এই যে রানির স্বভাবটি এমন কোমল, রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের মধ্যে সেই কমনীয়তাই দেখেছিলেন। তাই দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের *ঠাকুমার ঝুলি* প্রসঙ্গে রূপকথার উৎস হিসেবে 'সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহ' আছে, এমনই বলেছিলেন। এই 'রসের প্রবাহ' লুপ্ত হয়ে গেলে, প্রথমে শিশুরা, এবং বড়ো হয়ে সব মানুষের 'মন কঠিন, স্বার্থপর এবং বিকৃত' হয়ে পড়বে।

বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*-এ আছে গোপাল-রাখালের গল্প। গোপাল ভালো ছেলে, রাখাল দুষ্টু ছেলে। গোপালের কথা বড়ো গলা করে বলা হয় ঠিকই, তবে রাখালের কাণ্ডকারখানাও ছোটোদের আকর্ষণ করে থাকতে পারে। দক্ষিণারঞ্জনের 'চারু ও হারু' গল্পেও এইরকমই। চারু জমিদারের ছেলে এবং খারাপ ছেলে, হারু গরিবের ছেলে এবং ভালো ছেলে। এই ধরনের গল্প অনেক লেখা হয়েছে, সমাজবাদীরা এর মধ্যে শ্রেণিচেতনা বা শ্রেণিসংগ্রাম আবিষ্কার করতে পারেন। তবে এসবের মধ্যে ওই দুষ্টু ছেলেদের (বদমায়েশ নয়) হয়েও লেখা হচ্ছিল। 'পাগলা দাশু' বেশ দুষ্টু, কিন্তু সে অনেককে টিট করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ফটিকও বেশ দুষ্টু, গ্রামের পথে পথে সে কাঠের গুঁড়ি থেকে কাউকে নামাতে না পেরে শেষে ওই গুঁড়িটাই সবাই মিলে গড়িয়ে দিয়ে তাকে ভূমিসাৎ করে দেয়। এসবের জন্য তাকে শহরের স্কুলে পাঠিয়ে শোধরাবার চেষ্টা হয়, কিন্তু সে বাঁচে না, দুঃসহ পরিবেশে তাকে মরতে হয়।

ক্রমশ এই ছক-বাঁধা ভালো-খারাপের দ্বন্দ্বটা বদলে যেতে থাকে। দুষ্টু, ডানপিটে, বেপরোয়া

ছোটোরা জায়গা নিয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় 'রাজার বাড়ি' তাঁর আবাসে খুঁজে পাননি, যদিও ওইরকমই ঠকানো হয়েছিল। তাঁর রচনায় সুয়োরানি, দুয়োরানির দুঃখ পেতে চায়, কারণ দুয়োরানির ছেলেটাই মানুষ হয়েছে, তারটা হয়নি। 'শিশু ভোলানাথ'-এ শিশু তার মা-কে দুয়োরানি বানাতে চায়, কারণ তাতে 'রাজা'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিশুর 'খেলাভোলার দিন' এলে তার 'মনের ভিতরে কেমনতরো বাজে'। এই যে মন-কেমন-করে বেজে ওঠে, এইসবের জন্যই রবীন্দ্রনাথের শিশু কেবল 'তেপান্তরের মাঠ' পেরোয় না, সে ছোটোদের মনের গহনটা বের করে আনে এই শহরেই। সেখানেই সে দিগন্ত পার হয়, রোগশয্যায় শুয়েও সামনের পাহাড়টা পেরিয়ে চলে যেতে চায়।

পরবর্তী যুগে ছোটোদের সাহিত্যে তেপান্তরের মাঠের প্রসারণ ঘটিয়েছেন অনেকে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অ্যাডভেঞ্চার, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, বিভূতিভূষণের *চাঁদের পাহাড়* — ছোটোদের জগৎকে আনন্দে, উত্তেজনায়, মজায় কেবলই বাড়িয়ে দিয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তী এনেছেন অনুপ্রাসের জাদু, একে জাদুই বলতে হয় — তার ফলে ছোটোরা শুধু আনন্দ পায় না, সেইসঙ্গে ভাষাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ব্যবহার করতেও শিখে ফেলে। এরা শিশুসাহিত্য থাকেনি, হয়ে উঠেছে কিশোরসাহিত্য এবং বুদ্ধির আবেদনে সমৃদ্ধ করেছে ছোটোদের। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর একটি কবিতা শুরু করেছিলেন, 'বই পড়ো তো, টই পড়ো কি', এই বলে। বইয়ের সঙ্গে 'টই' শব্দটা জুড়ে কল্পনার ছোটো ছোটো ছোঁওয়া বুলিয়ে দিয়েছেন তিনি। বুঝিয়ে দিয়েছেন 'বই-টই' বলতে কী বোঝায়।

রাজপুত্র/মন্ত্রীপুত্র

রূপকথার গল্পে রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র চিরকাল মানিকজোড়ের মতো থেকেছেন। দেশে-বিদেশে এরা শুধু রাজকন্যা খোঁজেনি, বিপদকেও খুঁজেছেন। রাক্ষস-খোক্কোসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন বিপন্নকে। আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন রাজ্যে রাজ্যে।

বাংলা শিশুসাহিত্যে এই জুড়ি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে ভাবা চলে কি না ভেবে দেখা যেতে পারে। এঁদের গল্পে রূপকথার আদল আছে, সেইসঙ্গে রূপকথাকে পেরিয়ে গিয়েছে এঁদের কল্পলোক। ছোটোদের মনের সঙ্গে তাদের কল্পনার সঙ্গে এঁদের সহৃদয় পরিচয় এঁদের রচনাকে দিয়েছে সেই মহিমা যা চিরকালের শৈশবকে ধরে রেখেছে অন্তহীন।

ছোটোদের জন্য অবনীন্দ্রনাথ যেসব বই লিখেছেন সেগুলিকে অবশ্যই শিশুসাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে সবসময় ধরানো যায় না। কিন্তু এগুলি নিতান্ত বড়োদেরও নয়। অথবা, এগুলি দু-দলেরই। *নালক, বুড়ো আংলা, আপন কথা* — এসব গ্রন্থের কোনোটিতে তিনি গল্প বলছেন, কোনোটিতে বলছেন নিজের কথা। নিজের কথা, অর্থাৎ আত্মজীবনী, কিন্তু সেটুকু ঘিরে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর ছোটোবেলার মধ্যে। যারা ছেঁড়া মাদুরে নয়তো মাটিতে বসে গল্প শোনে তারাই তাঁর ইতিহাসের 'রাজা রানী বাদশা বেগম'। ছোটোদের তিনি শুধু ভালোবাসতেন না, নিজেও ছোটোই হয়ে যেতেন। তাঁর গ্রন্থে রূপকথার গড়ন থাকতে পারে, আসলে সেগুলি কল্পনা-বাস্তবে একাকার জীবনের অপরূপকথা। বুদ্ধি দিয়ে নয়, অনুভূতি দিয়ে তাঁর লেখা পড়তে হয়, এবং এইখানেই সেই জাদু, যার সাহায্যে তিনি ছোটোদের অনায়াসে ছুঁয়ে ফেলেন। কারণ

ছোটোদের মতো অনুভূতিপ্রবণ আর কে হতে পারে? বড়োদের তো অনুভূতির বালাই নেই, তারা খুবই বাস্তববাদী — যা প্রয়োজনে লাগে না সেসব তাদের দরকারও হয় না। ছোটোদেরও এখন ওইরকম করে তোলার চেষ্টা চলছে বটে, তবু শেষপর্যন্ত তারা নিশ্চয়ই হেরে যাবে না — তারা বোকা বনে যাবে এমন নয় বোধ হয়, তাদের জন্যই তো অবনীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করে আছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে এই অবনীন্দ্রনাথকে লেখাবার কাজে নামানোর জন্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হয়েছিল। খুড়োর কথায় ভাইপো লিখতে বসলেন, অমনি একটার পর একটা কপাট খুলে যেতে লাগল। একান্ত শিশুরা নয়, কিন্তু যেই তারা নাবালকত্বের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে তৎক্ষণাৎ গায়েব-গায়েবি তাদের দুঃখ জানিয়ে যায়; চোখ ছলছল করতে করতে ছোটো ভাই যখন বলে, 'যে বাঘ দাদাকে মেরেছে তাকে আমি বড় হয়ে নিশ্চয় মারব', তখন সে-কথা শুনে ছোটো ছোটো পাঠকেরও চোখ ছলছল করে ওঠে।

ছোটোদের প্রতি এই যে অপত্য স্নেহ, এটি ভাইপোর মতো খুড়ো রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। তাঁর যেসব গল্পে ছোটোদের প্রাধান্য, তাদের জন্য তাঁর বেদনার অন্ত নেই। 'ছুটি'র ফটিক, 'পোস্টমাস্টার'-এর রতন, এদের কথা কে ভুলতে পারে? *ডাকঘর*-এর অমল একটি ছোটো ছেলে, সে মরছে সারা নাটক জুড়ে। এটি লেখার কয়েক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথের ছেলে শমীন্দ্রনাথ চলে গেছে, তার কথা কি এর মধ্যে আছে? এ-নাটক প্রায়শ ছোটোরাই অভিনয় করে, বড়োদের ভূমিকাতেও তারাই নামে, জীবনের কাহিনী-কাব্য-দর্শন একটার পর একটা খুলে যায়। অমল যে অবিস্মরণীয় সে-কথা নাটকের শেষতম সংলাপে বসুধার হয়ে বলে দেয় সুধা — 'বোলো যে সুধা তাকে ভোলেনি'।

'অতিথি'র তারাপদকে সারা বিশ্ব ডাকে, সব ছোটোদেরই মতো। 'শারদোৎসব'-এর উপনন্দ পরম দুঃখে আনন্দের ঋণ শোধ করে — তার কথা বড়োরা বোঝে না, বোঝে এই নাটকের কুশীলব ছেলের দল।

রবীন্দ্রনাথ যখন *শিশু*-র কবিতাগুলি লেখেন, তখন তিনি শিশুদের শুধু কাছ থেকে বা দূর থেকেই নয়, স্মৃতি থেকে দেখেছেন। কখনও অন্য শিশু, কখনও অনন্য কোনো শৈশব-চেতনা। তাই তাঁর শিশুরা একটু যেন পরিণত এবং সেইজন্যই কখনও বিষণ্ণ বা করুণ। 'ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে কাগজ নৌকাখানি' যে-ছেলেটি বলে, সে আপনমনে ভাবতে পারে এমন কথা :

আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি
যেথা কাটে দিন, সেথা কাটে নিশি,
কোথা কোন গাঁয়ে ভেসে চলে যায়
আমার নৌকাখানি।

শিশুটি একস্থানেই দিনরাত পড়ে থাকে, কিন্তু তার নৌকো সে যেখানে ভাসিয়ে দেয় সেখানে 'আকাশের তারা' রয়েছে, সেখানে 'শিয়াল ডাকিছে'। *শিশু*-র কবিতাগুলি পড়বার সময়ে, ছোটোদের উপভোগের ধরনটি বদলে যায়, জীবনধারণের প্রতি একটি অনুরাগ সর্বদাই জেগে থাকে। সেই অনুরাগকেই রবীন্দ্রনাথ ধরতে পেরেছেন, বা বলা ভালো, নিজেই সেই অনুরাগকে পোষণ করে চলেছেন।

এইরকম শিশু পড়াশোনার গণ্ডিতে বাঁধা থাকতে চাইবে না এ তো স্বাভাবিক, ছুটির জন্যই সে ব্যাকুল :

মুর্খু হয়ে রইব তবে
আমার তাতে কি-ই বা হবে
মুর্খু যারা তাদেরই তো
সমস্তখন ছুটি।

এমন যে-শিশু, যে ক্রমাগত ছুটি পেতেই চায়, তাকেও তো প্রস্তুত করতে হবে। যখন সে সবেমাত্র লিখতে-পড়তে শিখছে, শিখছে দেখতে-শুনতে, তখনই তার মধ্যে এই অনুরাগের প্রবাহ বইয়ে দেওয়া চাই যাতে সে বড়ো হওয়ার আগেই *শিশু*-র কবিতা, *ডাকঘর*-এর অভিনয়, শারদোৎসবের উৎসাহ মুঠো করে ধরতে পারে। আশ্চর্য, এই প্রস্তুতির কাজটা করতেও রবীন্দ্রনাথের ভুল হল না। যে-বইতে এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটল, সেটি আদতে একটি অক্ষর-পরিচয়ের বই, তার নাম *সহজ পাঠ*। অবাক-করা মিল (শালমুড়ি দিয়ে হ ক্ষ/কোণে বসে কাশে খ্‌ক্‌খ), চমক লাগানো দোলা (আলো হয় গেল ভয়) — এবং সহজ বাক্যের ছবি (জলে থাকে মাছ। ডালে থাকে ফল। বনে থাকে বাঘ। গাছে থাকে পাখি।)। সহজ, স্বচ্ছন্দ, সংহত। রবীন্দ্রনাথ ছোটোদের জন্য সাহিত্যরস, রুচিশীলতা এবং অনুভবশক্তি ভরে দিয়ে গেলেন এই বইটিতে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও বারেবারে চেয়েছেন 'শিশু হবার ভরসা আবার জাগুক আমার প্রাণে', বলেছেন শেষজীবনে, 'মন কাঁদছে গা-খোলা ছেলের জগতে যাবার জন্য'। নিজের এই প্রয়োজন তিনি সিদ্ধ করেছেন পুনরুচ্চারণের সাহায্যে শৈশবের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে এবং তাই তাঁর রচনাতেই শিশুরা কোনো-না-কোনোভাবে মুক্তির স্বাদ পেল। সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেল *সহজ পাঠ*-এর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে — 'বাবা কেন আপিসে যায়, যায় না নতুন দেশে?'

নটেগাছটি

যে কোনো রূপকথা শেষ হয় নটেগাছকে মুড়িয়ে দিয়ে। অবশ্য সেজন্য 'ক্যান্‌রে নটে মুড়োলি' বলে ধিক্কারও শুনতে হয় তাকে। এজন্য রূপকথা শেষ হয় না, বরং অশেষ হয়ে যায়। বাংলা শিশুসাহিত্যও তার নটেগাছ কিন্তু মুড়োয়নি, তবে গাছটির আকারে-প্রকারে পরিবর্তন ঘটে গেছে।

আজকের বাঙালি শিশুর সামনে অনেক প্রলোভন এসে হাজির হয়েছে। আদিম রূপকথার আপাত-সরল বিশ্বাস এখন আর থাকছে না। আজকের শিশু জেনে ফেলেছে যে তেপান্তরের মাঠ কোথাও নেই, তবে কালাপানি আছে। তাকে জাহাজে হোক, বিমানে হোক পার হয়ে গেলে রাজত্ব রাজকন্যা মিলে যেতে পারে। এখন তার বিশ্বাসের জগৎ অনেক সংকীর্ণ — সবকিছুকে সে বিশ্বাস করে না, সব বাজিয়ে দেখতে শিখেছে সে। তার হাতে এখন ছোটোবেলাতেই ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কম্পিউটার। টি.ভি.-র পর্দায় 'শক্তিমান' বা 'সুপারম্যান'কে দেখে সে চকিত হতে শিখছে। এগুলো তার পক্ষে অশুভ কি না তা আমরা এখনও ভেবে দেখিনি। 'টিনটিন' নামক যে কমিক্‌সটি দুনিয়া আচ্ছন্ন করেছে, বাঙালি শিশুও তার বাইরে নয়। আজকের শিশু কি বলতে পারে, 'কী হবে মা রাজার মত সাজে'; 'দুয়ার খুলে দাও যদি

মা ছুটি পথের মাঝে, রৌদ্রবায়ু ধুলোকাদার পাড়ে'? এসবের জন্য তার অবসর নেই, তাকে সব জানতে হবে, কোথাও ঠেকে গেলে চলবে না, পিছিয়ে পড়লে চলবে না।

আজকের শিশুর জন্য তাই অন্য আয়োজন শুরু হয়েছে। সাধারণ জ্ঞান থেকে বিশেষ জ্ঞান, রহস্য থেকে রোমাঞ্চ, অভিমান থেকে অভিযান — সর্বত্র এক ধরনের কেজো আবহাওয়া প্রস্তুত। এর ফলে অনেক সাধু সংকল্পও দেখা যাচ্ছে। শিশুকে বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য গড়ে উঠছে বিজ্ঞান মঞ্চ, পত্রিকা, গ্রন্থ। 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান' বেরোচ্ছে অনেক দিন। ১৯৪৮ সালেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর খুলেছে। ১৯৮৯ থেকে বেরোচ্ছে 'এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী' — সম্পাদনায় আছেন অরুণাভ মিশ্র, জীবন সর্দার প্রমুখ। জেলায় জেলায় বিজ্ঞানচেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ত কাজ করছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করছে 'বিজ্ঞানের আসর' এবং 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'। এখনকার সব দৈনিক পত্রিকাই ছেলেদের জন্য সপ্তাহে একটি পাতা নির্দিষ্ট করে রাখে। একসময়ে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯, ছোটদের জন্য দৈনিক 'কিশোর' সংবাদপত্র বেরোত, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায়। এখন যেসব কিশোর বা শিশু-পত্রিকা আছে, তারা সবাই ছোটোদের খুব চৌকশ করে তুলতে চায়। এদের মধ্যে আমাদের ঐতিহ্য নেই। হয়তো ঐতিহ্যের প্রয়োজনও নেই। আজকের অনেক নামী লেখকও ছোটোদের জন্য লেখেন, তাঁরা কোনোদিন শৈশব পার হয়েছেন তাঁদের রচনা থেকে এমন বোধ হয় না। ছোটোদের জন্য লেখা এখন কদাচিৎ সুপাচ্য হয়, ক্বচিৎ হয় শিল্প — পড়ার পরেই বা পড়া শেষ হওয়ার আগেই এরা ফুরিয়ে যায়।

অবশ্য এখনকার শিশুরা আর প্রকৃত অর্থে শিশু নেই, এ-কথাটাও আগে বলেছি। এরা নাকি অনেক বেশি বুদ্ধিমান, তাই প্রায় সময়েই এরা প্রাপ্তবয়স্কের মতো আচরণ করে। কথাটা মেনে নেওয়া মুশকিল, বরং মনে করা যেতে পারে এদের বুদ্ধি সেভাবে বাড়েনি, তবে সুযোগ এসেছে অনেক, যেজন্য এরা অকালপক্ব হয়েছে। আমাদের সংসার সীমিত যার ফলে শিশুদের সঙ্গীর অভাব ঘটছে। পরিবার সংকুচিত বলে সে সমবয়সি কাউকে পায় না, বড়োদের মুখের উপরে বসে থাকাই এখন তার বিনোদন। বাসস্থান সংকীর্ণ, তাই ব্যক্তিগত পরিসর বা Personal space কারোরই থাকছে না — বড়োদের লাভ-ক্ষতি, টানাটানি, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভগ্ন অংশ ভাগ, এখন ছোটোদের রাজ্যেও অনুপ্রবেশ করে যাচ্ছে। একটি ছোটো ছেলেকে যখন বলেছিলাম, 'তুমি দেওয়ালিতে বাজি পোড়াবে না?', 'সে জবাবে বলেছিল না, বাজি পোড়ানো মানে তো টাকা পোড়ানো' — শুনে চমকে গেলেও বুঝেছিলাম যে এটাই স্বাভাবিক। বাবা-মা এসব তার সামনেই বলেন, তাকেই বলেন। এও বলেন যে টাকাই এখন আসল বস্তু, আনন্দটা কোনো বিষয় নয়। অথবা, টাকা থাকলেই একধরনের আনন্দ পেয়ে যাবে তা সে যতই কৃত্রিম হোক না কেন।

যে-শিশুটি এককালে অন্ধকার ঘরে সন্ধ্যাবেলা মোহন সর্দারের সরু-মোটায় ভাঙা কণ্ঠস্বরে রঘু ডাকাতের জীবনচরিত শুনেছে সে এখন খবরের কাগজে পড়ে ডাকাতির খবর। তার ঘরে এখন অন্ধকার নেই, নেই কোনো অবকাশ। রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো সংসার থেকে চলে গেছে। *সহজপাঠ*-এ যে-শিশু দেখেছে ফুল প্রজাপতি হয়ে যায়, আলোর শিখা হয়ে যায় জোনাকি, জল হয়ে যায় মেঘ এবং তার পরেও সে জানতে চায়, 'কখনো হবে না সেকি ভাবি যাহা মনে' — সেই আশ্চর্য শিশু নেই এখন, তারা হয়ে যাচ্ছে এগ্‌জিকিউটিভের

আদর্শ সম্ভাবনা মাত্র। মূর্খ হয়ে সমস্তক্ষণ ছুটি পেতে সে আর চায় না। এখন যাঁরা শিশুসাহিত্য লেখেন, তাঁদের মধ্যে শৈলেন ঘোষ গল্পের শেষে বলেন, এখন কি আর চাঁদের সেদিন আছে? যেদিন থেকে মানুষ চাঁদে যাওয়া-আসা শুরু করেছে সেদিন থেকে চাঁদের কবিতাও শেষ হয়ে গেছে ('বাগডুম সিং')।

যেখানে ছুটির হাওয়া ছিল অবারিত, সেই ছুটি এখন নতুন নিয়মে অস্তমিত এবং অন্তর্হিত। নতুন কালের নবজাতক তাই চিরকালের নতুন শিশুসাহিত্যের 'রিমেক' বা 'রিপ্রিন্ট' নিয়েই খুশি হতে চেষ্টা করছে। সেদিক থেকে তারা সৌভাগ্য পায়নি — যেমনটি শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, 'কী হতভাগ্য সেই দিন যখন শিশুরাও জেনে গেছে গাছ কখনো কথা বলতে পারে না আর সাতভাই চম্পাকে ডাকতেও পারে না কোনো পারুলবনের রূপকথা'।

শিশুদের পক্ষে Hostile হয়ে উঠেছে বটে দুনিয়া, তবু তার নটেগাছটি মুড়োয়নি, শুধু বদলে গিয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি :

বুদ্ধদেব বসু — *বাংলা শিশুসাহিত্য* (সাহিত্যচর্চা), (১৯৮১)

বাণীবসু — *বাংলা শিশুসাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জি* (১৩৭২)

খগেন্দ্রনাথ মিত্র — *শতাব্দীর শিশুসাহিত্য* ১৮১৮—১৯৬০, — (১৯৬৭)

শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় - *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য* (১৯৯১)

'রবীন্দ্র' উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বানান জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ অনুসারে।

বিদেশি সাহিত্য

রম্যাঁ রলাঁ ও ভারতবর্ষ : বিস্মৃত এক সংলাপ

চিন্ময় গুহ

নতুন শতাব্দীতে যখন খসে পড়ছে সরল বিশ্বাসের পলেস্তরা, নড়ে উঠছে মানব-ভাবনার ভিত, তখন মুক্ত-মনের অতন্দ্র প্রহরী রম্যাঁ রলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪)-র সঙ্গে ভারতীয় নবজন্মের কয়েক জন সন্তানের এক হারিয়ে-যাওয়া সংলাপের কথা মনে পড়তে পারে আমাদের। এঁরা গভীর ভালোবাসায় বানিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন দুই মহাদেশের মধ্যে এক আশ্চর্য রূপকথার সেতু, যা আমাদের মতো স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের মানুষদের অবাক করে দেয়। কারণ আমরা তো সেতু বানাতে অপারগ, আমরা তো শুধু দ্বীপ বানাতেই অভ্যস্ত।

এ এক অপূর্ব সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কথোপকথন, আগুনের পাশে-বসা সংলাপ, দুটি চিন্তাধারার, দুটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বচনের মধ্যে এক অন্তর্বয়ন। এ এক যৌথ ভাবনার মঞ্চ, যা নতুন শতাব্দীতে আমাদের আয়ত্তের বাইরে। ভারতের নতুন প্রজন্মের প্রগতিশীলরা — যদি তাঁরা আদৌ থেকে থাকেন — পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক (সাম্প্রতিকতম নয়) কু-অনূদিত তত্ত্বাদির কূটকচাল নিয়ে বড়োই বেসামাল, রম্যাঁ রলাঁর মতো ভাবুক মানবতাবাদীকে নিয়ে ভাবার সময় কোথায় তাঁদের? আর ফ্রান্সের অতীতহীন তরুণেরা প্রায়ই আমায় এই মূর্খ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন : 'কে এই রম্যাঁ রলাঁ?'

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, জীবনীকার, সাংস্কৃতিক কর্মী রম্যাঁ রলাঁর জন্ম মধ্য-ফ্রান্সের বুরগ্যনের নিয়েভ্‌র্‌-এর ক্লামসি শহরে — ১৮৬৬ সালের ২৯ জানুয়ারি, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পাঁচ বছর পরে, গান্ধির জন্মের ও সুয়েজ খালের উদ্‌বোধনের তিন বছর আগে, ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের চার বছর ও ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে। ১৯১৫ সালের নোবেল-বিজয়ী (যিনি পুরস্কারের পুরো টাকাটাই রেড-ক্রস ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে গোপনে দান করে দেন), আকাদেমি ফ্রাঁসেজের সর্বোচ্চ সাহিত্য-পুরস্কার বিজেতা, আধুনিক লিরিক নাটকের উৎপত্তি ও অপেরার ইতিহাস বিষয়ে দুটি ডক্টরাল থিসিসের রচয়িতা, একোল ফ্রাঁসেজ দ্য রোমের সদস্য, একোল নরমাল স্যুপেরিয়্যরের শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপক, একোল দে ওত্‌ জেত্যুদে সংগীতের অধ্যাপক, আকাদেমি ফ্রাঁসেজের সম্ভাব্য সদস্য, গত শতাব্দীর অন্যতম বহুল-পঠিত ফরাসি উপন্যাস *জাঁ-ক্রিস্তফ*-এর লেখক... হঠাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি বই *মারদাঙ্গার উর্ধ্বে* লিখে তিনি ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের আক্রোশের শিকার হয়ে পড়লেন। সেখানে তিনি স্বদেশবাসীকে সংকীর্ণ জাতীয়তার উর্ধ্বে উঠে যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানালেন, এবং মুহূর্তের —মধ্যে চিহ্নিত হয়ে গেলেন 'বিক্রি হয়ে যাওয়া, ভোলবদলানো বিশ্বাসঘাতক' বলে। রলাঁ লিখেছেন, 'একটু চুপ করে থাকলেই লেখকের অহমিকা যা প্রত্যাশা করে, ফ্রান্সে তার সবই আমি হাতে পেয়ে যেতুম। শুধু একটু নিচু হলেই সমস্ত ফসল আমার হাতে চলে আসত। — কিন্তু আমি শুনলাম আমার বিবেকের বাণী, আর এক লহমায় সবকিছু ধ্বংস করে ফেললাম — আমার গোটা অতীত, আমার গোটা ভবিষ্যৎ। আমি জানতাম আমার গায়ে কালি লেপন করা হবে, আমায় ছোটো করা হবে, অস্বীকার করা হবে, প্রত্যাখান করা হবে। — আর ঠিক তাই হল। কিন্তু আমি আপশোস করি না'। ফরাসিরা তাঁকে দেশদ্রোহী বানালেও সারা পৃথিবী রলাঁকে কুর্নিশ করল এক মহান মুক্তমনা মানবতাবাদী

বলে। সুহৃদ হিসেবে পেলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, গোর্কি, হেরমান হেসসে, স্টেফান জোয়াইগ, আইনস্টাইন, বার্নার্ড শ, ফ্রয়েড এবং ক্রমশ ফ্রান্সে পিয়ের জাঁ-জুভ, জর্জ দ্যুয়ামেল, লুই আরাগঁ ও আঁদ্রে মালরোকে। কিছুদিনের মধ্যেই রলাঁ তীব্র বিতৃষ্ণায় প্যারিস ছেড়ে সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে চলে যাবেন, 'লোকজনের ভিড় থেকে মানুষের হৃদয়ের মাঝখানে' (রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি)।

কেমন ছিলেন রলাঁ? ফরাসি কবি পিয়ের জাঁ-জুভ তাঁর ১৯১৯ সালে রচিত জীবনীতে এইরকম বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর: 'রম্যাঁ রলাঁ দীর্ঘকায়, কৃশ, ১৯১০ সালের দুর্ঘটনার পর থেকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন। পরনে কালো, সুরুচিপূর্ণ, অনাড়ম্বর পোশাক, তিনি বসে আছেন বই-বোঝাই এক ছোট্ট ঘরের ছোটো টেবিলে, আর লিখছেন সেইসব শব্দ যা ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়। কখনও তিনি আরামকেদারায় বসে, পা-দুটি ভাঁজ করা, একটি অস্থিসারপূর্ণ হাত চিবুকের নীচে রাখা। কথা বলেন নরম, অনুরণনময়, যুক্তিপূর্ণ স্বরে।' জুভের ভাষায়, 'কথা কন অল্প, কারণ তিনি দেখতে জানেন'। তাঁর মুখটি চিত্তাকর্ষক ও কমনীয়, 'আমাদের ফরাসি আকাশের' মতো, যা জুভকে ১৬২৩ সালের হ্যাগার্ড ও ব্লাউন্ট, লন্ডন প্রকাশিত শেকসপিয়রীয় সংস্করণের পোর্ট্রেটটির কথা মনে করিয়ে দেয়। অথবা র‍্যাফায়েলের আঁকা এক রোমান কার্ডিনালের ছবির কথা, যার ঈগল-পাখির মতো তীক্ষ্ণ, গম্ভীর ও বিশুদ্ধ সমুদ্র-নীল চোখ। স্টেফান জোয়াইগ তাঁর ১৯২১ সালে রচিত জীবনীতে 'শীর্ণ, দীর্ঘকায় মানুষটির ফ্যাকাসে, হলদে মুখের ইস্পাতের ঝলকানির মতো দৃষ্টি'র কথা বলেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা তাঁকে শক্তি ও আলোর সন্ধানে টেনে আনল ভারতীয় আকাশে। তাঁর দুই আদর্শ বেঠোফেন ও গ্যোয়েটের মতো, তিনিও ভারতের বিষয়ে কৌতূহলী, 'তার প্রাচীন মনের মৌচাকে, তার স্বর্গীয় বহুধ্বনিময়তায়'। একোল নর্মাল সুপেরিয়রের দিনগুলিতে তিনি পড়েছিলেন 'গীতা — এক আগ্নেয়গিরি', যার কোনো কোনো অংশ তিনি তাঁর *দাঁতঁ* নাটকের পাণ্ডুলিপিতে টুকে রেখেছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি কোজেৎ পাদু-কে লিখেছিলেন, 'ভারতের মাটি, জল, আকাশকে বোলো : রম্যাঁ রলাঁ তাদের অভিবাদন জানাচ্ছে। হয়তো আমি সেখানে যাব, এ-জীবনে অথবা অন্য এক জীবনে'। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়ই তাঁকে স্পষ্টত নিয়ে এল 'ভারতবর্ষ — আমার মা'-র দিকে (কালিদাস নাগকে লেখা চিঠি, ১২ নভেম্বর ১৯২২)। রলাঁর ডায়েরিতে ভারতের প্রথম উল্লেখ পাই ১৯১৫ সালে, যেখানে তিনি ২৪ ডিসেম্বর ১৯১৪-তে প্রকাশিত *The New Age*-এ রলাঁকে উৎসর্গীকৃত আনন্দ কুমারস্বামীর নিবন্ধ 'ভারতের বিশ্বরাজনীতি'-র থেকে উদ্ধৃতি লিখে রেখেছেন। তাঁরা কয়েকবার পত্রবিনিময় করেন, এবং ১২ই ফেব্রুয়ারি কুমারস্বামী তাঁকে *ভগবদ্‌গীতা*-র একটি কপি পাঠান। সঙ্গে আর একটি বই, *ভারত ও সিংহলে শিল্প ও হস্তশিল্প*। রলাঁ উত্তরে লেখেন, 'কী ঐশ্বর্যময় ওই জগৎ, কী পরিপূর্ণ! মনে হচ্ছে আমার বুক ফেটে যাবে, এত কিছু ধরার পক্ষে তা যে কত ছোটো!' ওই সুউচ্চ দিগন্তকে আবিষ্কার করার আগে তিনি মরে যেতে রাজি নন। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের বাগানের চাবিটি তাঁর হাতে এসে গেছে। রলাঁ আগেই রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* পড়েছিলেন, আঁদ্রে জিদের ফরাসি তরজমা তাঁর ভালো লাগেনি। অন্যদিকে, আরও অনেক ভারতীয়ের মতো, রবীন্দ্রনাথও *জাঁ-ক্রিস্তফ* পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু রলাঁ ও ভারতবর্ষের মূল সংলাপের সূচনা হল অক্টোবর ১৯১৬-তে, যখন

রবীন্দ্রনাথ টোকিয়ো-র ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে জাতীয়তা-বিরোধী ও বিশ্বজনীন এক বক্তৃতা দেন। রলাঁর মতে সেটি ছিল 'Un tournant dans l'histoire du monde' ('পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বাঁক')। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন, 'এশিয়রা আজ ইউরোপের অধঃপতনের কথা বুঝতে পেরেছে'। খুব শিগগিরই তিনি *Christian Science Monitor*-এ 'Race Unity'-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের অংশ টুকে রাখেন তাঁর ডায়েরিতে। আধুনিক সভ্যতা যেভাবে ধীশক্তি ও আবেগকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তার নিন্দে করে রবীন্দ্রনাথ এটিকে এক বিরাট যুগপরিবর্তনকাল বলে অভিহিত করেন। যুদ্ধ সত্ত্বেও তিনি নিরাশ হননি। এ যেন এক অস্পষ্ট উষা, যেখান থেকে উঠে আসবে একতা, শান্তি ও আলো। ১৯১৭-র মার্চে অমিয় চক্রবর্তী রলাঁকে লিখলেন *জা-ক্রিস্তফ* কীভাবে তাঁর অন্তরকে দীপিত করেছে।

কিছুদিনের মধ্যেই বার্ট্রান্ড রাসেল, বেনেদিত্তো ক্রোচে, আঁরি বারব্যুস, স্টেফান জোয়াইগ ও অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁ 'স্বাধীন মনের ঘোষণাপত্র'-এ সই করলেন। কিছু আগেই রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর নাইটহুড প্রত্যর্পণ করে সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি সেই বিরল শিল্পী যাঁর একটি মেরুদণ্ড আছে। অবশেষে রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের দেখা হল ১৯২১ সালের ১৯ ও ২১ এপ্রিল, প্রথমে প্যারিসে রলাঁর মোপারনাঁসের ছোট্ট ফ্ল্যাটে, পরে বুল্যন-স্যুর-সেনে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, যেখানে তিনি এশিয়ার সংস্কৃতিগুলির মেলবন্ধনের স্বপ্ন দেখছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের সময়, গান্ধি ও টলস্টয়-প্রসঙ্গ ছাড়াও, তাঁরা পরস্পরের গভীর সংগীত-প্রীতির কথা বললেন, রবীন্দ্রনাথ গাইলেন তাঁর গান। এক বছরের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ তরুণ ঐতিহাসিক কালিদাস নাগকে লিখলেন :

> আমি জেনে খুব খুশি হয়েছি যে রম্যাঁ রলাঁর অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সংস্পর্শে তোমার আসার সৌভাগ্য হয়েছে। পশ্চিমে যাঁদের সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়েছি, তাঁদের সকলের চেয়ে রলাঁকেই আমার হৃদয়ের নিকটতম এবং আমার ভাবনার সবচেয়ে সগোত্র মনে হয়েছে। ... রলাঁর মতো মানুষেরা সামগ্রিকভাবে মানবতার কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় তপস্যার জীবনকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কাছে দেশ এবং জগতের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। আর এইজন্যেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা তাঁদের তাড়া করে ফিরেছে। কিন্তু আমার পূর্ণ সহানুভূতি রলাঁ এবং তাঁর সহকর্মীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রতি। চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই, কারণ আমরা সত্যের পক্ষে, যার মধ্যে সত্যকার স্বাধীনতা এবং সত্যকার মুক্তি।

আর রলাঁ লিখলেন তাঁর নতুন বন্ধু কালিদাসকে :

> আমি ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে গ্রিস বা আবহমান ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনের মিল দেখে অবাক ও মুগ্ধ হয়েছি। পার্থক্যটা শুধু এই যে ভারতীয় দর্শন আরও সারবান। তাঁরাও একই কথা ভেবেছেন, কিন্তু ভারতীয়দের ছিল আরও বেশি গভীরতা ও পরিপূর্ণতা, তা ছাড়া তাঁদের আঙ্গিকও অপরূপ। গভীরতা ও ব্যাপ্তি ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমরা যেন একই কথা ভেবেছিলাম। এটা *আমাদেরই* ভাবনা।

১৯২৪ সালের ভিতরই কালিদাস নাগের সাহায্যে তিনি লিখে ফেললেন গান্ধির প্রতি তাঁর অর্ঘ্য, যা তাঁর নতুন ঈশ্বর ও নতুন মানবতার আবিষ্কার-অভিযানের অঙ্গ। 'সময়টা হিংস্র ও নিষ্ঠুর, বিপর্যস্ত কিন্তু শক্তিশালী। যা ধ্বংস করে, আবার নতুন করে গড়ে তোলে। প্রাচীন আদর্শের বিরুদ্ধে, মৃত দেবতাদের বিরুদ্ধে, লক্ষ লক্ষ অন্ধ মনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। আমাদের নতুন দেবতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নতুন মানবতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এমন মনে করার কোনো কারণই নেই যে নতুন মানুষকে ইউরোপীয়ই হতে হবে। আমি ভারত ও চীনে ঢের বেশি উঁচুদরের নতুন মানুষ দেখেছি'। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি এবং বিশের দশকের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো ভারতীয়ের প্রতি রম্যাঁ রলাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্যকে, ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে, মরণোন্মুখ দেবতা ও খুনেদের প্রতি বিতৃষ্ণার থেকে আলাদা করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধি সম্পর্কে ১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে রলাঁ লেখেন :

> আমি ওই সন্ত ও ওই ঋষিকে দেখে আরও বেশি মুগ্ধ না হয়ে পারি না। ভারতের কী সৌভাগ্য যে সেখানে এমন দুজন মহামানবের সহাবস্থান, যাঁরা উচ্চতম সত্যের এক-একটি দিককে তুলে ধরেন। নায়কদের গ্যালারিতে গান্ধির কাছাকাছি আসার মতো কেউ নেই। ইউরোপে তো একজনও নেই। গান্ধির কোনো কোনো মতামত সম্পর্কে আপত্তি ও শিষ্যদের হাতে বিপজ্জনক বিকৃতি সত্ত্বেও আমি তাঁর গুণমুগ্ধ, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে কারামুক্তির পর আনন্দোচ্ছল রলাঁ ও বোন মাদ্‌লেন সবরমতীতে গান্ধিকে লিখলেন : 'আমরা দুজনে আপনাকে আমাদের ভালোবাসা ও মুগ্ধতার বাণী পাঠাচ্ছি। কারাগারের মহান ছায়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রের সূর্যরশ্মির সামনে আপনি আবার মুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। ভারত যেন এবার আপনার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। ইউরোপ যেন এবার তার অরণ্যের ভিতর আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়'। এই আবিষ্কার ও বিস্ময় ভারতীয় মাটিতে রম্যাঁ রলাঁর মননগত-ভাবগত অনুসন্ধানের অঙ্গ। অথচ কখনও তিনি যৌক্তিকতা ও কাণ্ডজ্ঞান হারাননি। মাদ্‌লেন স্লাদকে (মীরা) লিখেছেন, 'আমি খ্রিস্টান নই, আমি গান্ধিবাদী নই, আমি কোনো প্রতীত ধর্মে বিশ্বাস করি না। আমি পশ্চিমের মানুষ, ভালোবাসায় আন্তরিকতায় আমি সত্যের অনুগামী'।

ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে, সুইজারল্যান্ডের ভিলন্যভে রলাঁর বাড়ি 'ভিলা অলগা' হয়ে উঠল ভারতীয়দের কাছে এক তীর্থক্ষেত্র : লালা লাজপত রায়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, দিলীপকুমার রায়... ব্যক্তিগত কথোপকথনে এঁরা অনেকেই তাঁর কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছেন (এমনকী স্বয়ং জওহরলালও গান্ধির তীব্র সমালোচনা করেছেন নিপীড়িতদের জন্য সত্যিকারের কিছু না করার জন্য, শ্রেণিসংগ্রাম ব্যাপারটা না বোঝার জন্য। *ভারতবর্ষ* দিনপঞ্জি, ১ মে ১৯২৭)। ভারতের সঙ্গে রলাঁর এই বহুমাত্রিক সংলাপ সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপে। এইসব চিঠিপত্র ঐশ্বর্যে, গভীরতায়, ঘনত্বে, বৈচিত্র্যে যেন এক সিম্ফনির মতো, কিংবা কখনও এক বেদনার্ত ভারতীয় রাগিণীর মতো... যেমন, ১৯২৫ সালে শেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের ভিলন্যভে যাওয়ার পরিকল্পনা নাকচ করে দেওয়ায় যেন সরোদের তার

ছিঁড়ে গেছে। চিঠিগুলির অধিকাংশই উষ্ণ ভালোবাসার রণনে মুখর। কখনও কখনও সূক্ষ্ম হাস্যরস, দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু নির্দোষ পরচর্চার (যেমন রথীন্দ্রনাথ বা দিলীপকুমার রায় সম্পর্কে) রং লেগেছে সেখানে। কখনও কথোপকথন হয়ে উঠেছে নীরব, যখন রলাঁ হঠাৎ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর পাঁজর। ইউরোপের অন্যতম শক্তিধর মানুষটির কোমলতা প্রবাহিত হয়েছে ঝরনার মতো — 'আমি কোনো আদর্শ নই! আমি এক জীবন্ত মানুষ — অত্যন্ত সজীব, অত্যন্ত স্বাধীন, এবং অত্যন্ত জটিল'। কিংবা 'আমি একা — একা — একা'। ভারতবর্ষ ও রলাঁর মধ্যে ছিল এইসব অসম্ভব, অনিন্দ্যসুন্দর সংস্পর্শ-মুহূর্তগুলি। এই পত্রবিনিময়ে আরও খোদাই হয়ে আছে এক ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্বপ্নের প্রকল্প, 'বিশ্বগ্রন্থাগার' (weltbibliothek)-এর ছবি। এই 'বিশ্বগ্রন্থাগার' হয়ে উঠতে পারত 'শান্তিনিকেতনের এক ইউরোপীয় আত্মজ', যা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব হতে পারেনি।

যে-বিরাট ধাক্কায় রবীন্দ্র-রলাঁ বন্ধুত্ব আলোড়িত হয়েছিল তা হল রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনি বিতর্ক। মুসোলিনি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের ছলচাতুরিতে বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর নাটকের ভয়ানক ও নিষ্ঠুর রাজার সঙ্গে তুলনা করে থাকবেন। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের সামনে ফ্যাসিবাদের প্রকৃত কদর্যতা মেলে ধরার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছেন রলাঁ। ১৯২৬-এ তাঁর কুখ্যাত ইতালি সফরের শেষে রবীন্দ্রনাথ ভিলন্যভে এলে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনের সময়, ও পরে ১১ নভেম্বরে লিখিত চিঠির শেষে রলাঁ মুসোলিনির অপরাধ ও কাপট্যের রাজনীতিকে উদ্‌ঘাটিত করেন। ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে রলাঁ রবীন্দ্রনাথ ও ফ্যাসিবাদের শিকারদের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিয়ে দেন। রলাঁই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় চিঠি লিখিয়ে মুসোলিনির শাসনের সমর্থনের অভিযোগ অস্বীকার করান। রলাঁ লিখেছেন, 'যারা ফ্যাসিবাদের ইতালিয় শিকার, তারা নিজেরাই রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলে দেয়। ইতালিয় ফ্যাসিবাদের সাক্ষী ও শহিদদের ছাড়া আমাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত'। পুরো সমস্যাটিকে আর একবার বুঝে নেওয়ার জন্য ১৯২৬-এর ৩০ সেপ্টেম্বর কালিদাস নাগকে লেখা রলাঁর চিঠির বাংলা অনুবাদ পড়ে নেব আমরা :

> রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনির ঘটনাটা অবশ্যই একটা বিপর্যয়। কোনোরকমে একটা সমাধানের রাস্তা বের করা গেলেও, সেটা কাউকেই খুশি করতে পারেনি। ব্রিটেনের কাগজপত্রে আমি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ফ্যাসিবাদী বন্ধুদের নিয়ে চলমান বিতর্কের খবর পড়ি — সেখানে নজরে পড়ার মতো কোনো সুফল দেখিনি। 'মডার্ন রিভিয়ু' পড়ে বুঝতে পারছি (...) ভারতে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধুরাও কতটা অবাক হয়েছেন।
>
> রবীন্দ্রনাথের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। মুসোলিনির আতিথেয়তা উপভোগ করার পর তাঁর পক্ষে মুসোলিনির ইতালিকে প্রকাশ্যে বিচার করা কঠিন। তাঁর সমালোচনাও — তা যতই সংযত হোক না কেন — ইতালির কাগজপত্রে অকৃতজ্ঞতা ও অসৌজন্যের অভিযোগ এনেছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ফরমিকির মতো বন্ধুদের, যাদের তিনি খাতির করতেন, দুঃখ দিতে কষ্ট পাচ্ছেন। ফলে তিনি তাঁর বিচারকে সংযত রাখছেন, অথবা সমালোচনায় ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছেন প্রশংসা দিয়ে।
>
> অন্যদিকে, ফ্রান্স ও জার্মানির ফ্যাসিবিরোধীদেরও তিনি মোটেই খুশি করতে পারেননি। আমার বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া থেকেই সেটা বুঝতে পারছি। সত্যি কথা, রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতায় মুক্ত বিবেকের পূজারিদের মনটা শান্ত হয়েছে, কিন্তু ওই দুর্ঘটনার

ছায়া এখনও তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কী করে কেউ ভুলবে যে রবীন্দ্রনাথ হত্যাকারী মুসোলিনির সঙ্গে করমর্দন করেছেন, তাঁর স্তুতি করেছেন, এবং শেষপর্যন্ত (তত্ত্বগতভাবে) ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে প্রবল আপত্তি জানালেও ইতালিয় ফ্যাসিবাদের মূর্তিমান অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

তোমাকে আমার মনের কথা বলব? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি অনুভব করতে পারছিলাম মুসোলিনি সম্পর্কে তাঁর এক প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি।

আমায় শুনতে হল — তিনি স্পষ্ট করে বললেন — যে মুসোলিনির ব্যক্তিত্ব তাঁর শিল্পীমনকে এক হিসেবে মুগ্ধ করেছে। আমি বুঝতে পারছি! নিরোকে আমার বেশ লাগে, তবু, ঈশ্বরের দোহাই, আমি নিরোর সময় বেঁচে থাকলে আমার শৈল্পিক কৌতূহলকে দুহাতে চেপে হত্যা করতাম, আর নিরোকে চিহ্নিত করতাম এক ভয়ানক দৈত্য বলে, যে মানবতাকে লাঞ্ছিত করেছে। এইসব ক্রিয়াকলাপের সামনে (ইতালিতে যে রক্তপাত ও যন্ত্রণাময় ক্রিয়াকলাপ চলছে) শিল্পবৈভবকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। যন্ত্রণা ও রক্তপাত তো ছেলে-খেলা নয়!

দেখলাম ফরমিকির শেষ চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি নাকি মুসোলিনিকে দেখার আগেই এটা জেনে খুশি ছিলেন যে ইউরোপে এমন এক ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছেন যিনি যে-সংস্থাগুলি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পদদলিত করতে সক্ষম! — 'যন্ত্রের' প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণার ব্যাপারটা আমি ভালোই বুঝি — তাঁর সৃজনকর্মে ওটা একটা অন্তঃসূত্রের মতো। আমিও তো নৈতিক ও শৈল্পিক স্তরে যান্ত্রিকতাকে ঘৃণা করি (যদিও মানুষের বিবর্তনে এটা এক অনিবার্য ও প্রয়োজনীয় ধাপ বলে আমি মনে করি, যার মোকাবিলা করা শক্ত, কিন্তু যাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার)। কিন্তু শুধুমাত্র আমরা কয়েকটি বিরাট রাষ্ট্রের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ যান্ত্রিকীকরণকে ঘৃণা করি বলে আমাদের কি রাজনৈতিকভাবেও সমস্ত ধরনের স্বৈরাচারকে সমর্থন করে যেতে হবে? রবীন্দ্রনাথ প্লেটো পড়েছেন, তিনি জানেন — তাঁর জানা উচিত — যে, যে-প্লেটো গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করতেন না, তিনি নিপীড়নের প্রতি আরও গভীর ঘৃণা পোষণ করেছেন! প্লেটোর কাছে নিপীড়ন হল সামাজিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে জঘন্য রূপ। রবীন্দ্রনাথের মতো মুক্তির মহান পুরোহিতের পক্ষে ওই জমানার প্রতি দাক্ষিণ্য দেখানো কি উচিত, যে-জমানা একটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য সমস্ত স্বাধীনতাকে বলি দিচ্ছে? — আর সেই ব্যক্তিটিকেই কিনা তিনি বানিয়ে তুললেন এক মহৎ প্রতিভা!

আমি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুটি নীতির — দুটি পৃথক মানুষের — সংঘাত দেখতে পাচ্ছি: একদিকে যাঁর কাছে পৃথিবীটা একটা 'l'altissimo poeta', যাঁর কাছে পৃথিবীটা একটা খেলা, যেখানে কবি নদীতে ভাসতে ভাসতে আবহমানের বন্দনা করেন, যেমন গঙ্গার উপরে রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে, অবিচারে আহত, বিদ্রোহে স্পন্দিত এক হৃদয়, যা ট্র্যাজেডির কোনো কোনো মুহূর্তে অত্যাচারীর প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা ব্যক্ত করে এবং শান্তির জন্য আবেদন করে।

এ-দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই ইউরোপীয় তরুণদের হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করেছে। আবার এই মুহূর্তে এই দ্বিতীয়টিকে নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এরা পরস্পরবিরোধী, বেশি দিনের জন্য এদের মেলানো যায় না।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হত সংঘাতকে এড়িয়ে চলা, নিজেকে জোর করে রাজনীতির বাইরে রাখা, কারণ রাজনীতিতে অগভীরতার কোনো স্থান নেই। ওটা তাঁকে মানায়ও না। তিনি রাজনীতির যথেষ্ট খবর রাখেন না, জানতেও চান না। — রাজনীতি

নিয়ে তাঁর প্রায় কোনো কৌতূহলই নেই। সবকিছুর আগে তিনি কবি, এই মুহূর্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। কাজেই তাঁর নিশ্চয়ই অধিকার আছে বিবদমান মানুষদের ঊর্ধ্বে অলিম্পাস পর্বতে অবসর নেওয়ার। — তবে কেন তিনি ফ্যাশনদুরস্ত সরকারি মহলকে এড়িয়ে চলেন না?...

পাঁচ বছর আগে যখন প্যারিসে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন তাঁর কোনো সরকারি স্তুতি বা ঠেকার প্রয়োজন নেই। বলেছিলেন, 'আমি এক মুক্তচেতা ভবঘুরে, আমি সেইরকমই থাকতে চাই'। তারায় ভরা অনন্ত আকাশের ভবঘুরে...হ্যাঁ। সেখানেই থাকুন না কেন!*

এইরকম তীব্র ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের পাশাপাশি রলাঁর মতো মানুষই কালিদাস নাগকে লিখতে পারেন :

সুইজারল্যান্ডে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটা ওই বিরাট বন্ধুটিকে কয়েক দিনের জন্য পেয়ে ধন্য হয়েছে। তিনি চলে যাওয়ামাত্র আকাশ কালো হয়ে এল, ভিলন্যভে আছড়ে পড়ল ঝড়, আর সেই থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তবু হৃদয়ের মধ্যে ওই আলো আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি।

১৯২৬ সালের অক্টোবরে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় থেকে যে-কৌতূহলের শুরু তার পূর্ণ রূপ ১৯২৯ সালে প্রকাশিত রলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীতে। রলাঁর ভাষায়, 'আমি এই পবিত্র জলের সামান্য একটু সংগ্রহ করেছি যাতে পৃথিবীর বিরাট তৃষ্ণার উপশম করা যায়'। ভারতবর্ষে একবারও না এসে রলাঁর মতো এক সদাব্যস্ত সৃজনশীল প্রতিভা কী করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ওইরকম শল্যচিকিৎসকসদৃশ জীবনী লেখার সময় পেলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়! ১৯২২ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত লেখা হচ্ছিল তাঁর দ্বিতীয় মহান উপন্যাস *বিমুগ্ধ আত্মা*; *প্রেম ও মৃত্যুর জুয়াখেলা*-র মতো নাটক ও বেঠোফেনের জীবনী (১৯২৮—১৯৪৩)। রলাঁ লিখেছেন, যিশুখ্রিস্টের মতো রামকৃষ্ণও 'একটি পূর্ণ মুহূর্তের জাদু-ফসল'। 'আমার কর্তব্য হল ইউরোপে রামকৃষ্ণের সিম্ফনির বাণীকে পৌঁছে দেওয়া'। তিনি সংহত ও সমন্বিত করেছেন অতীতের শত শত সাংগীতিক উপাদান — যেমন বেঠোফেন ও ভাগনার, র‍্যাফায়েল ও মোৎসার্ট।

ভারতের মাটিতে রলাঁর অনুসন্ধানকে কিছুতেই সারা পৃথিবীর ঘটনা-পরম্পরা থেকে আলাদা করা যাবে না। রলাঁ তাঁর জার্নালে লিখেছেন, 'যে-ভাবনা কর্মে রূপান্তরিত হয় না, তা গর্ভপাত ও বিশ্বাসঘাতকতার সামিল'। দক্ষিণ আমেরিকা, ইতালি ও জার্মানিতে স্বৈরাচার বিষদাঁত বের করায় রম্যাঁ রলাঁ স্তম্ভিত হয়ে গেছেন বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকায় — সেইসব বুদ্ধিজীবীরা যারা 'ক্ষমতার দাস', যারা 'কানে আঙুল দিয়ে উটপাখির মতো মাথা ঢেকে রাখে', যারা 'প্রভুর সোনার চেনে বাঁধা কুকুরের মতো'। ফ্রান্সে এসব নিজের চোখে দেখেছেন তিনি, বুদ্ধিজীবীদের মুখোশের আড়ালের মুখ তাঁর অতিপরিচিত। 'মাঝে মাঝে অন্ধকারের ভিতর আমি চিৎকার করে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে উঠি, যা হাওয়ায় হারিয়ে যায়।...যখন আমি মরে যাব, ওই প্রহরীদুর্গ পরিত্যক্ত হয়ে যাবে...শুধু শোনা যাবে ঝড়ের গর্জন...'।

* *The Tower and the Sea*, রম্যাঁ রলাঁ-কালিদাস নাগ-এর চিঠিপত্র, সম্পাদনা ও ফরাসি থেকে অনুবাদ : চিন্ময় গুহ, প্যাপিরাস, ১৯৯৬।

শুনেছি ফ্রান্সে তাঁর প্রতি বিদ্বেষের একটি কারণ— অন্যটি অবশ্যই তাঁর জাতীয়তাবিরোধী মনোভাব — তাঁর সোভিয়েত দেশের প্রতি ক্রমবর্ধমান নৈকট্য। কিন্তু এতটাই তাঁর স্বাধীনচেতা মন যে স্বয়ং লেনিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন (দ্র. আঁরি গিলবো রচিত *La Fin des Soviets*,১৯৩৭)। অন্যদিকে, ১৯৩৩-এ রলাঁ হিটলারি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জার্মানির গ্যোয়েটে-মেডেল প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও চার বছর আগে ফ্রয়েড তা গ্রহণ করেছিলেন। রলাঁ তিরিশের দশকে বিশ্ব ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সমিতির সভাপতি হন। নাৎসিরা প্রকাশ্যে রলাঁর বই পোড়ায়, ছাপাখানার ধাতুর প্লেট নষ্ট করে ফেলে। স্বয়ং আঁদ্রে মালরো ও জিদ রলাঁকে টেলিগ্রাম করে জানান প্যারিসে তাঁকে ভীষণ প্রয়োজন। ১৯৩৬ সালে স্টেফান জোয়াইগ তাঁকে অভিহিত করেন 'প্রভু, নেতা, পথপ্রদর্শক, বন্ধু ও কবি' বলে 'যিনি নিরন্তর আমাদের ঐশ্বর্যবান করে চলেছেন'।

এ-কথা ঠিক যে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে তিনি ধীরে ধীরে (বিশেষত মারিয়া কুদাশেভার সঙ্গে বিবাহের পর) অন্য এক আকাশে সরে যেতে থাকেন, সে-আকাশ সোভিয়েত ইউনিয়নের। গোর্কির আমন্ত্রণে রলাঁ মস্কো পৌঁছোলে তাঁকে নায়কোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়, যদিও বেরনার দুশাৎলে তাঁর *রম্যাঁ রলাঁ : শেষ দরজার চৌকাঠে* গ্রন্থে দেখিয়েছেন রলাঁ এক দিনের জন্যও বিবেকের দায় অস্বীকার করেননি। মস্কো বিচার তাঁকে হতবাক করে দেয়, সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি তাঁকে স্তম্ভিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে তিনি রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছিলেন, বুঝতে পারছিলেন তা অনিবার্যভাবে ভবিতব্যের দিকে চলেছে। ওই সময় তিনি শেষ করেন তাঁর মহত্তম নাটক *রবেসপিয়ের*। ১৯৩৯ সালে তিনি হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের প্রতিবাদ করেন ও 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুদল' থেকে পদত্যাগ করেন।

তবু এ-কথা বললে ভুল হবে যে রম্যাঁ রলাঁ তিরিশের দশকে (বরদাস ফরাসি সাহিত্য-অভিধান যেমন লিখেছে) ভারত সম্পর্কে নিরাশ ('déçu par l' Inde') হয়েছিলেন। ১৯৩৬-এর জানুয়ারিতে যখন প্যারিসের লাতিন কোয়ার্টারের ম্যুত্যুয়ালিতের একটি বিরাট হলঘরে রলাঁর ৭০তম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে, তিনি দ্রুতবেগে পাঠালেন ভারতের জন্য এই শুভেচ্ছা-বাণী :

> আমার ভারতের বন্ধুদের প্রতি, আমার ভ্রাতৃ-শুভেচ্ছা! ভারত-প্রতিভার সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রতিভার হোক পরিণয়। আমি দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতের সেই দেবশিশুদের, যারা ওই আশীর্বাদ-ধন্য মিলন থেকে জন্ম নেবে। আজকের এই অস্পষ্ট প্রভাতে, আমি সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের দীপ্ত দুপুরকে অভিবাদন জানাই।

১৯৩৮ সালে সুইটজারল্যান্ড ছেড়ে দীর্ঘ পনেরো বছর পরে ফ্রান্সের ভেজলে-তে ফিরে আসার মুহূর্তে রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'ইন্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের বুলেটিন মাঝে মাঝে আমার হাতে আসে, সেখানে আমি সর্বদাই মুক্তি ও সুবিচারের জন্য সংগ্রামের তালিকায় সবার উপরে আপনার মহান নামটি দেখতে পাই। আশা ও আনন্দের কথা, ফরাসি দেশ জেগে উঠছে, তার একতা, শক্তি, মানবিক কর্তব্য সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে উঠছে। কিন্তু ফ্রান্সে যদি ভিক্তর হ্যুগোর মতো এক মহান কবি থাকত, অথবা আপনার মতো!'

হয়তো পুরো ছবিটি না পাওয়ার জন্য, রলাঁ সুভাষচন্দ্র বসু (যাঁর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ

১৯৩৫-এর এপ্রিলে) ও ইউরোপে যুদ্ধের বিনিময়ে তাঁর ভারতীয় বিজয়ের স্বপ্ন সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর *ভারতবর্ষ* দিনপঞ্জি শেষ হচ্ছে সুভাষের ভয়ংকর খামখেয়ালিপনার নিন্দা করে, যদিও এক সময় তাঁর আন্তরিকতা রলাঁর ভালো লেগেছিল। 'চন্দ্র বোস বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছেন। — আরও একবার তিনি ঝাঁপ দিলেন। এই দক্ষিণে, এই বামে। মস্কো, বার্লিন, টোকিয়ো...এই উগ্রস্বভাব আবেগপ্রবণ বাঙালিদের কখনও যুক্তির রাজনীতি ছিল না। এদের রোষ, এদের ঈর্ষার দমক, এদের অহমিকা এদের জ্বালা করা ক্ষতে দপ করে জ্বলে জ্বলে ওঠে।' (মে ১৯৪২, *ভারতবর্ষ*, অনু. অবন্তীকুমার সান্যাল, র‍্যাডিকাল, ১৯৭৬, পৃ ৫০৪।)

১৯৪৩-এ জীবনের অন্তিম লগ্নে ভারতীয়দের সম্পর্কে রলাঁর শেষ মন্তব্যের তিক্ততা মুছে ফেলা যাবে না : 'তাঁদের উদ্‌বেগ শুধু তাঁদের স্বদেশের জন্যই। আর তাকে স্বাধীন করার জন্য সমস্ত পন্থাই তাদের কাছে সৎ, এমনকী অপরকে শৃঙ্খলিত করাও'। (ওই, পৃ: ৫০৪।)

১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম চিঠির একুশ বছর বাদে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে তোলপাড় করে দিচ্ছে, রলাঁ তাঁকে লিখলেন :

> বিছানা থেকে বহু দূরে আমি দেখতে পাচ্ছি সূর্য উঠছে।
> যুদ্ধ কী একা করে দেয় আমাদের!

১৯৪০-এর ১০ এপ্রিল লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ চিঠি রলাঁর হাতে পৌঁছোয়নি। নাকি সেটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়? ফ্রান্সে জার্মান অধিকারের ভয়ংকর অন্ধকার দিনগুলিতে কী ভাবছিলেন রলাঁ? ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবর তিনি পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর দিনপঞ্জিতে এর কোনো উল্লেখ নেই।

একবিংশ শতাব্দীর ভাঙাচোরা মানচিত্রে রম্যাঁ রলাঁর নিজস্ব কোনো ঘর নেই, ফ্রান্সে তো নেই-ই। এর কারণ কি তিনি ফরাসির চেয়েও বেশি করে 'বিশ্বনাগরিক' বলে (যা অনেক বড়ো বড় ফরাসি সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে বলা যাবে না)? আঁদ্রে মালরোর ভাষায়, 'ভিক্তর হ্যুগোকে বাদ দিলে রম্যাঁ রলাঁকে কল্পনা করা যাবে না। তিনি যে প্রশংসা ও আক্রমণ প্ররোচিত করেছিলেন তাকে আমরা কোনোদিনও বুঝতে পারব না, যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারছি যে তিনি ছিলেন মহান ফরাসি রোম্যান্টিকদের শেষ প্রতিনিধি'।

রলাঁ ও ভারতবর্ষের এই সংলাপ এক পুরাণ-প্রাচ্যের সঙ্গে এক পুরাণ-পাশ্চাত্যের মিলন নয়। এক ধোঁয়াটে 'অন্যে'র সঙ্গে ছদ্ম-কথোপকথন নয়। ভারতের প্রতি রলাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাঁকে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদীর থেকে পৃথক করে দিয়েছে। সঈদ-কথিত 'প্রাচ্যবাদী' বচনের 'আকাঙ্ক্ষা ও পুরাণীকরণ' বেশির ভাগ পশ্চিমির রচনাকে নষ্ট করে দিয়েছে, একপেশে করেছে মানব-ইতিহাসকে।

এ এক হঠাৎ-দেখা, কৃত্রিম আলাপচারি নয়, প্রসাধনী শব্দ-বুনন নয়। এই সংলাপের খাঁজে খাঁজে নির্ভেজাল অশ্রুবিন্দু দুর্লভ মুক্তোর মতো লেগে রয়েছে।*

---

* ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনে আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ ও ৩রা জুন ২০০২ ফ্রান্সের বুল্যান-বিয়াঁকুরের পৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ। মূল বক্তৃতা দুটি যথাক্রমে ইংরেজি ও ফরাসিতে প্রদত্ত।

মালার্মে সম্পাদিত মহিলাদের ফ্যাশন পত্রিকা *লা দেরনিয়ের মোদ*-এর প্রচ্ছদ

মালার্মে সম্পাদিত ও প্রকাশিত মহিলাদের পত্রিকা

কমলেশ চক্রবর্তী

আমরা, যাদের কাছে মালার্মে নামটা কাব্যে বিশুদ্ধতার প্রতিকল্প তাদের শ্রবণে এই প্রবন্ধের শিরোনাম কেবলমাত্র কৌতূহল উদ্রেক করবে না বিস্ময়াবিষ্টও করবে। এমনকী অবিশ্বাস্যও বোধ হবে। আমাদের সামনে এই কবির যে-চরিত্রটি প্রকাশমান তা হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়ানো, চিন্তামগ্ন অথবা দৃঢ় প্রত্যয়ে বিরতিহীন বাক্যবিস্তার করছেন কবিতার নানা সমস্যা নিয়ে। মালার্মে ছিলেন বিদ্যালয়ের বীতশ্রদ্ধ তথা ক্লিষ্ট ইংরেজি শিক্ষক। শতাধিক বৎসর অতিক্রমের পর আজ আমাদের মনে হয়, মালার্মে, যাঁর কবিতা অনুধাবনে আমাদের সতর্ক জিজ্ঞাসাও অপরাক্রান্ত, তিনি কোন্ আবেগের তাড়নায় ৩২ বছর বয়সকালে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে নিজের বহুকথিত সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি আরও একবার সাময়িকভাবে বর্জন করে তাঁর জীবনের অন্য একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা — অর্থাৎ সমাজের বিলাসী রমণীদের জন্য একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করলেন। মালার্মে তাঁর নানা চিঠিতে এই পরিকল্পিত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াসের উল্লেখ করেছেন। এ-কথাও সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত করেছেন যে ঋতুপ্রকোপ, শিক্ষাকর্মের অনীহা, শারীরিক অপটুতা এবং কলমের দুর্নিবার বন্ধ্যাত্ব এই রচনাকর্ম থেকে তাঁকে বিরত রেখেছে। বিবৃত করেছেন সেই আক্ষেপ যা একমাত্র অভিপ্রেত সন্তানের জন্মদানে অক্ষম মাতার আর্তনাদের সমতুল। কখনও কখনও পরিবর্তে রচনা করেছেন আশ্চর্য মহৎ নির্দেশপ্রাপ্ত কবিতা, কোনো উপলক্ষ অলংকৃত করবার জন্য। বস্তুত মালার্মের অপরিসর কাব্যশরীরে সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে সেইসব কবিতা যা বুদ্ধি ও বোধি নির্মিত এবং যথার্থ অর্থে আনুষ্ঠানিক। আমাদের কোনো দ্বিমত হওয়ার সম্ভাবনা নেই যে এই কবিতাগুলি সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য ব্যতিক্রম। পাঠকের সদা জাগরূক স্মৃতি উদ্দীপিত করার জন্য উল্লেখ করতে চাই তাঁর গোতিয়ে, বোদলেয়ার, এডগার অ্যালান পো — অনুরূপ সব কবিতা। অর্থাৎ মালার্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির যেমন ব্যত্যয় ঘটেছিল নানা কারণে তেমনই ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় কাব্যকর্ম পরিহার করে মনোযোগ স্থাপন করলেন একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশের কাজে যার বিষয় সমকালীন ফরাসি জীবনের সকল সৌন্দর্যপ্রিয়তা যার অন্তর্গত যেমন শিল্পকলা, সাহিত্য তেমনই মহিলাদের ব্যবহার্য পোশাকের রুচিসম্পন্ন উদ্ভাবনা, আহার্য প্রস্তুতের কারুকলা, গৃহসজ্জা, এর সঙ্গে আরও সবকিছু যা আমরা প্রবন্ধের অগ্রসরমানতায় উল্লেখ করব। এই পত্রিকাটির নাম — *লা দেরনিয়ের মোদ: গাজেত দু মোঁদ এ দ লা ফামিই* অর্থাৎ শেষতম ফ্যাশন : সমাজ এবং পরিবারের জন্য পত্রিকা।

১৮৭৪-এর ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্বিমাসিক ঘোষণা সত্ত্বেও স্তেফান মালার্মের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মোট আটটি সংখ্যা। অবশ্য এই পত্রিকার মলাটে, যা অত্যন্ত মনোযোগের দাবি রাখে, মালার্মের নামের পরিবর্তে মুদ্রিত থাকত ডিরেক্টর — মারাসকুই। মালার্মের এই পত্রিকাটির ক্ষেত্রে অনেকগুলো ছদ্মনামের মধ্যে একটি। দুই মলাটের মধ্যে তিনি কখনও পরিগ্রহ করেছেন মারগ্যারিৎ দ্য পোঁতি — যে-নাম লা মোদের প্রখ্যাত

স্তম্ভ রচয়িতার, আই.এস্স, অর্থাৎ নিষ্কর্মা শহুরে বাবু — তিনি লিখছেন প্রকাশিত পুস্তক আলোচনা, নাটক, শিল্প সমালোচনা 'পারির ধারাবিবরণী'-র জন্য; শ্রীমতী সাত্যাঁ — যিনি 'ফ্যাশন বিষয়ক পত্রিকা-র' সমাজের উঁচু মহলের মিশ্রিত বিষয়সমূহের ভাষ্যরচয়িতা; আর নামহীন লেখক যিনি পরিবেশন করেন নিখুঁত অভিজাত খাদ্যসম্ভারের রসনাসিক্ত বর্ণনা। 'স্বর্ণালি নোটবই'-এ, থাকত রুচিবান জীবনযাপনের নানা টুকিটাকি ইঙ্গিতসমূহ। কে জানে মালার্মে সমকালীন প্রখ্যাত ইন্টিরিয়র ডেকরেটর মারলিয়ানির স্থান নিয়েছিলেন কি না তাঁর পত্রিকার প্রয়োজনে! এটি লক্ষণীয় যে-কেবলমাত্র প্রতিটি সংখ্যার শেষ মলাটে খুব সাদামাঠাভাবে মুদ্রিত হত স্তেফান মালার্মের নাম — যাঁর কাছে, অনুরোধ থাকত, পুস্তক, নাটক, ভ্রমণ, সমাজ এবং এমনকী চারুশিল্প-বিষয়ক সকল সংবাদ প্রকাশার্থে প্রেরণ করবার। এই মালার্মের পরিচিতি মুদ্রিত হত পত্রিকাটির সংবাদদাতা হিসেবে।

বস্তুত, পত্রিকাটির সাহিত্য নামক অংশটি ভিন্ন, সেখানে তাঁর বান্ধবরাই অধিকাংশ রচনা অর্থাৎ কবিতা এবং ছোটোগল্প প্রেরণ করতেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন, *থিয়োদোর দ্য বাঁভিল, ফ্রাঁসোয়া কোপে, আলফোঁস দোদে, সুলি প্রুদোম, লেয়ঁ ভালাদ* এবং অন্য আরও অনেকে — এ ভিন্ন *লা দেরনিয়ের মোদ* পত্রিকাটির প্রথম মলাট থেকে শেষ মলাট পর্যন্ত মুদ্রিত সকল রচনারই লেখক ছিলেন মালার্মে নিজে।

একজন তারল্যবর্জিত, গুরুভার, অসামান্য দুর্বোধ্য তথা মার্জিত কবি স্তেফান মালার্মের নামের সঙ্গে যুক্ত একটি চপল ফ্যাশন পত্রিকা সর্বদাই পাঠকদের বিমূঢ় করেছে তাঁর ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত অসাধারণ সাহিত্যজীবনে এক বন্ধুর চর্চা হিসেবে। মালার্মের ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব অথবা পরবর্তী জীবনের ধ্রুপদি পৌরাণিক উপকথার ক্ষেত্রে পরিব্রাজনের তুলনাও অধিকতর বিস্ময়কর ঘটনা মনে হয়েছে। পোল ভেরলেন মালার্মের কাছে তাঁর জীবনের কথা জ্ঞাপন করার অনুরোধ জানান সমকালীন জনপ্রিয় সংকলন, যার নামকরণ করা হয়েছিল—লেজোম দোজুরদুই অর্থাৎ 'আজকের মানুষ'-এ প্রকাশের জন্য। মালার্মে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বর এই রচনাটি প্রদান করেন: 'আর্থিক অনটনের সময় অথবা ক্ষুদ্র একটা বাইচের নৌকো কেনার জন্য (ছোটোদের জন্য), আমাকে কোনো না কোনো সাধারণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত এবং অন্য সবকিছু পরিত্যাগ করে (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রাচীন দেবগণ'), ইংরেজি শব্দভাণ্ডার (১৮৭৭), এইসব বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল; কিন্তু এইগুলোর ব্যতিরেকে, প্রয়োজনের প্রতি বদান্যতা — তৃপ্তি সহযোগে — যা কিছু তাও খুব অধিক নয়। এক সময়ে, তৎসত্ত্বেও, দুর্দমনীয় গ্রন্থের হতাশাপূর্ণতা যা আমি আমার মন থেকে বিমুক্ত করেছিলাম, প্রচেষ্টাও ছিল, এখানে ওখানে কিছু কিছু নিবন্ধ পরিবেশন করার পর, নিজ দায়িত্বে সম্পূর্ণটা সম্পাদনা করে, — পোশাকপরিচ্ছদ, অলংকার, আসবাব এবং এমনকী নাট্যকলা, তথা নৈশভোজের পরিবেশনসামগ্রী — একটা পত্রিকা, *লা দেরনিয়ের মোদ*, যার আটটি বা দশটি প্রকাশিত সংখ্যা যা আজও আমাকে উদ্দীপিত করে, যখন আমি সেগুলো ধূলিমুক্ত করতে বসি, তখন দীর্ঘ সময় আমি এটার বিষয়ে স্বপ্নাবিষ্ট থাকতাম।'

যাই হোক মালার্মের কাব্যশরীরের প্রান্তসীমানায় *লা দেরনিয়ের মোদ* যদি আবির্ভূত হয়, তবে তা তাঁর কাছে স্বপ্নাবিষ্টতার একটি উৎস হিসেবেই বর্তমান এবং আপাত আত্মাভিমান পত্রিকাটির বন্ধ হওয়ার অনেক পরেও অনুরণিত হয়। এমনকী সেই প্রাগুক্ত মৌলিক

আত্মাভিমান তথা স্বপ্নাবিষ্টতার স্মৃতিচিহ্ন পাঠ তেমন দুরূহ হয় না যা থেকে মালার্মের ফ্যাশন বিষয়ক কাব্যিক সত্তা আমাদের উপলব্ধ হয়। কারণ যথার্থই, জাঁকজমকের জগতের ঔজ্জ্বল্য যা মালার্মে *লা দেরনিয়ের মোদ* পত্রিকার সংখ্যার পর সংখ্যার মধ্য দিয়ে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করতেন তা বস্তুত অধরা এক জগতের পরিপার্শ্ব, যেখানে অলংকারের দীধিতির অংশ গ্রহণ করে শব্দের মালা, বুননের সূক্ষ্মতা, নমনীয় পালকের স্বচ্ছতা, ব্যজনীর কম্পমান ধ্বনি, এবং কোনো ক্ষুদ্র অলঙ্কারের সম্মোহক তুচ্ছতা — সেইসমস্ত প্রতীক, যা আমরা লক্ষ করি মালার্মের নানা ভুবনবিদিত কবিতায় ঝংকৃত হতে।

এটাও যথার্থ যে *লা দেরনিয়ের মোদ* পত্রিকার অধিকাংশ বিষয়সিক্ত রচনা মহিলাদের সাম্প্রতিকতম পোশাকের বিষয়ে মনোনিবেশিত — প্রত্যেক সংখ্যায় পাঁচ থেকে ছয়টি ফ্যাশনের রেখাচিত্র, ভাষ্যসহযোগে এবং অন্তত একটি সম্পূর্ণ পোশাকের জীবনপদ্ধতি সন্নিহিত করা হত। এ ভিন্ন সাম্প্রতিকতম নাট্যপ্রচেষ্টা তথা সাহিত্য রচনা বিষয়েও মালার্মে তাঁর ভিন্নধর্মী পত্রিকায় পরিবেশন করতেন নিয়মিত। বস্তুত ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ফরাসি সাহিত্যের দ্বিমাসিক একটা তালিকাও পত্রিকায় পরিচিতি সহযোগে নিবেদিত হত এবং প্রকাশিত হত পরিচর্চার যোগ্য নির্ঘণ্ট। এই তালিকায় আমরা দেখতে পাই গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের 'লা *ত্যাঁতাসিয়োঁ দ স্যাঁৎ আঁতোয়ান*, আবার জুলে বার্বে দ্যোরভিলির *লে দিয়াবোলিক*' নামক প্রখ্যাত গ্রন্থ। এমনকী দেখা যাবে সমকালীন প্রধানতম গল্পের এবং কবিতার সংকলনগুলির অধুনাবিখ্যাত নাম। সে সব লেখক তালিকায় থাকতেন, বাঁভিল, কোপে, দোদে, জোলা এবং আরও অনেকে যাঁদের মধ্যে অনেকের নাম সাহিত্যের সংযমী ইতিহাস থেকে কালক্রমে অপসৃত। কারও কারও নাম আমাদের ন্যায় সাম্প্রতিক পাঠকের অজানিত। সম্পাদক হিসেবে তৎকালে মালার্মের ন্যায় শাসনপটু কবির নিকট হয়তো-বা পাঠযোগ্যতার প্রশংসাপত্র লাভ করেছিল। আজ যদি আমরা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' অথবা বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্র' নামক পত্রিকাদুটির পুরাতন সংখ্যাগুলি পুনর্বার দেখি তবে আমাদের উক্তির যথার্থতা অনুমিত হবে। মালার্মে, তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, এই পত্রিকার পক্ষ থেকে সাহিত্যবিচারের পরিমাপনীয়তার সূত্রগুলি *লা দেরনিয়ের মোদ* কাগজের প্রথম সংখ্যায় নিবেদন করেছেন রহস্যময় ছদ্মনামে — 'IX' অক্ষরদ্বারা যা পরিচিত। বস্তুত আমরা ইংরিজিতে এবং সম্ভবত সাম্প্রতিককালে বাংলা কথ্য ভাষায় 'এক্স' অক্ষর দ্বারা যা বোঝাতে চাই আর এই মালার্মে ব্যবহৃত অক্ষরযুগলের উচ্চারণ উভয়ই অনুরূপ — 'এক্স', অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক সর্বোৎকৃষ্ট স্বাক্ষর। যুগে যুগে পাঠকদের মধ্যে যাঁরা মালার্মের রচনার সঙ্গে অধিকতর পরিচিত, যাঁরা তাতে আছেন তাঁর ক্রীড়াপ্রিয়তা ছদ্মনামের সংকেতপূর্ণ অপ্রকাশিতাবস্থা নিয়ে। কারণ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই মালার্মে তাঁর অনেকানেক বন্ধু তথা অনুরাগীদের ধন্দ উৎপাদন করেছিলেন তাঁর সেই খ্যাতি অর্জনকারী রহস্যময়, অনাম্নী, কাব্যিকপ্রচেষ্টা যা সেই সময়ে পরিজ্ঞাত হয়েছিল 'Sonnet in-ix' নামে, যা তাঁর 'ওভরে'-র অন্তর্গত হয়েছিল, তার দ্বিতীয় স্তবকের জন্য :

শূন্যঘরের দেরাজে : নেই কোনো অনাম্নী
বিলোপিত তুচ্ছতা ফাঁপা নাসিকা নিনাদে।

এখানে গভীরতর এমন ইঙ্গিত রয়েছে যা বস্তুত পারির সপ্রতিভ বিবরণীকারদের সঙ্গে মালার্মের রহস্যমণ্ডিত সংযোগের তুলনায়ও অধিকতর প্রশ্নাকুল। মালার্মে এই পন্থার বক্রোক্তি আনয়ন

করেছেন তাঁর আপন নিবিড়, ছিদ্রহীন রুদ্ধ কবিতার সঙ্গে রূপময় অথচ অর্থহীন তুচ্ছতার অর্থময় তুলনার দ্বারা। এই ফ্যাশন পত্রিকা যেখানে তাঁর খোশগল্পরচনাকারী চরিত্র ছড়ানো থাকত এই 'IX' ছদ্মনামের রচনার ভাষা বক্রোক্তির তীব্রতা অধিকতর বৃদ্ধি করত। আমরা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর যে-সংখ্যায় 'ক্রোনিক দ্য পারি' নামে রচনাটি মালার্মের ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি অংশ ভাষান্তরে উদ্ধৃত করতে চাই সেই স্বাদ গ্রহণের জন্য :

> অবশ্যই বলতে গেলে, মনের সৃষ্টি, সর্বদাই সমসাময়িকতার প্রচল রুচির অনুসারি...তবে এই এরকম একটি সংকলন (কাব্যের) টিকে থাকুক আটদিন পর্যন্ত, অর্ধ উন্মুক্ত, ঠিক যেন এক বোতল সুগন্ধি, কল্পনাপ্রসূত রেশমি গদিতে সুচিশিল্পের উপর; এবং অন্য সংকলনটি (গল্পের) এই অভীক্ষাক্ষেত্র থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যাক কোনো একটি ভারীসারি আলমারির লাক্ষামণ্ডিত উপরিভাগে — হাতের কাছে রাখা অলংকার পেটিকা, তালাবন্ধ পরবর্তী অনুষ্ঠেয় পার্টি পর্যন্ত: এটাই আমাদের বিচারের সহজতম পদ্ধতি।

ক্ষীণ হয়ে আসা 'শেষতম ফ্যাশন'-এর পরিমণ্ডলে সাহিত্যের প্রসবিত উপাদানসমূহ আপনাপন স্থান দখল করে মহিলাদের সুগন্ধি, রেশম এবং অলংকারের একান্ত কক্ষের জগতে। এটা এমন বিস্ময়জনক নয় যে মালার্মে-বর্ণিত সেইসব গোপন জগতের সূক্ষ্ম তারতম্য প্রায়শই তাঁর ভুবনবিদিত কবিতাসমূহের বাক্যগঠনবিধিতে এবং রূপকালংকারে প্রতিবিম্বিত হয়। তাঁর বর্ণিত পোশাক-আশাকের নবতম ব্যতিক্রম এমন এক ধরনের শারীরিক সুখানুভূতির অভিজ্ঞা প্রদান করে যা কেবলমাত্র তৎকালীন অলংকৃত সেফটিপিন, হাতপাখা, কেশবিন্যাস অথবা শিরাবরণের নামগুলির উচ্চারণের মধ্য দিয়েই লাভ হত। যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি কবিতায়, পোশাকের প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খতা, এবং সেই পোশাকের প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খতার বর্ণনা, পরিকল্পিত হয়েছিল বাস্তব কোনো উপাদানের স্বল্পতম উদ্ধৃতির প্রয়োজনে, পক্ষান্তরে কোনো ঐন্দ্রজালিক, পলায়নপর সম্পূর্ণতার অভিঘাতকে উপস্থাপন করার জন্য। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে বাল্যবন্ধু আঁরি কাজালিসকে লিখিত পত্রে যেমন বলেছেন : 'কোনো বস্তুর অঙ্কনের প্রয়োজনে নয়, পক্ষান্তরে তা যে-প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে তার জন্য'। অধিকাংশ মালার্মে পাঠকের নিকট মালার্মের অধিকতর মনোযোগী রচনাসামগ্রীর সঙ্গে তাঁর পত্রিকা *লা দেরনিয়ের মোদ*-এ প্রকাশিত ছদ্মনামাঙ্কিত রচনাবলি অধিক সরল হিসেবে গ্রাহ্য হয়। যদিও মালার্মে 'বান' নৃত্যে পরিধেয় বিশেষ পোশাকের মহিমা বন্দনায় লিখছেন, পত্রিকার ১৫ নভেম্বরের সংখ্যায়: ''আলোর প্রবেশের জন্য, গাগনিক এবং বায়ু সঞ্চারিত, খুবই উঁচু স্তরের সঞ্চালনের জন্য যাকে বলা হয় নৃত্যকলা, স্বর্গীয় যা তাদের অলীকতায় উপস্থিত'। এখানে এমন একশ্রেণির যুক্তিময়তা বিদ্যমান যা কোনো কোনো মালার্মে-বিশেষজ্ঞ আখ্যা প্রদান করেছেন 'মালার্মের কাল্পনিক ভুবন'। এর থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে মালার্মের অটল মননিবেশ সাজগোজের উপাদান-সমূহে এবং তৎসহ তাঁর সমসাময়িক সাজগোজের পরিমণ্ডলে যা বস্তুত উনিশ শতকীয় ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্তিসংগত ভাবে যুক্ত। অর্থাৎ সাধারণ নিয়মানুগত্যতায় সমকালীন ফরাসি সাহিত্যেই পরিচর্চিত। বালজাকের উপন্যাসসমূহে যা বস্তুত ১৮৩০ থেকে প্রকাশিত ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর প্রয়াণ পর্যন্ত, সমকালীন পরিবর্তনশীল ফরাসি অভিজাত সমাজের বিভব তথা প্রভাব অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ পোশাক-

আশাকের বর্ণনায় পরিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দেই বালজাক বেশ কয়েকটি মজাদার এবং প্ররোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যাতে আধুনিক ফরাসি সংস্কৃতির অবয়বে সাজগোজের অভিলাষিত গুরুত্ব আরোপিত করেছেন। সেইসব প্রবন্ধের নাম পাঠকের স্মৃতি জাগরিত করার জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে : 'দে মো দ্য লা মোদ' অর্থাৎ 'সাজগোজে ব্যবহৃত শব্দমালাবিষয়ক', 'ফিজিয়োলোজি দ্য লা তোয়ালেত' অর্থাৎ 'পোষাকের শারীরবৃত্তি' এবং 'ত্রেতে দ্য লা ভি এলেগাঁত' অর্থাৎ 'মার্জিত জীবনযাপন-বিষয়ক নিবন্ধ'। এমনকী মালার্মের অব্যবহিত পূর্বসূরিদের মধ্যে তেয়োফিল গোতিয়ে এবং শার্ল বোদলেয়ার সদ্য সূচিত উনিশ শতকীয় কাব্যধারায় সাজগোজের অধিকতর বর্ণিল উদাহরণসমূহের অবতারণা করেছেন।

এঁদের মধ্যে গোতিয়ে ছিলেন দুই পুরুষের ফরাসি কবিকুলের গুরুস্থানীয়। আর সেই কারণে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যখন গোতিয়ের প্রয়াণ হয়েছিল তাঁর অভিঘাত, অপূর্ণতা অধিকাংশ ফরাসি কবিদের নিকট সহ্যাতীত বলে মনে হয়েছিল। মনে রাখতে হবে ফরাসি কবিতার পরিবর্তনের সূচনা যে-গ্রন্থের সংকলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত, সেই কাব্যগ্রন্থটি, শার্ল বোদলেয়ারের *লে ফ্লর দু মাল*, তিনি সমকালীন কবিতার পুরোহিত গোতিয়েকে উৎসর্গ করেছিলেন। এমন অনেক কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে যা গোতিয়ের নানা রচনার ছায়াশ্রিত। গোতিয়ের মহাপ্রয়াণে তরুণতর স্তেফান মালার্মে পর্যন্ত যুক্ত হয়েছিলেন তাঁর অন্যান্য কবিবন্ধুদের সঙ্গে, এই কবি যাঁকে তাঁরা গুরু হিসেবে শিরোধার্য করেছিলেন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এক অত্যন্ত মূল্যবান কবিতা, 'তোস্ত ফুনেব্র্' রচনার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনে। এটাও একটা ঐতিহাসিক সত্য যে মালার্মে তাঁর সাজগোজের কাগজ *লা দেরনিয়ের মোদ* প্রকাশ করার পূর্বে তাঁর সর্বশেষ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, 'তোস্ত ফুনেব্র্'। আপাত অশ্রদ্ধা এই ঐতিহাসিক সত্যে প্রমাণিত হলেও এরচেয়ে অধিকতর গভীর বশ্যতার নিদর্শন গোতিয়ের প্রতি প্রদর্শিত হওয়া সম্ভব ছিল না তরুণ কবির পক্ষ থেকে, অন্ত্যজ কবির অন্ত্যেষ্টির নিবেদন থেকে, সাজগোজের মহিমাকীর্তনে নিবেদিত না হয়ে। হয়তো-বা তেয়োফিল গোতিয়ে ভিন্ন অন্য কবি বা সাহিত্যিকের সন্ধান পাওয়া যাবে না যিনি ফ্যাশনের জগতের সঙ্গে 'উঁচু' শিল্পের স্বজাতীয়তা তাঁর মতো স্থির নিশ্চিত করে মেনে নিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে গোতিয়ে ছিলেন সর্ববাদীসম্মতিতে আধুনিক কবিদের আদিপুরুষ এবং প্রথম 'পারনাস কোঁতাঁপোর‍্যাঁ'-এর প্রধানতম কবি। যদিও তিনি একদা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ভুবনবিদিত 'এরনানি' যুদ্ধে, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমেদি-ফ্রাঁসেজ-এ, লাল জোব্বা পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন, তৎসত্ত্বেও তিনি ক্রমাগত রোমান্টিকতার পরিস্রাবনের প্রতি সমালোচনামুখর হয়ে উঠছিলেন, যে পরিস্রাবণ স্বপ্নদ্রষ্টতার পরিচর্যায় নিবেদিত বলে জ্ঞান করছিল কবিতাকে। তিনি প্রকাশ করতেন বিষণ্ণ বিলাপ শিল্পের উপযোগীবাদের সপক্ষে, তা সে সমাজতন্ত্রী অথবা অভিজাত শ্রেণিগত হোক না কেন, তাঁর মতানুসারে শিল্পের কার্যকারিতা হয়ে উঠতে হবে সৌন্দর্যের তপস্যা এবং চমকিত হওয়ার মতো, অপ্রতর্ক। এই কথাগুলিই তিনি লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাস, ১৮৩৫-এ প্রকাশিত, *মাদমোয়াজেল দ মোপ্যাঁ*-র ভূমিকায় : 'কোনো কিছুই বাস্তবিকভাবে সুন্দর নয় যদি না সেটি অপ্রয়োজনীয় হয়; যা কিছু প্রয়োজনীয় তাই কুরূপ, কারণ তা প্রয়োজনকে প্রকাশ করে, এবং মানুষের প্রয়োজন যথার্থই ইতর তথা বিরক্তিকর, যেমনটি তার অপুষ্ট দুর্বল প্রকৃতি। গৃহের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থান অবশ্যই শৌচাগার। আমার কাছে ...আমি তাদের মধ্যে একজন

যার কাছে অপর্যাপ্ততাই একান্ত প্রয়োজনীয়...আমি পছন্দ করি এক বিশেষ ধরনের পাত্র, একটি চিনে পাত্র যাতে চৈনিক অলংকরণ ও ড্রাগনের চিত্র অঙ্কিত থাকবে'। এর ঠিক তিরিশ বৎসর পর তরুণ স্তেফান মালার্মে তাঁর বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন তেয়োফিল গোতিয়ের অনুগামিতায়। 'লা পারনাস কোঁতাঁপোরাঁ' সঙ্কলনে যেসব কবিতা গৃহীত হয়েছিল, 'আ আঁ পোভর'' অর্থাৎ 'দরিদ্র মানুষ', যাতে কবি একজন ভিক্ষুককে অর্থ প্রদান করছেন এই শর্তে যে এই অর্থের বিনিময়ে সে রুটি ক্রয় করতে পারবে না; অথবা তাঁর 'অনিন্দ্যসকল' কবিতায় জীবনের দিকে পশ্চাৎ প্রদর্শন, অথবা, অন্য কবিতাটি যা তখন প্রকাশিত হয়েছিল 'এপিলোগ' নামে এবং পরবর্তীকালে যার নামকরণ করেন, 'লা দ লাসের রেপোজ...' অর্থাৎ 'তিক্ত বিশ্রামে ক্লান্ত....' যাতে 'অতিরিক্ত লোভাতুর শিল্প' পরিত্যাজ্য জ্ঞানে চৈনিক পেয়ালায় সূক্ষ্ম অঙ্কনের এষণা প্রকাশ করেছেন।

এক হিসেবে গোতিয়ে, যিনি সাজগোজের আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যে স্থায়ী আসনের উপযোগী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তিনিই অন্যদিক থেকে আবার ভবঘুরেপনার প্রবর্তক, তাঁর সমকালে নতুন করে নির্দেশিত করার প্রচেষ্টা লাভ করেছেন। তাঁর একটি পৌর, বিদ্রূপাত্মক কাহিনীতে, তিনি ড্যান্ডি বা ভবঘুরেকে কেবলমাত্র অন্তঃসারশূন্য ইংরেজপ্রেমী বাবুয়ানিপ্রিয়তা থেকে পরিবর্তিত করেছেন প্রায় একজন কান্তিবিদ্যক বিদ্রোহী তথা বুদ্ধিনির্ভর নায়কে। গোতিয়ে বস্তুতপক্ষে ড্যান্ডিকে এক নবতম অভিজাত রুচিসম্পন্নতার প্রতিভূ হিসেবে উপস্থাপনা করেছিলেন যা তার আপন সৌন্দর্যময় পুঙ্খানুপুঙ্খতার প্রতি শ্রদ্ধাময়তায় বুর্জোয়া সমাজের আকাঙ্ক্ষিত উপযোগবাদী মূল্যবোধের বিরোধিতা করেছে। গোতিয়ে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'দ্য লা মোদ' অর্থাৎ 'সাজগোজসম্বন্ধীয়' পুস্তিকায় ফ্যাশনকে বর্ণনা করেছিলেন আধুনিক জগতের পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের পরিমাপ হিসেবে। তিনি তাঁর এই প্রবন্ধে সেইসব চিত্রশিল্পীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যাঁরা তাঁদের আপনাপন চিত্রের উপকরণ মডেলকে সমকালীন পোষাকে সজ্জিত করাটাকে যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করেননি কারণ আধুনিক পোশাক ধ্রুপদী পোষাকের আদর্শের তুল্য হয়ে ওঠেনি। গোতিয়ে যে কেবল সমকালীন পোশাকের সাধারণ মানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞান করেছেন তাই নয়, এমন কী দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অসংযত পোষাকের নীতিভ্রষ্টতাও তিনি প্রশংসার যোগ্য জ্ঞান করেছেন। স্তুতি জ্ঞাপন করেছেন সাধারণ মাপের তুলনায় অধিক অধিকতর ঘাগরার : 'কপালের দোষে আমাদের কোনো একজন সমকালীন চিত্রশিল্পী নেই, তাঁরা মনে হয় যে আমাদের সময়ে জীবন যাপন করেও কোনো এক অতি প্রাচীনকালের মানুষ হিসেবে থেকে যান, খুবই প্রাচীন ... তাঁরা যে একধরনের পূর্বপরিকল্পিত সৌন্দর্যের নমুনায় বিশ্বাসী, এবং ফলে আধুনিক আদর্শ তাঁদের নিকট অপরিকল্পিত।' এর থেকেই অনুমিত হচ্ছে, গোতিয়ের নিকট আধুনিক শিল্পের আদর্শ আধুনিক সাজগোজের সপ্রশংস অনুসরণে নিবদ্ধ হওয়া উচিত। ফরাসি সাহিত্যে প্রথম প্রধানতম সাহিত্যরচয়িতা হিসেবে তিনি যে সবার পূর্বে 'ঘাগরা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন কেবল তাই নয়, গোতিয়েকে এমন অভিধা প্রদান করা হয় যে তিনি ঊনবিংশ শতকীয় নতুন অর্থে ব্যবহৃত পুরাতন শব্দ 'লা মোদে রনিতে' অর্থাৎ আধুনিকতা, সাহিত্যে আনয়ন করেন। এই শব্দটি স্মরণে রাখতে হবে, 'লা মোদে' অর্থাৎ ফ্যাশানের পরিমণ্ডলে গভীরতর রূপে স্থিতিস্থাপক।

স্মর্তব্য যে ফ্যাশন ও আধুনিক যুগোপযোগী শিল্পকলার মধ্যে যে একনিষ্ঠ যোগ, সে-বিষয়ে গোতিয়ে যত না উচ্চকণ্ঠ তার চেয়ে অধিকতর ছিলেন স্তেফান মালার্মে, যোগ্যতর অগ্রজ কবি শার্ল বোদলেয়ার। তাঁর *ল্য প্যাঁত দ্য লা ভি মোদের্ন* অর্থাৎ 'আধুনিক জীবনের চিত্রশিল্পী', ১৮৬৩-তে প্রকাশিত নিবন্ধে বোদলেয়ার তাঁর অগ্রজাত কবি গোতিয়ের সজ্ঞাপ্রতীম ফ্যাসন এবং আদর্শ সৌন্দর্যভাবনাকে আধুনিক শিল্পের নন্দনতত্ত্বীয় কার্যক্রম চিহ্নিত করেন, একজন অনুকরণীয় চিত্রশিল্পীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য একজন ড্যান্ডি হিসেবে তথা জনগণেশের মধ্যকার মানুষ যিনি ফ্যাশন থেকে আহরণকেই তাঁর 'অভিপ্রেত কর্ম' হিসেবে জ্ঞান করবেন, বিশেষ করে রমণীকুলের ফ্যাশনের পরিবর্তমান দেখানোপনা থেকে, আদর্শ কোনো সৌন্দর্যময়ীর দর্শন থেকে, যা বস্তুতপক্ষে চিরন্তন এবং ক্ষণজীবী সত্যের উদ্‌ঘাটন করবে:

"যদি কোনো ফ্যাশন অথবা কোনো পোশাকের ছাঁটকাট সামান্যতমও পরিশীলিত হয়, যদি গিঁট এবং কুঁচি ফিতে দিয়ে তৈরি ফুল দ্বারা পরিবর্তিত হয়, যদি টানটান অংশ দীর্ঘায়ত করা হয় গুছি করে, আর তা যদি যুক্ত হয় গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে, যদি কটির দিকটা উঁচু করা হয় এবং ঘাঘরাটা পূর্ণ হয়ে ওঠে, তবে যথার্থ নিশ্চিত হবেন যাতে তার শ্যেন দৃষ্টি অবশ্যই যত দূর থেকেই হোক না কেন তা লক্ষ করতে সমর্থ হয়েছে... এটা তো অনেক বেশি সহজ একবারেই নিশ্চিত হওয়া যে কোনো একটা কালের পোশাক-পরিচ্ছদের সম্পূর্ণটা কুরুচিপূর্ণ জ্ঞান করার চেয়ে নিজেকে নিয়োজিত করা, এর থেকে, সম্ভবত লুকোনো আছে সৌন্দর্যের যেসব রহস্যময় উপাদান তা পরিশ্রুত করে নেওয়ায় ফ্যাশন। বোদলেয়ার ঘোষণা করেছেন, তা অসংস্কৃত প্রকৃতিকে সংস্কৃত করার ক্রমান্বয় প্রচেষ্টা এবং চিরকালীন হিসেবে মান্য। এই কারণেই ফ্যাশনকে বিবেচনা করতে হবে, 'যা সর্বোত্তম তার স্বাদের লক্ষণ হিসেবে।' সুতরাং অনুমান করা যায় বোদলেয়ার আপন তুলনা অনুযায়ী, ফ্যাশন আর শিল্প এক সর্বজনীন অভীষ্টানুসারী — উৎকর্ষতায় অতিক্রান্ত স্থায়িত্বহীনতা তথা প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা মোহন বিভ্রমের দ্বারা; অথচ একই সঙ্গে উভয়ই সমকালীন কালের নীতির অন্তর্গত 'দ্রুতবিলীয়-মানতা', 'সাময়িকতা', 'আধুনিকতার' অংশীদার হবে। তা না হলে, বোদলেয়ার শিল্পীদের সাবধানবাণী শোনান— আপনি নিজেকে কিছুতেই বিমূর্ত তথা অনির্নীত সৌন্দর্যের অতল গহ্বরে পতন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না'। এটা অবশ্যই লক্ষণীয় যে, গোতিয়ে এবং বোদলেয়ার উভয়েরই ফ্যাশনের প্রতি বিবেচনাপূর্বক অনুভব এবং তার অনুষঙ্গ আধুনিক শিল্পের সম্পর্কে যা কিছু অভিভাষণ সবটাই চিরকলা নিয়ে। এমনকী স্তেফান মালার্মের ক্ষেত্রেও, ফ্যাশনের উদ্যানের ভ্রমণ সমসাময়িক কালের চিত্রশিল্পের আবিষ্কারের সঙ্গে ওতপ্রোত সংযুক্ত। কারণ বিশেষভাবে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যের 'আধুনিক আদর্শ' অথবা সংশ্লিষ্ট সব বিষয় এবং কেমন করে অথবা যথার্থই তাতে সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা প্রতিভাত কি না, এইসব প্রশ্নই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি দেশে প্রথম বাকবিতণ্ডার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এবং ১৮৭৪, 'লা দেরনিয়ের মোদ' পত্রিকার বছরেই, ফ্যাশন, আধুনিকতা তথা শিল্প এসবের ইতিহাসে উক্ত বিষয়ের আলোচনার এক গতি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, ১৫ এপ্রিল, ঠিক ১৮৭৪ -এর প্রথম সরকারি বৃত্তিপুষ্ট সালোঁর উদ্‌বোধনের দুই সপ্তাহ পূর্বে সমকালের প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী নাদারের পারি শহরের স্টুডিয়োতে একটা স্বাধীন চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন হয়েছিল যা শিল্পের ইতিহাসে প্রথম

ইম্প্রেসনিস্ট চিত্রের প্রদর্শন হিসেবে বিখ্যাত। এই প্রদর্শনীতে অংশ যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেক তরুণতর চিত্রী ছিলেন, এদগার দেগা, ক্লদ মোঁয়েত, বার্ত মোরিসোৎ, কামিই পিসারো, পিয়ের-অগুস্ত রনোয়ার এবং আলফ্রেদ সিসলে — যাঁরা প্রত্যেকেই সর্ববাদীসম্মত পুরোধা, আধুনিক চিত্রশিল্প আন্দোলনের পুরোহিত এদুয়ার মানের কর্মকাণ্ডে যথার্থ প্রভাবিত। একজন সমকালীন চিত্রসমালোচকের মতানুসারে, এইসব শিল্পীদের অঙ্কনচারিত্র একটি নবতম নামকরণে আখ্যাত করা যায় — ইম্প্রেসনিস্টস্, কারণ এঁরা নিজের নিজের চিত্রকর্মে ভূ-প্রকৃতি বিন্যস্ত করতে চাননি, কিন্তু যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তা হচ্ছে, 'ভূপ্রকৃতির দ্বারা যে-সংবেদন সৃষ্ট হয়'' তার নির্মিতিতে। অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য যে প্রদর্শিত চিত্রাবলির অনেকাংশেই দৃশ্যাবলির সংবেদন তথা শুদ্ধমাত্র দৃশ্যাবলি পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়েছে, প্রদর্শিত হয়েছে ভূদৃশ্যাবলি — উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, দেগার একটি অনন্যসাধারণ ছবি 'গ্রাম্য যাত্রা', যাতে প্রতিকৃত হয়েছে একটি সুদর্শন পরিবার এক শকটে, যা আবশ্যিকরূপে প্রতিবিম্বিত করতে চায় আধুনিক সুরুচি, বেশভূষার আড়ম্বর। চিত্রের বিষয় বর্জন করেও, ইম্প্রেসনিস্টিক শিল্পকলার প্রাথমিক কালে তাঁরা অনুমিত হয়, যেন মালার্মের কাব্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, 'কোনো বস্তুকে চিত্রিত করা নয়, কিন্তু যে-অভিঘাত তা সৃষ্টি করে' তারই দৃষ্টিগ্রাহ্য তুল্যমূল্য প্রতিবিম্বিত কর্মেই যেন নিবেদিত ছিলেন।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মালার্মে অবশ্য ইম্প্রেসনিস্ট চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে তখনও পরিচিত ছিলেন না, যদিও খুবই সম্প্রতি তিনি পরিচিত হয়েছেন এদুয়ার মানের সঙ্গে এবং বন্ধুতা লাভ করেছেন এই সমকালীন চিত্রশিল্পীদের অবিসংবাদিত গুরুর সঙ্গে। কিন্তু ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের এই কিংবদন্তিতুল্য প্রদর্শনীতে সকলের নিরাশার কারণ হিসেবে মানে অংশগ্রহণ করেননি। এবং অন্যপক্ষে তিনি নন্দনতত্ত্বীয় প্রতিক্রিয়াশীল সালোঁর প্রদর্শনীতে নিজের চিত্র প্রদান করে অংশভাগ গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমাংশে মানের চিত্রাবলি প্রায়শই অনুবাদিত হতো আধুনিক, পরিবর্তনশীল চারিপাশের সামাজিক ভূদৃশ্যের অভিঘাত হিসেবে। এটা যথার্থ যে ১৮৬০-এর প্রথমদিকে যখন মানে শার্ল বোদলেয়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তখনই তিনি মৌলিক তথা বিতর্কিত 'আধুনিক জীবনের চিত্রশিল্পী' আখ্যায় বর্ণিত হওয়ার কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সুতরাং যখন তিনি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনটি চিত্র সালোঁতে প্রদান করলেন তখন তারা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মানুগত্যে তাঁর মাত্র একটি চিত্র, 'ল্য সম্যাঁ দ্য ফের' অর্থাৎ 'রেল রাস্তা', গ্রহণ করল, দুটি চিত্র শাস্তি হিসেবে বর্জন করে। রক্ষণশীল বিচারকগণ এই ছবিটি গ্রহণযোগ্য জ্ঞান করলেও ভাগ্যের প্রবঞ্চনায়, ছবিটি, যার বিষয়, একজন আদব-কায়দাদোরস্ত তরুণী নারী এবং সুন্দর পোশাকাচ্ছাদিত বালিকা যাদের পশ্চাতে রয়েছে আবছায়া আধুনিক ধূম এবং ইস্পাতের নমুনা, যে-ছবিটি সেই সময় থেকেই অত্যন্ত সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছিল রীতি তথা চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির দিক থেকে প্রাথমিক যুগের যথার্থ ইম্পেসনিজমের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে। মালার্মে এই অমনোনয়ন শ্রবণমাত্র শিল্পীর পক্ষসমর্থনে রচনা করলেন, 'ল্যাজুরি দ প্যাঁতুর পুর ১৮৭৪ এ ম. মানে' অর্থাৎ '১৮৭৪-এর চিত্রের বিচারক এবং মসিয় মানে' নামক একটি সঘৃণা প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে, যা *লা দেরনিয়ের মোদ* প্রকাশের মাত্র একমাস পূর্বে রচিত হয়েছিল, মালার্মে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন মানের দুইটি চিত্র, ল্যা বাল দ্য লোপেরা অর্থাৎ 'অপেরায় মুখোস পরিহিত বল নৃত্য'। যাতে চিত্রিত

হয়েছে অনন্যসাধারণ ''উচ্চশ্রেণীর জীবনধারার'' রূপ, যেখানে পারির জনতা জমায়েত হয়েছে কল্পিত প্রণয়ের উপযুক্ত পোশাক পরিহিতা রমণীদের চারিপাশ ঘিরে। বাতিল করার সিদ্ধান্তে মালার্মে এই চিত্রের বিষয়-সমর্থনে লিখলেন, 'আধুনিক জনতার চিত্রিত প্রদর্শনী', এবং উচ্চপ্রশংসা জ্ঞাপন করলেন মানের এই সমকালীন উৎসবের বিহ্বলচিত্রের রীতিগত সমন্বয়ের। এখানেও, লক্ষণীয়, আধুনিকতার আত্মা একজন শিল্পীর হাতে ধরা পরেছে যাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে ফ্যাশনের মনোহারিতায়।

এ-কথা যথার্থ যে বিশ্বসাহিত্যে খুবই কমসংখ্যক কবির সংযোগ লক্ষ করা যায় প্লাস্টিক আর্টসের সঙ্গে। এই সংযোগ অন্বেষণ অর্থহীন হবে যদি আমরা তার খোঁজ করি পোল ভেরলেন বা আর্তুর র‍্যাবোর ক্ষেত্রে। অথচ বোদলেয়ারের সজ্ঞাপ্রণোদিত অন্বেষণ অন্তত তাঁর সমকালের চিত্রশিল্পীদের বেলায় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকছে। অন্যপক্ষে স্তেফান মালার্মে যাঁর চিত্রশিল্পের বিষয়ে রচনাকালের কুটিল গতির ফলেও অসম্ভাব্যতা স্পর্শ পায়নি। পক্ষান্তরে সেইসব মহত্তম উক্তিসমূহ আমাদের যুক্তিবোধকে আজও উদ্দীপিত করে। অবশ্য মালার্মে সে-অর্থে খুবই সামান্য রচনা করেছেন চিত্রশিল্প বিষয়ে, অথচ যা কিছু তিনি লিখেছেন তা উদ্‌ঘাটিত করে এক অবিস্মরণীয় তুলনারহিত অন্তর্দৃষ্টি। এমন কথাও প্রচলিত আছে যে তিনি নগণ্য হলেও কখনও কখনও তাঁর সিদ্ধান্তে ভ্রান্তির অবকাশ রেখেছেন, তিনি ঘোষণা করেছেন পুভিস দ সাভানেসকে একজন মহাপ্রতিভাধর হিসেবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও মালার্মের যে-কাজ অধিকতর স্মরণযোগ্য তা হচ্ছে, যেমন তিনি কাব্যের প্রকৃতি নির্ণয়ে যা ভেবেছিলেন তাই তিনি চিত্রশিল্পের প্রকৃতি নির্ধারণে প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত তাঁর প্রবন্ধ, মানে বিষয়ে, তিনি লিখেছেন: ''কোনো একটা কাজকে কেমন করে বলা যাবে 'অধিকন্তু অতিশয়োক্তি', যখন, এই কাজের সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে, এক সংগতি বর্তমান, যা এই কাজটিকে ধরে রাখে আকর্ষিকতায়, যে-আকর্ষিকতা আর মাত্র একটি অতিরিক্ত তুলির টানে সহজেই ভেঙে যাবে? অধিকতর স্পষ্টভাষিত করলে, আমি এমন কথাও উচ্চারণ করতে পারি যে এই পরিমাপের অনুমান একটি চিত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, পূর্বপঠিত 'প্রভাবে'র অনুপাত যা এর-দ্বারা সৃষ্ট হয়, তা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে কোনোপ্রকার অতিশয়োক্তি সম্ভবত চিহ্নিত করতে সক্ষম, পরিপূর্ণ ক্ষমতাধিকারী অথবা অমনোযোগী যাই হোক না কেন...'। এর থেকে এমন বোধগম্য হয় যে মালার্মে দৃঢ়তার সঙ্গে যে-কোনো সৃষ্টির একসংখ্যকতায় সনির্বন্ধতায় আস্থাবান। তিনি মনে করেন এই গুণই কোনো সৃষ্টির মূল নীতি তার মূল্য নির্ধারণের অথবা বলা চলে সেই সৃষ্টির অস্তিত্বের। এই একসংখ্যকতা, একটি চিত্রের গঠনরীতির তুলনায় অধিকতর জরুরি রঙের সঙ্গতির ক্ষেত্রে। এইরূপই ছিল সমকালীন চিত্রশিল্পের প্রবণতা, বিশেষ ক'রে ইম্প্রেসনিস্টদের ক্ষেত্রে। তাঁর চিত্রশিল্পী বান্ধবদের ক্ষেত্রে। কারণ তিনিই তো লিখেছেন : 'আমি পরিতৃপ্ত কারণ আমি মোনেতের সমকালে জীবনযাপন করছি!' বার্থ মোরিসোতের একটি চিত্রপ্রদর্শনীর লিখিত নান্দীমুখ তিনি এইসময়েই দিয়েছিলেন। তিনি দেগার অনেকানেক রচনা লক্ষ করেছেন অথচ অন্যপক্ষে দেগা নিজে মালার্মের প্রদত্ত ভিলিয়ের দ্য লিস-আদম-বিষয়ক ভাষণের ''বিন্দুমাত্র অনুধাবন করতে সম্পূর্ণত অসমর্থ হয়েছেন'।

যেহেতু আমরা স্তেফান মালার্মে ও সমকালীন ফরাসি চিত্রীদের তত্ত্বগত প্রশিক্ষণ তথা রীতিগত নিয়মানুস্পৃহা একই ঐতিহাসিক সত্যের অনুসারী হিসেবে জ্ঞান করি, সেই হেতু

সমকালীন শিল্পীদের সঙ্গে মালার্মের নির্ভরতার আরও কিছু তথ্য নিবেদন করা উচিত বলে মনে করছি। এদগার দেগা মালার্মের নিকট দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, তাঁর সবরকম ভাবনাচিন্তার স্রোতোবহতা সত্ত্বেও তিনি চতুর্দশপদী রচনায় অকৃতকার্য হচ্ছেন কোন কারণে। মালার্মে উত্তরে লিখেছেন : 'আপনি বস্তুত চতুর্দশপদী ভাবনা-প্রবহনের দ্বারা রচনা করতে পারেন না, পক্ষান্তরে আপনাকে রচনাকর্ম সাধিত করতে হয় শব্দাবলির ব্যবহারে।' এই উপদেশটি যে এই বিশেষ শ্রেণির শিল্পকলার অর্থাৎ কবিতার — অন্যতম এক সম্পাদন পদ্ধতি তাতে কোনো সন্দেহই নেই। পূর্বল্লিখিত প্রবন্ধ শিল্পী এদুয়ার মানের সম্পর্কে তিনি অনুরূপ অলোকদৃষ্টিতে চিত্রশিল্পের নিগূঢ় তত্ত্বটির কথাও লিখেছেন : 'দৃষ্টিগত উপলব্ধিকরণের মধ্যে এক বিশেষ বাস্তবিকতার অস্তিত্ব বর্তমান এবং অঙ্কনপদ্ধতি (যার প্রধানতম পাপ, এই শিল্পের উৎসের মুখাবরণ সৃষ্টি, যা বস্তুতপক্ষে তৈল এবং রঙের তৈরি) যা, যদিও সন্দেহাতীত, তবু সেইসব অর্বাচীনদের প্রলুব্ধ করবে যারা এই সুযোগের উপস্থিতির দ্বারা ভ্রষ্ট হবে, বিশেষ করে আপাত সহজ উপায় প্রদর্শন করবে...''। আমরা এই উদ্ধৃতির অনুসন্ধান করলে কেবল যে চিত্রশিল্পের যথাযথ সংজ্ঞা বর্তমান অনুমান করতে সমর্থ হব তাই নয়, বুঝতে সক্ষম হব শিল্পীমানের অঙ্কনপারিপাট্যের বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত। আরও কিছুটা সহজবোধ্য করার জন্য বলা যাক, মানের নিকট মালার্মের ভাষ্যানুসারে, অঙ্কিত একটি শুভ্র পোশাকের অভিঘাতের পূর্বে সাদা রঙের শুভ্রতাই অধিকতর আকর্ষণীয়। অর্থাৎ অনুকরণের আনন্দের তুলনায় বেশি আনন্দদায়ক, অধিকতর দৃঢ়মূল আনন্দ সৃষ্টিকারী বস্তুতই হচ্ছে অঙ্কনের আনন্দ। এই যুক্তি যদি আমাদের গ্রাহ্য বলে অনুমিত হয় তবে বলতে বাধা থাকবে না, শিল্পকলার বন্ধনমুক্তির জন্য এ-দুয়ার মানেই অনেকখানি যথার্থতার অবদান করেছেন। এ-কথাও অতিশয়োক্তি হবে না যদি আমরা বলি পরবর্তী চিত্রশিল্পী সকলেরই ছিল অন্যতম অনুসন্ধিৎসা তাঁদের আপনাপন সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ চারিত্র বিষয়ে। অন্যপক্ষে এ-কথা উচ্চারণ করাটাও অনুচিত হবে যে মানের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র এই অলোকদৃষ্টি গগনচ্যুত হয়েছিল। কারণ মালার্মে যে সকল সমকালীন শিল্পীদের প্রতি প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভেলাসকুয়েজের রাজসভার আবক্ষ প্রতিকৃতিগুলি ব্যতীত অন্যান্য অনেক চিত্রে এই গুণপনার লক্ষণ প্রতিভাত। এর পরের চিত্রীদের মধ্যে ফ্রাঁস হালস, গোইয়া, এমনকী কখনও কখনও ফ্রাগোঁআর্দের মধ্যেও এই প্রত্যক্ষতা দৃশ্যমান। তখনকার তাঁদের ফরাসি শিল্পীরা অবশ্য অনুমান করতে অসমর্থ হয়েছিলেন, এক, তাঁদের স্বাধিকার অঙ্কনের ক্ষেত্র কোনো উপায়ে হরিত হয়েছে এবং তদুপরি কেন মানেকে ইম্প্রেসনিস্টদের মধ্যে তাঁদের প্রথম বিদ্রোহী প্রদর্শনীতে যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক স্থানে রাখা হবে। অর্থাৎ শিল্পীদের স্বাধীনতা পুনরায় অর্জন ভিন্ন গত্যন্তর নেই, এই তত্ত্বটি বস্তুতপক্ষে এদুয়ার মানেই প্রথম অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং তাই ব্যাখ্যাত হয় মালার্মের উল্লিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে। এবং সেই প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল মানের দুইটি চিত্র প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যভুক্ত নির্বাচকদের দ্বারা বর্জিত হওয়ার প্রতিবাদে। পক্ষান্তরে অন্যসকল চিত্রশিল্পী তাঁদের নিজ নিজ 'উপলব্ধি' দ্রুত অবলম্বন করার ঐকান্তিক বাসনায় বাধ্য হয়েছিলেন 'অনুকরণ' কার্যে। মানের পর ভ্যান গগ আবির্ভূত হন মানের নির্দেশিত পথে পরিক্রমণের জন্য। ফবস তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তারই ফলে আধুনিক চিত্রের প্রকাণ্ড রাজপথ অধিকতর প্রশস্ত হয় অন্যান্যদের গতিবান হওয়ার জন্য।

মালার্মে তাঁর বন্ধুদলভুক্ত হিসেবে সমকালীন অনেক চিত্রশিল্পীকে গ্রহণ করেছিলেন এই সময়েই। তবে মনে হয় তাঁর সঙ্গে সেজানের বন্ধুতা গভীরতর হয়নি কোনো অলিখিত কার্যকারণে। অন্যপক্ষে মালার্মে মনোযোগ নিবেদন করেছিলেন রনোয়ার এবং হুইসলারের চিত্রাবলিতে। এমনকী মালার্মের রু দ্য রোম রাজপথের গৃহে ঝুলন্ত ছিল এইসব চিত্রকরদের নানা রচনা। মালার্মের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেছিলেন, এদভার্দ সার্চ, গগ্যাঁ, জাক-এমিল ব্লাঁস, হুইসলার এবং ভালোতোঁ। এবং অন্যপক্ষে তাঁর নানা রচনার অলংকরণ করেছিলেন, স্বয়ং মানে, রনোয়ার, দেগা, বার্ত মোরিসোত, রাফালি এবং রোপ। এই সময়ে যখন ইম্প্রেসনিস্ট শিল্পীদল তাঁর বন্ধুদলভুক্ত, তখন ফরাসি দেশে মালার্মেকেও আখ্যা প্রদান করা হয়েছিল, 'ইম্প্রেসনিস্ট কবি' নামকরণের দ্বারা। এটা তো অনস্বীকার্য যে মালার্মের কবিতা এবং চিত্রকরদের শিল্পকর্মের মধ্যে এক দৃঢ়বদ্ধ সম্পর্ক অবশ্যই ছিল। তাঁর ন্যায়ই চিত্রকরগণ আপনাপন পূর্বসূরিগণের তথাকথিত জড়বাদের নাগপাশ থেকে নিজেদের সৃষ্টিকে মুক্ত করেছিলেন। এঁদের সকলের নিকটই অনুমিত হয়েছিল, বহির্জগৎ এবং তার বস্তুপুঞ্জ বস্তুতপক্ষে তাঁদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির দ্বারা অনুমিত হয়, অন্যপক্ষে যে 'সংবেদন', যা মালার্মে কবিতার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন, তা নিঃসন্দেহে অধিকতর জটিল। মালার্মে জ্ঞাত ছিলেন যে অধিকন্তু কবিতা, 'গড়ে ওঠে শব্দের দ্বারা'এবং চিত্রশিল্প গ'ড়ে ওঠে 'তৈল এবং রঙের দ্বারা'। আবার ইম্প্রেসনিস্ট চিত্রকরগণ অন্যান্য চিত্রযুগের তুলনায় সম্ভবত অধিক মনোযোগ প্রদান করেছিলেন, 'তাঁদের শিল্পকর্মের উৎপত্তিকে মুখোশাবৃত করতে'। অর্থাৎ পুনরায় বলা যাক, কোনো একটি স্থানের উপরিভাগ চিত্রিত করার পরিবর্তে তাঁরা আপনাপন অলোকদৃষ্টির দ্বারা সেই ভূদৃশ্য যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন তার অনুকৃতি রচনা করায় অধিকতর মনোযোগ স্থাপন করায়। সুতরাং অনুধাবনযোগ্য যা, তা হচ্ছে মালার্মের কবিতার কোন্ শ্রেণির প্রভাব অনুরঞ্জিত করেছিল সমকালীন অথবা উত্তরকালীন চিত্রশিল্পীদের ক্ষেত্রে। সংস্কৃতির ইতিহাসে অবশ্যই লক্ষণীয় যে কোনো সময়ে কবিতা শিল্প আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে সর্বজনের সম্মতিতে, পক্ষান্তরে অন্য কোনো সময়ে চিত্রকলা এই অভিপ্রেত নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, এমনকী কবিকুলেরও অনুমতিক্রমে। একই যুক্তিতে কখনও কখনও কোনো একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব, কবি অথবা শিল্পী হোন না কেন, তাঁর প্রয়াণের বেশ কিছুকাল পরেও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন প্রভাব অনুজ শিল্পকর্মীদের উপর বিস্তার করেছেন। এ-কথা স্থির নিশ্চয় করে প্রমাণিত হবে না যে মালার্মে ইম্প্রেসনিস্ট চিত্রশিল্পীদের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রভাবের উৎসমুখ ছিলেন। উদাহরণগত মানেই মালার্মের নিকট প্রতিভাত করেছিলেন যে, শিল্পের অভিপ্রেত বিশুদ্ধতার রক্ষাকল্পে প্রয়োজন শিল্পের সম্পাদনকর্ম অবধারণতার সহযোগে। ফলত; মালার্মের প্রয়াণের পর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মালার্মের কবিতা যথার্থ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল আধুনিক যুগের প্রখ্যাত প্লাস্টিক আর্টের উপর। আর এই প্রভাব চারিপাশ থেকে আবরিত রেখেছিল সেজানের শিল্পকর্ম। অথচ এই দুইজনের মধ্যে পরিচয় ছিল অতীব ক্ষীণসূত্রী এবং এঁরা দুইজন কখনও জীবদ্দশায় শিল্প-বিষয়ক মতবিনিময়ের অভিপ্রেত সুযোগ পর্যন্ত লাভ করেননি। কিউবিজম, যা আজকের শিল্পচেতনার উৎস হিসেবে গ্রাহ্য তা সেজানের মধ্যে লাভ করেছিল প্লাস্টিক আর্কিটেকচার নামক গঠনসৌকর্য। অন্যপক্ষে মালার্মের পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে লাভ করেছিল সেই অনপনেয় দুঃসাহস — চিহ্নের বিমুক্ত আবিষ্কার।

তাঁদের অর্থাৎ কিউবিজম চর্চাকারীদের নিকট সহজতর ছিল এমন বিশ্বাস যে একদিন এইসব চিহ্ন দর্শনার্থী মানুষের চোখকে শিক্ষিত করে তুলবে, চিহ্নগুলি যেসব বস্তু প্রতীকিত করে তার সহজ পরিচয় পেতে।

অন্যপক্ষে সাজগোজ, যাকে আমরা ইংরেজিতে ফ্যাশন বলি, যা পূর্ববর্তী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তেয়োফিল গোতিয়েকে অনুভাবিত করেছিল, যা বিমোহিত করেছিল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে শার্ল বোদলেয়ারকে এবং যা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্যচর্চা পরিহার করে নিয়োজিত করেছিল এই বিষয়ের অনুসন্ধানে, তার প্রেরণা মালার্মের ক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছিল পারি শহরের একটি বিখ্যাত সাজগোজ-উপাদানের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে চার্লস ওয়ার্থ নামক একজন ইংরেজ যুবক তার সূক্ষ্ম তন্তুজাত কাপড়ের গভীরতর জ্ঞান নিয়ে উপস্থিত হলো পারিতে। এক প্রখ্যাত পোশাকবিক্রেতার সেলসম্যানের কাজ নিয়ে। ভারতবর্ষের মসলিন এবং চীনের রেশমবস্ত্র তার পূর্বেই ইউরোপে পৌঁছে গেছে। বিত্তবানদের গৃহে এইসব বস্ত্রের কদর ক্রমশ বর্ধমান। বস্তুত যখন ফরাসি বিপ্লব ও তার ফলাফল ইউরোপীয় ভাবনা অধিকার করেছিল ঠিক সেই সময়ই ইংল্যান্ড অন্য এক বিপ্লব মানুষের ইতিহাস পরিবর্তিত করছে — যাকে বলা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন এবং এই শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে সেসব যান্ত্রিক আবিষ্কার হয়েছিল তা সমস্ত তন্তুজাত শিল্পকে সম্পূর্ণ বদলে দিল। এই ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত সময়কালে। এই অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সীবনযন্ত্রের উদ্ভাবন এবং উন্নতি সাধারণভাবে একজন পোশাকপ্রস্তুতকারক প্রতি সপ্তাহে যে-সংখ্যক গাউন অর্থাৎ মহিলাদের সমকালীন যুগোপযোগী রুচি অনুযায়ী পরিধান প্রস্তুত করতে সমর্থ হতেন তার তুলনায় অনেক বেশি নয়ন-নন্দন পরিধেয় উৎপাদন করতে আরম্ভ করলেন। একই সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারণশীল রেলপথ পারির সাম্প্রত উৎপাদিত মহিলাদের পোশাক ইউরোপের অন্যান্য সংস্কৃতির পীঠস্থানসদৃশ নগরসমূহে পৌঁছে যেতে সমর্থ হল। তবে এই বাণিজ্যিক প্রসারণ তথা কৌশল সংহত অবস্থায় বর্ধমান করার কর্মটি বস্তুতপক্ষে সাধিত হয়েছিল সেই একজন প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ যুবকের প্রচেষ্টায় যার নাম আমরা উল্লেখ করেছি — চার্লস ওয়ার্থ। যিনি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আপন নামানুসারে যে-পোশাক উদ্ভাবন, চর্চা এবং বাণিজ্যিক প্রসারণে সমস্ত ইউরোপে আর নতুন বিশ্বের ফ্যাশনজগতে শ্রেষ্ঠতম স্থানাধিকার করে নিয়েছিলেন। এই সর্ববাদীসম্মত স্থানাধিকারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই কারণ স্বয়ং মালার্মে তাঁর *দেরনিয়ের মোদ* কাগজে প্রায় প্রতি সংখ্যায় এই ইংরেজ যুবকের নাম বারংবার পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন — 'মহান ওয়ার্থ' নামে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, বিশ্বসাহিত্যের শিরোপানমিত যুগান্তকারী আধুনিকতার ক্ষণজন্ম ফরাসিদেশে এই সময়কালেই যে সংঘটিত হয়েছিল, তা পর্যন্ত, ফ্যাশনের বৈপ্লবিক চৈতন্য উন্মেষের ন্যায়, অবলম্বিত করেছিল এমন একজন লেখককে, যিনি, ইংরেজি ভাষায় তাঁর রচনাকর্ম সাধিত করেছেন — এডগার অ্যালেন পো। ইংরেজের কাছে শতাব্দীর ঐতিহাসিক বৈরিতা সত্ত্বেও বৈকর্তনসত্য। কারণ মালার্মে এমন কথাও লিখেছেন, যার বাংলা করা যায় : 'পারি, ভিয়েনা, লন্ডন এবং পিটার্সবার্গের প্রাত্যহিক প্রদর্শনীর পবিত্রতম উৎসবের সেই কর্তা', এবং 'মহত্তম ঐন্দ্রজালিক'। তবে তো আমাদের আরও কিছুটা বিবরিত করতে হয় এই ইংরেজ যুবক ওয়ার্থের সম্পর্কে

মালার্মে-বর্ণিত ইন্দ্রজালের স্বরূপ। ওয়ার্থ যখন পারিতে এলেন তখন এই নগরীর জাঁকজমক, পোশাকআশাক অর্থাৎ সাজগোজের উপাদান রচিত হচ্ছিল বিশেষরূপে স্থানীয় মূল্যবান বস্ত্র-ব্যবসায়ী, ভিন্নভিন্ন বস্ত্রের খণ্ডাংশ জুড়ে পোশাক প্রস্তুতকারী এবং অর্থপ্রদানকারী সামাজিক অভিজাত মহিলাদের দূরদৃষ্টিহীন খেয়ালি প্রচেষ্টায়। একজন অভিজাত মহিলা তাঁর নির্দিষ্ট বস্ত্রব্যবসায়ীর সংগৃহীত উপাদান থেকে একটা ক্রয় করতেন এবং তাঁর নিজস্ব পোশাকনির্মাতাকে তা প্রদান করে নিজেই একটা নকশা জ্ঞাপন করতেন। পোশাক প্রস্তুতকারকের, ফলত, সেই পোশাকটি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অভিজ্ঞ মতামতের অবকাশ থাকত না। অবকাশ থাকত না বস্ত্রটির নির্দেশিত পোশাকের উপযোগিতা, বুননের দিক থেকে, বর্ণের দিক থেকে অথবা নকশার দিক থেকে, আপন মতামত জাহির করার। ওয়ার্থ এই পদ্ধতিটিকেই বৈপ্লবিকরূপে পালটে ফেললেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন একটি পোশাক বস্তুত এক শ্রেণির শিল্পকর্ম অর্থাৎ নির্মাণ, আর তার জন্য আবশ্যিকরূপে প্রয়োজন তার মূল উপাদান অর্থাৎ বস্ত্রটির গঠনশৈলী এবং পোশাক গঠনপদ্ধতি, এই দুয়ের মধ্যে, বস্তুতপক্ষে, কোনো বিচ্ছিন্নতার অবকাশ নেই। আমাদের লক্ষ করতে হবে এই অনুভবের পশ্চাতে যে-তত্ত্বটির অপ্রকাশ্য উপস্থিতি বর্তমান, তা হচ্ছে শব্দ এবং কাব্যনির্মাণ, প্রস্তর এবং মূর্তির গঠন আর বাদ্য এবং নৃত্যের প্রতীকের প্রতোলী। এই অনুমিতির ফলে ওয়ার্থ প্রাথমিকভাবে আরম্ভ করলেন, অনেকাংশে অনাড়ম্বর অথচ মার্জিত পোশাকের পরিকল্পনা যার নকশা নির্ভরশীল থাকত সেইসব বস্ত্রের গুণাগুণের উপর আর যা তিনি নিজের শব্দচয়নের দক্ষতায় নির্বাচন করতেন। এই পদ্ধতি এক অভূতপূর্ব সার্থকতা আনয়ন করেছিল। ফলে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে পারি শহরে আয়োজিত একটি বিশ্বমেলায় তাঁর তৈরি গাউন অর্থাৎ মহিলাদের পরিধেয় পোশাকের প্রদর্শনীর মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্ম হিসেবে পুরস্কৃত হয়। এর ঠিক তিন বৎসর পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ওয়ার্থ রু দলা পাইতে, পারি শহরে নিজের পোশাক তৈরির সংস্থা স্থাপন করেন এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তিনিই নির্বাচিত হন ফরাসি রাজকীয়দরবারের পক্ষ থেকে সরকারি পোশাক নির্মাতা হিসেবে। সহজেই অনুমেয় উনিশ শতকের ফরাসি দেশে এই সম্মান, বিশেষত একজন ইংরেজকে প্রদান করার মর্মার্থ কতখানি গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই নির্বাচন অধিকতর অভূতপূর্ব মনে হবে যদি আমরা জানতে পারি ওয়ার্থ ক্রমে একই ছাদের তলায় গড়ে তুলেছিলেন যুগোপযোগী ফ্যাশানের জন্য ব্যবহৃত সবরকমের উপাদান এবং এই কারণে তাঁর পৃথিবীবিখ্যাত ক্রেতাকুলের আপনাপন প্রয়োজনীয় পোশাকশালার নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত তিনিই অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এই যুগসন্ধিক্ষণে। তাঁর নিজের ব্যবহৃত উপার্জনে, তিনি বস্তুত একজন 'আর্টিস্ট', এবং যাঁর কর্মের পরিধি হচ্ছে, 'প্রসাধনসামগ্রীর উদ্ভাবনা'। এমনকী ফরাসি সাম্রাজ্ঞী ইউজেনি দ মোঁতিযো দ গুজসাঁ পর্যন্ত আপন সাজসজ্জার প্রয়োগ সমর্পণ করেছিলেন এই ইংরেজ যুবকের শিল্পরুচির কাছে। ওয়ার্থ নির্দেশ প্রদান করতেন সম্রাজ্ঞীর পরিধেয়র শেষতম পুঙ্খানুপুঙ্খতার বর্ণ, বস্ত্র তথা গঠনপদ্ধতি বিষয়ে দ্বিধাহীনভাবে। ওয়ার্থের বাণিজ্যিক সংস্থা এই পদ্ধতিতে অল্পদিনের মধ্যেই অর্জন করল অভিজাত শ্রেণির অনুমত্যানুসারে সমকালীন ইউরোপের এক অসামান্য স্টাইলের প্রবর্তক হিসেবে। এবং এই স্বীকৃত অসামান্যতার জন্য ফরাসিদেশের সমকালীন শাসক তথা অভিজাতদের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর পর্যন্ত তাঁর নির্মিত পোশাকের উৎকর্ষতার

খ্যাতি ম্লান হয়নি। এবং যখন তৃতীয় রিপাবলিক ফরাসিদেশে ক্ষমতাসীন হয় তখন পর্যন্ত ওয়ার্থের পোশাক-ফ্যাশানের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য যে কেবলমাত্র পূর্বাপর প্রাগ্রসর ছিল তাই নয়, তার খ্যাতি ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠছিল। ওয়ার্থ পারিতে আপন আসনে অটল থেকে, নিউ ইয়র্ক থেকে পিটার্সবার্গ পর্যন্ত প্রত্যেকটি অভিজাত ইউরোপীয় শহরের ব্যবহৃত পরিধেয়র চাপল্যকে দমিত করার নির্দেশ প্রদান করতেন। তাদের বাধিত করতেন শাসনের সুচিন্তিত মতামতে।

যে-সাজগোজ তেওফিল গোতিয়েকে প্রলুব্ধ করেছিল ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, আকর্ষিত করেছিল শার্ল বোদলেয়ারকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে, এবং আবিষ্ট করেছিল স্তেফান মালার্মের কাব্যিক ধ্যানমগ্নতা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তা এমনইভাবে ওয়ার্থসংস্থার কর্মযজ্ঞের দ্বারা প্রসবিত। সমকালীন আধুনিকতার নবতম পরিমণ্ডল, এক প্রাথমিক পর্যায়ের আর্ট পরিবেশনের ক্ষেত্রে, আমরা একথা মানতে বাধ্য যে কোনো একজন কবি অথবা চিত্রকরের তুলনায় চার্লস ওয়ার্থ অনেক বেশি সার্থক হয়েছিলেন। এই কথাটি 'লা দেরনিয়ের মোদ' কাগজের ১৮৭৪-এর ১ নভেম্বরের সংখ্যায় মালার্মে 'মিস সাত্যাঁ' ছদ্মনামে ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাঁর 'গেজেট দ লা ফাসিয়োঁ' বিভাগে লিখলেন : 'আমরা প্রত্যেকে স্বপ্নদর্শন করেছি এই গাউনের, অবশ্যই অবিজ্ঞাত হিসেবে। মোঁসিয়ো ওয়র্থ, নিজেই কেবল জ্ঞাত ছিলেন কোন্ উপায়ে আমাদের কল্পনা অনুযায়ী পোশাকের সার্থক পরিকল্পনা করবেন।' এই ঘটনাটি, সুতরাং বলা যাবে না যে কেবলমাত্র দৈবী ঘটনা যাতে উনিশ শতকের কবিকুল পারির পথে পথে পরিব্রাজনের সময় সহসা দৃষ্টিগোচর করলেন সমকালীন সময়োপযোগী এমন সব ফ্যাশন মডেল যাদের দর্শনমাত্র এইসব কবিচিত্রীদের পরিকল্পনায় আবির্ভূত হলো জগদ্‌বিখ্যাত সব 'আধুনিক জীবনের চিত্রকলা'। বস্তুত এটা তাঁদের অনুধাবনের কৃতিত্ব যার দ্বারা এইসব কবি তথা চিত্রশিল্পী তাঁদের পূর্ববর্তী কালে অন্য কেউ অনুমান করতে সক্ষম হয়নি এমন সব জীবনালেখ্য, যাকে আমরা নানা বিচার-বিবেচনার পর আধুনিকতার সূত্রপাত হিসেবে আখ্যা প্রদান করেছি। জীবদেহগঠনকারী মৌলিক উপাদানের শিল্প আধুনিকতার বর্ণমালায় সজ্জিত হয়ে রচিত হ'য়ে উঠল যান্ত্রিকতার সাহচর্যে অধিকাংশের ব্যবহার্য উপাদানে।

সুতরাং এ-কথাটা সহজেই অনুমিত হয় যে মালার্মের একটা কবিতা রচনার পশ্চাতে যে প্রবল অনুশীলন, অনুশাসন তথা অনুসন্ধিৎসা আমাদের বিস্মিত করে, যার ফলে আমরা মালার্মের সম্পাদনায় একটি মহিলাদের ফ্যাশন ম্যাগাজিন প্রকাশনার উল্লেখমাত্র প্রকম্পিত হই, মনে হয় যেন আমাদের শতাব্দী প্রত্যক্ষ-খোচিত প্রাসাদ বিচূর্ণিত হচ্ছে, তা আবশ্যিক কারণেই যুক্তিহীন। স্মরণে রাখতে হবে মালার্মে নির্মিত কাব্যাদর্শের একটি অন্যতম উপাদান এই ক্ষণজন্মা পত্রিকা, যার নাম *লা দেরনিয়ের মোদ*।

বেলা শেষের গান

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ্

অনুবাদ : অমিতাভ রায়

অনুবাদ প্রসঙ্গে দু-একটা কথা

১. আক্ষরিক অর্থে স্প্যানিশ 'সেরেনাদে' বা ইংরেজি 'সেরিনেইড্'(serenade) শব্দের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া সম্ভব কি? লাতিন ser-nus থেকে ইতালীয় serenata হয়ে ফরাসি sérénade হওয়ার পর আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে দুই আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র, বিশেষত স্প্যানিশ ভাষাভাষী দক্ষিণাংশে ছড়িয়ে পড়ার পর শব্দটার আভিধানিক অর্থ হয়ে দাঁড়াল, 'প্রধানত কোনো মহিলার বাসভবনের জানালার নীচের উন্মুক্ত স্থানে তার প্রণয়ী কর্তৃক রাত্রিবেলায় সংগীতের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন'। স্প্যানিশ ভাষাভাষী আমেরিকায় এটি অত্যন্ত সাদামাটা ঘটনা। একেবারে আধুনিক উদাহরণ — মেক্সিকো। সে-দেশে এভাবে প্রেম নিবেদনের নাম — 'লাস সেরেনাতাস'। প্রতিদিন গোধূলিবেলায় মেক্সিকোর গ্রাম-গঞ্জ-শহরের কেন্দ্রস্থল বা প্লাজা-য় গাইয়ে-বাজিয়েরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। অর্থের বিনিময়ে এরা প্রেমিকের নির্দেশে নির্দিষ্ট প্রেমিকার বাতায়নতলে বসে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রেমিক মাত্রেই গান-বাজনায় দক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; অতএব এই ব্যবস্থা। বাংলার সমাজজীবন তথা সংস্কৃতিতে এমন বিষয় বিরল। সুতরাং প্রতিশব্দ আসবে কোত্থেকে? 'সন্ধ্যাসংগীত' বা 'সান্ধ্যসংগীত' শব্দবন্ধদুটি মন্দ নয়, কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। 'যেভাবে আমার বাবা আমার মায়ের হৃদয় হরণ করেছিলেন' প্রসঙ্গে রচিত একটি স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধের শীর্ষ-শিরোনাম হিসেবে প্রার্থনা বা উপাসনা ধরনের শব্দবন্ধদুটি বড্ড বেমানান। সুতরাং, একটু সরে গিয়ে 'সেরেনাদে' অন্তত এই নিবন্ধটির ক্ষেত্রে — 'বেলা শেষের গান'।

২. ১৯৯৯ থেকে গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ্ 'কাম্বিও' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার অন্যতম সত্ত্বাধিকারী, সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান তথা মূল স্তম্ভ। কাম্বিও-র জন্য সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিবেদন ছাড়াও মাঝেমধ্যেই তিনি মৌলিক প্রবন্ধও লেখেন। সেইরকম একটি বিশেষ প্রবন্ধের শিরোনাম — 'সেরেনাদে'। 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকার ১৯/২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ সংখ্যায় প্রবন্ধটি এডিথ গ্রস্‌মান-এর অনুবাদে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদের শিরোনামে 'সেরিনেইড্' ছাড়াও লেখা হয়েছিল, 'হাও মাই ফাদার ওয়ান মাই মাদার'। শোনা যাচ্ছে যে এটি নাকি মার্কেজ্-এর প্রকাশিতব্য আত্মজীবনীর প্রথম অধ্যায়।

৩. এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল যে ১৯২৮-এর ৬ মার্চ গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ্-এর জন্মদিন। এই প্রথম তিনি নিজে জানালেন যে তাঁর জন্মদিন ১৯২৭-এর ৬ মার্চ। একটা পুরোনো ধাঁধার বোধ হয় জট ছাড়ল। বহু জায়গায় তিনি আভাস দিয়েছেন যে ১৯২৮-এর অক্টোবরে আরকাতাকা-র কলা-বাগিচায় ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ড নাকি তাঁর স্মৃতিতে ভেসে বেড়ায়। প্রশ্নটা ছিল, ছ-মাস বয়সের স্মৃতি কি এত উজ্জ্বল হতে পারে। *একশো বছরের একাকীত্ব* উপন্যাসে এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। সরকারি সেনাবাহিনী এক রাতে কয়েক হাজার ধর্মঘটি বাগিচা-শ্রমিককে হত্যা করেছিল। পরের কয়েকদিনে চিরতরে হারিয়ে যায় আরও কয়েক হাজার। এখন বোঝা যাচ্ছে দেড় বছর বয়সে চোখের সামনে অমন নৃশংস ঘটনা ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই সারা জীবনে তা ভোলা সম্ভব নয়। বরং, পরে বাড়ির বড়োদের, বিশেষত দাদু-দিদিমার ধারাবাহিক আলোচনা-স্মৃতিচারণায় সেই অণুস্মৃতি হয়ে ওঠে আরও সম্পৃক্ত-পরিপুষ্ট। হয়তো সেই কারণেই তাঁর সৃজনশীলতায় বারেবারেই ফিরে আসে কলা-বাগিচার হত্যাকাণ্ড।

চরম দুরবস্থার মধ্যে আমার মা হয়ে উঠেছিলেন একজন পরিপূর্ণ নারী। ম্যালেরিয়া ও প্লেগে কেটেছিল তাঁর অনিশ্চিত শৈশব। তবে সেরে যাওয়ার পর তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য হয়ে উঠল ইস্পাত ও সিমেন্টের সংমিশ্রণে তৈরি রি-ইনফোর্সড্ কংক্রিটের মতো শক্তপোক্ত। নিজের এগারোটি ছাড়াও স্বামীর চারটি সন্তান, ছেষট্টিটি নাতি-নাতনি, নাতি-নাতনিদের সাতাত্তরটা

ছেলেপুলে আর নাতি-নাতনিদের গোটাপাঁচেক নাতি-নাতনি নিয়ে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বছরে তিনি পঁচানব্বইতম জন্মদিন উদ্‌যাপন করলেন। অবিশ্যি এই হিসেব-নিকেশ করার সময় তাদের ধরা হয়নি, যাদের কথা কেউ জানে না।

তাঁর নাম লুইসা সান্তিয়াগা। কর্নেল নিকোলাস মার্কেজ্ এবং তাঁর স্ত্রী, যিনি আবার অন্য সম্পর্কে কর্নেলের জ্ঞাতি বোনও বটে, ত্রানকিলিনা ইগোয়ারান কোতেস্-এর তৃতীয়া কন্যা আমার মা। দিদিমা ত্রানকিলিনা ইগোয়ারান কোতেস্‌কে আমরা 'মিনা' বলে ডাকতাম। কলম্বিয়ার রানচেরফা নদীর তীরে, বারানকাস শহরে ১৯০৫-এর ২৫ জুলাই আমার মা লুইসা সান্তিয়াগা জন্মগ্রহণ করেন। কর্নেলের পরিবার তখন সদ্যসমাপ্ত গৃহযুদ্ধের ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে ব্যস্ত। নিজের সম্মান রক্ষার তাগিদে কর্নেল গৃহযুদ্ধের সময় মেদার্দো পাচেকো-কে হত্যা করেছিলেন। আমার মায়ের জন্মের মাসখানেক আগেই তাঁর পিতামহী লুইসা মেহিয়া ভিদাল-এর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর স্মৃতিতে মায়ের প্রথম নাম হল — লুইসা। জেরুজালেম-এ সমাধিস্থ হওয়া 'সান্তিয়াগো এল মেয়র'-এর বার্তাবাহক 'সেইন্ট জেমস্'-এর স্মৃতিকে ভাস্বর করে রাখার জন্যে আমার মায়ের দ্বিতীয় নাম হল — সান্তিয়াগা। মাঝের নামটা হয়তো বরাবরের জন্যেই গোপন থাকত। তাঁর এক ছেলে বিশ্বাসের অমর্যাদা করে একটা উপন্যাসে নামটাকে পরিচিত করে তোলে। কারণ, নামটা একে তো জমকালো তার উপর আবার পুরোপুরি পুরুষালি।

সম্পন্ন ক্যাথলিক পরিবারে, মেয়েদের যতটা শিক্ষিত হওয়া দরকার লুইসা সান্তিয়াগা ঠিক ততটা শিক্ষাই পেয়েছিলেন। সান্তা মারতা শহরের 'কোলেজিও দে লা প্রেজেন্তাসিওন্'-এর ছাত্রী লুইসা সংগীত ছাড়া অন্য সব বিষয়েই ভালো ফল করেন। মায়ের নির্দেশে তাঁকে সংগীত-চর্চা করতে হত। অথচ তাঁর মা মানে 'মিনা' কিন্তু চলনসই গোছেরও সেনোরিতা বাজাতে পারতেন না। আবার পিয়ানোয় ভালো রকমের সংগত করতেও সক্ষম ছিলেন না। প্রতিদিন দিবানিদ্রার পরে গরমে ঘেমে নেয়ে বাধ্য ছাত্রীর মতো একটানা তিন বছর পিয়ানো শেখার চেষ্টা করে লুইসা হাল ছেড়ে দিলেন। যে-শিক্ষা ভবিষ্যৎ-এ তেমন কোনো কাজে লাগবে না তা ছেড়ে দেওয়ার সময় বাড়ির লোকেরা আবিষ্কার করল যে লুইসা 'আরকাতাকা' শহরে সদ্য-আগত এক অহংকারী যুবকের প্রেমে মাতোয়ারা। যুবকটি পেশায় টেলিগ্রাফ অপারেটর। মেদার্দো পাচেকো-কে হত্যার পর থেকে কর্নেলের পরিবার আরকাতাকায় বসবাস শুরু করে।

তাঁদের নিষিদ্ধ প্রেমের কাহিনী ছিল আমার যৌবনের অন্যতম বিস্ময়। মা-বাবার মুখে বহুবার এই কাহিনী শুনেছি। দু-জনে একসঙ্গে, আবার কখনও আলাদাভাবে এই গল্পটা আমায় অনেকবার শুনিয়েছেন। তার উপর দুজনেই ভীষণ ভালো 'গল্প বলিয়ে'। নিজেদের প্রেমের গল্পের স্মৃতিচারণ করা ছিল তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় অবসর বিনোদন। বহুবার শ্রুত গল্পটা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে। তেইশ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস *লা ওহারাস্কা* (ঝোড়ো পাতা বা লীফ্ স্টর্ম) লেখার সময়েই আমি বুঝতে পারি যে অনেক কিছুই শেখা বাকি, তবে তখনও এই প্রেমকাব্য আমার স্মৃতিতে জাগ্রত ছিল। নিজেদের প্রেমের ব্যাপারে তাঁরা এতই আবেগপূর্ণ যে অনেক পরে, আমার বয়স পঞ্চাশ বছর হয়ে যাওয়ার পরে *এল্ আমোর এন্ লোস্ ইয়েম্পোস দে কোলেরা* (লাভ ইন দি টাইম অফ্ কলেরা) লেখার সময়ে যখন স্থির

করলাম তাঁদের প্রেমোপাখ্যান ব্যবহার করব, তখনও তাঁদের জীবন ও প্রেমকাব্যকে আলাদা করে সাজাতে পারিনি।

মায়ের মতে, নিশি-জাগরণ ব্রত পালনের এক রাতে তাঁদের প্রথম দেখা। অজ্ঞাত মৃতদের উদ্দেশে শোক প্রকাশের জন্যে একটানা ন-রাত্রি জাগরণের ব্রত পালনের সময়, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মা বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির উঠোনে বসে জনপ্রিয় প্রেমের গান গাইছিলেন। সমবেত নারীকণ্ঠের গানের মধ্যে আচমকা একটি পুরুষ কণ্ঠ যুক্ত হওয়ায় সবাই যারপরনাই বিস্মিত। মেয়েরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে যে এক সুদর্শন যুবক তাদের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছে। মেয়েরা হাততালি দিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'ওকে আমরা বিয়ে করব'। যুবকটি কিন্তু আমার মাকে মুগ্ধ করতে পারেননি। মায়ের মতে, 'সে ছিল একজন আগন্তুক'। তাঁর নাম গাবরিয়েল এলিগিও গার্সিয়া। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ঔষধশাস্ত্র নিয়ে কারতাহেনা দে ইন্দিয়াস্-এ পড়াশোনা শুরু করলেও অর্থাভাবে শেষ করা হয়ে ওঠেনি। আশপাশের শহর-বন্দরে ঘুরে ঘুরে বেচারি কোনো রকমে একটা টেলিগ্রাফ অপারেটরের চাকরি জোগাড় করতে পেরেছিল। সেই সময়কার একটা ফোটোগ্রাফ থেকে বোঝা যায় আরোপিত আভিজাত্য তাঁকে অনেকের মধ্যে অনন্য করে তুলেছিল। পরনে গাঢ় রঙের সিল্কের স্যুট। কৌটটায় চারটে বোতাম; তার উপর শক্ত আর চওড়া কলার — ওটাই ছিল সে আমলের হালফ্যাশনের কেতা। কোটের সঙ্গে মানানসই চওড়া টাই। মাথায় শোলার চওড়া টুপি। চোখে সে-যুগের আধুনিকতম গোলাকার চশমা। মদিরা রঙের চশমার ফ্রেমটা আবার ফিনফিনে সরু। পরিশ্রমী জীবনযাত্রার জন্যে তাঁর খ্যাতি ছিল। নিত্যনতুন সঙ্গিনী নিয়ে খামখেয়ালিভাবে দিন কাটানোর জন্যে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি থাকলেও সুদীর্ঘ জীবনে তাঁকে একটা সিগারেট বা এক পাত্র মদ খেতে কোনো দিন দেখা যায়নি।

আমার মা লুইসা তাঁকে এই প্রথমবার দেখলেও এলিগিও কিন্তু লুইসাকে আগের রবিবারের প্রার্থনাসভায় দেখেছিলেন। মায়ের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মাসিমা ফ্রান্সিস্কা সিমোদোসেয়া মেহিয়া। দু-দিন বাদে মঙ্গলবার বিকেলে নিজেদের বাড়ির সদরের সামনেকার আলামন্দ গাছগুলোর ছায়ায় বসে মা সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই এলিগিও তাঁকে দেখেন। নিশি-জাগরণের রাতে তিনি জানতে পারেন যে মেয়েটির বাবা কর্নেল নিকোলাস মার্কেজ্। কর্নেলের জন্যে নিয়ে আসা নিজের পরিচিতিপত্রগুলো তখনও তাঁর পকেটে। নিশি-জাগরণ ব্রত অবসানের পরে মা জানতে পারলেন যে যুবকটি অবিবাহিত আর ঘন ঘন প্রেমে পড়ে। চমৎকার ভঙ্গিতে অবিরাম কথা বলে যাওয়ার জন্য এর মধ্যেই নাকি স্থানীয় এলাকায় সে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। পদ্য লেখায়ও স্বচ্ছন্দ। নৃত্যে পটু। তা ছাড়া করুণ সুরে ভায়োলিন বাজানোয় পারদর্শী। মা আমায় বলেছিলেন যে খুব সকালে তাঁর ভায়োলিনের সুরমূর্ছনা কানে গেলে অবধারিতভাবেই চোখে জল এসে যায়। তাঁর বাজানো সেরা সংগীত-মূর্ছনার শিরোনাম — 'বলনাচের পরে'। সুরটি রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ। আর যে কোনো সান্ধ্য আসরে তিনি অবশ্যই এটা বাজাতেন। হৃদয়ে দোলা দেওয়া এমন প্রতিভা এবং শক্তিশালী সৌকর্যের দাপটে কর্নেলের বাড়ির দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল আর তিনিও নিয়মিত পারিবারিক মধ্যাহ্নভোজের শরিক হয়ে গেলেন।

এলিগিও-র জন্মস্থান সিন্‌সে শহরের কাছেই মায়ের মাসিমা ফ্রান্সিস্কা-র জন্ম হয়েছিল বলে তিনি এলিগিওকে প্রায় পোষ্যপুত্র বানিয়ে ফেললেন। মধ্যাহ্নভোজের আসরে এলিগিও

আমার মাকে নানা রকমের ছলা-কলা শেখানোর চেষ্টা করতেন। আমার মা ব্যাপারটাকে এতটুকুও গুরুত্ব দিতেন বলে কখনও শুনিনি। বরং তাঁর মতে, এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ আসলে নাকি মায়ের এক বান্ধবীর সঙ্গে এলিগিও-র প্রেমের আবরণ হিসেবেই ব্যবহৃত হত। এমনকী সেই বান্ধবীর সঙ্গে এলিগিও-র প্রস্তাবিত বিয়ের সময় আমার মা 'ঈশ্বরীয় মা'-র দায়িত্ব পালন করতে সম্মত ছিলেন। সেই জন্যে আমার মা সেই সময় আমার বাবাকে 'ঈশ্বরীয় পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন। পাশাপাশি তিনিও মাকে 'ঈশ্বরীয় মা' বলা অভ্যাস করেছিলেন। সেই সময় এক রাতে নাচের পরে গাবরিয়েল এলিগিও তাঁর কোটের গোলাপটা লুইসা সান্তিয়াগাকে দেওয়ার সময় বললেন, 'এই গোলাপের সঙ্গে আমার জীবনও তোমার হাতে তুলে দিলাম'। স্বভাবতই আমার মা বিস্ময়াবিষ্ট।

বাবা আমায় অনেকবারই বলেছেন যে তাঁর এই ব্যবহারের মধ্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল না। ততদিনে অন্য অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে লুইসা সান্তিয়াগাই তাঁর জন্যে উপযুক্ত ও যথার্থ। অন্য মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্যে এলিগিও সাধারণত যা করে থাকেন, গোলাপ দেওয়ার ব্যাপারটাকে তার থেকে আলাদা করে লুইসা দেখেননি। বাস্তবে কিন্তু সেদিন নাচের পর গোলাপটাকে ফেলে দিয়েই আমার মা বাড়ি ফিরেছিলেন। এলিগিও ততদিনে লুইসার গোপন প্রেমিক এবং চমৎকার বন্ধু। আবার এলিগিও এমন এক ভাগ্যহীন কবি যার আবেগমথিত কবিতাবলি কখনও লুইসার হৃদয় ছুঁতে পারেনি। কিন্তু গোলাপ উপহারের ঘটনায় লুইসার রাতের ঘুম ছুটে গেল। ঘটনাটার কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তিনি ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হলেন। আমার মায়ের সঙ্গে তাঁদের প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম যখন কথা বলি তখন তিনি বেশ কয়েকটি ছেলে-মেয়ের মা। মায়ের স্বীকারোক্তি, 'তাঁকে নিয়ে চিন্তা করছিলাম বলে ঘুমোতে পারিনি। কিন্তু আসল ব্যাপার হল যে তাঁকে নিয়ে চিন্তা করার জন্যেই রাগ হচ্ছিল। ক্রমশই রাগের মাত্রা বাড়ছিল। আর যতই তাঁকে নিয়ে আমি ভাবছিলাম ততই রাগ যাচ্ছিল বেড়ে'। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোয় যদি এলিগিও-র সঙ্গে আবার দেখা হয়, এমন একটা ধারণায় লুইসা তখন যন্ত্রণাবিদ্ধ। নিদারুণ এক ভয়ে তিনি আচ্ছন্ন। এক বিকেলে মাসিমা ফ্রান্সিস্কা, লুইসাকে একটু ব্যঙ্গ করেই বললেন, 'তোমাকে নাকি কেউ গোলাপ দিয়েছে'। তাঁর অন্তর্বেদনার সংবাদ সর্বজনবিদিত হয়ে যাওয়ার অনেক পরে তা জানতে পারলেন স্বয়ং লুইসা সান্তিয়াগা।

আলাদা করে অথবা যৌথভাবে মা-বাবার সঙ্গে অসংখ্য আলোচনায় জানতে পারি যে তাঁদের ঝলকে-ওঠা প্রেমপর্বে তিনটি চূড়ান্ত মুহূর্ত ছিল। প্রথমটি ছিল গুড ফ্রাইডে-র আগের রবিবার বা 'পাম্ সান্ডে'-র প্রার্থনাসভা। গির্জার চিঠিপত্র যেখানে থাকে তার কাছে রাখা একটি বেঞ্চিতে মাসিমা ফ্রান্সিস্কা ও লুইসা বসেছিলেন। বেলজিয়াম থেকে আমদানি করা একজোড়া জুতো পরে খটখট আওয়াজ তুলে আমার বাবা গির্জায় প্রবেশ করার সময়ই লুইসা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। আর মায়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পোশাক থেকে ছড়িয়ে পড়ল এক অভিমানী সুগন্ধ। মাসিমা ফ্রান্সিস্কা এমন একটা ভাব করলেন যেন বিষয়টা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে আর বাবাও বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি তাঁদের দেখতে পাননি। তবে আসল সত্য হল, পুরো ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত। মা এবং তাঁর মাসিমা যখন টেলিগ্রাফ দপ্তরের সামনে দিয়ে আসছিলেন তখনই এলিগিও তাঁদের অনুসরণ করতে শুরু করে। বাবা দরজার পাশের একটি থামের আড়ালে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যেন লুইসা তাঁকে দেখতে

না পায় অথচ তিনি লুইসাকে স্পষ্ট দেখতে পান। চরম আবেগঘন কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর আর সহ্য করতে না পেরে লুইসা ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালেন। প্রচণ্ড রাগে তখন তাঁর ফেটে পড়ার মতো অবস্থা। তিনি দেখলেন যে বাবা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনিও বাবার চোখে চোখ রাখলেন। বুড়ো বয়সে মজা করে বহুবার বাবা আমাকে এই গল্পটা শুনিয়েছেন। ক্রমশ ফাঁসবদ্ধ হয়ে পড়ছেন ভেবে আমার মা পরের তিন দিন রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। একবার দু-বার নয়, বহু বহু বার এই ঘটনাটাকে সবিস্তারে বলতে আমার মা কোনোদিন ক্লান্তি বোধ করেননি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা হল — লুইসাকে লেখা এলিগিও-র একটি চিঠি। এমন একটা চিঠি কোনো কবির কাছ থেকে — বিশেষত যে-কবি আবার গোপনে উষালগ্নে ভায়োলিনে সন্ধ্যাসংগীতের মূর্ছনা সৃষ্টি করেন — আমার মা আশা করেননি। তার উপর আবার চিঠিতে দাবি ছিল যে পরের সপ্তাহে সান্তা মারতায় ভ্রমণে যাওয়ার আগে যেন এলিগিও উত্তরটা পেয়ে যায়। লুইসা কিন্তু উত্তর দিলেন না। নিজেকে একটা ঘরে বন্ধ করে মন থেকে প্রেমের পোকাটা বের করে দিয়ে আমার মা সুস্থভাবে শ্বাস নেওয়ার জন্যে চেষ্টা করে যেতে লাগলেন, যতক্ষণ না মাসিমা ফ্রান্সিস্কা তাঁকে প্রচলিত লোককথা থেকে জুভেন্তিনো ত্রিলো-র গল্পটা উদাহরণ হিসেবে শোনালেন। প্রেমিক জুভেন্তিনো তার প্রেমিকার বাড়ির নীচে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে। আর তার প্রেমিকা উপরের বারান্দা থেকে যত রকমের অপমান করা যায় তা তো করেই, এমনকী সব শেষে এক পাত্র পেচ্ছাপও জুভেন্তিনোর মাথায় নিয়মিত ঢেলে দিত। জুভেন্তিনো কিন্তু পালিয়ে যায়নি। ধর্মাচরণের মতো রীতিমতো নিয়ম করে এত অপমান মেনে নেয়। শেষপর্যন্ত তার আত্মত্যাগ অজেয় প্রেমের মর্যাদা পায় এবং জুভেন্তিনোকে তার প্রেমিকা বিয়ে করে। আমার মা-বাবার প্রেমের গল্প কিন্তু তেমন কোনো চরমাবস্থায় পৌঁছোয়নি।

তৃতীয় ঘটনাটা ছিল একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ। জাঁকজমকপূর্ণ এই জমকালো অনুষ্ঠানে আমার মা-বাবা সম্মানিত অতিথি। লুইসা সান্তিয়াগার পক্ষে এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার কোনো উপায় ছিল না। গাবরিয়েল এলিগিও ব্যাপারটা আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এবং কী কী ঘটতে পারে ধরে নিয়েই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। নাচের জন্যে আহ্বান জানানোর পর লুইসা আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। মা আমায় বলেছেন, 'বিষয়টা আমায় এমনভাবে নাড়া দিল যে বুঝতেই পারলাম না ওটা কি ভয় না রাগের প্রতিফলন'। এলিগিও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমার আর কোনো আপত্তি করার সুযোগ নেই। তোমার মন আমার সঙ্গে নাচতে চাইছে'। একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে নাচের মঞ্চে এলিগিওকে পরিত্যাগ করে আমার মা চলে এলেন। আমার বাবা কিন্তু অন্যভাবে এর মানে করলেন। 'এতে আমি খুশি হই', বাবা আমায় পরে বলেছেন। মনে জ্বালা ধরানো ও স্তাবকতায় পরিপূর্ণ গাবরিয়েল এলিগিও-র নিজস্ব সুরমূর্ছনা 'বল্‌নাচের পরে' নিয়মিত শুনতে শুনতে লুইসার মন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাঁর ক্ষোভ দূর হয়। সবার আগে তিনি পরের দিন সকালবেলায় এলিগিও-র দেওয়া সব উপহার ফেরতপাঠিয়ে দিলেন। উপহার প্রত্যাখ্যান এবং নাচের আসর থেকে চলে আসা নিয়ে অনেক গালগল্প ছড়িয়ে পড়ল। লোকে ভাবল, একটা কালবৈশাখীর পরিসমাপ্তি। ধারণাটা আরও সম্পৃক্ত হল যখন লুইসা আবার শৈশবের মতো ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। এবং আমার

দিদিমা 'মিনা' চিকিৎসার জন্যে মেয়েকে নিয়ে সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালার অপর প্রান্তের নান্দনিক শহর মানাউরে-র দিকে রওনা দিলেন।

মা-বাবা দু-জনেই স্বীকার করেছেন যে এই সময় তাঁদের মধ্যে কোনোরকম যোগাযোগ ছিল না। তবে এটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ অসুস্থতা সারিয়ে মায়ের ফিরে আসার পরে দেখা গেল বাবাও তাঁর আশঙ্কা কাটিয়ে উঠেছেন। বাবা বলেছেন যে মা এবং মিনাকে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মানাউরে থেকে রওনা হওয়ার আগে দাদামশাইকে পাঠানো টেলিগ্রামটা পেশাগত কারণে প্রথম পড়ার সুযোগ আমার বাবারই পাওয়ার কথা। স্টেশনে মায়ের সঙ্গে করমর্দন করেই বাবা বুঝতে পারেন যে তিনি প্রেমের ছোঁওয়া পেয়ে গেছেন। মা কিন্তু সবসময়ই এই ঘটনাটা অস্বীকার করেছেন। তবে বাস্তবে এর পর থেকে তাঁদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ-এর বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে পড়ে। তবে কিছুতেই এই প্রেমপর্বের একটা পরিসমাপ্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরের সপ্তাহে মাসিমা ফ্রান্সিস্কা বাড়ির উঠোনের গাছের তলায় বসে সেলাই করতে করতে লুইসাকে বলেন, 'তোমার মা কিন্তু সব জানেন'।

লুইসা সান্তিয়াগা বরাবরই বলে এসেছেন যে পরিবারের বিরোধিতার জন্যেই তিনি মুখ বন্ধ করে রাগ গোপন করেছিলেন। প্রেমিকের সঙ্গে নাচতে অসম্মত হওয়ার পর থেকেই নাকি এমনটা ঘটে। কর্নেল আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিলেও মিনা-র মতো তাঁরও বিষয়টা পছন্দ হয়নি। সবাই ভেবেছিল যে মিনা-র আপত্তিতেই এইরকম হচ্ছে। প্রাচীন প্রবাদ অনুযায়ী সকলে আরও মনে করেছিল যে প্রেমিক মাত্রেই অপহরণকারী। আসলে সেই চিরকালীন কুসংস্কার এখনও অঙ্গারের মতো জ্বলন্ত — পৃথিবীটা ভোগী পুরুষদের এক বিশাল পরিবার আর সমস্ত অবিবাহিতা মহিলারা তাদের অসংখ্য বাচ্চাকাচ্চা সমেত রাস্তার বাসিন্দা।

বন্ধু বা পরিচিতেরা বয়স অনুযায়ী দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। আর যাঁরা কোনো পক্ষ নিলেন না ঘটনার ধারাবাহিকতা তাঁদের গ্রাস করল। অল্পবয়সিরা পরম উৎসাহে এলিগিওর পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের ধারণা হয়েছিল যে বেচারি প্রচলিত কুসংস্কারের শিকার। প্রবীণদের অনেকেই লুইসা সান্তিয়াগাকে দেখতেন একটি সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন হিসেবে। তাঁদের ধারণা, ভালোবাসা-টালোবাসা কিছু নয়; ভুঁইফোড় টেলিগ্রাফ অপারেটরটা স্রেফ নিজের ধান্দায় প্রেম নিবেদনের ভান করছে। এইসব শুনে স্বভাবে বিনয়ী-নম্র আমার মা সিংহীর দাপটে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। এমন ঘরোয়া বিবাদে একদিন মিনা-র মেজাজ এমনই চড়ে গেল যে তিনি একটি পাঁউরুটি-কাটা ছুরি নিয়ে নিজের মেয়েকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। নিজের যুক্তির পক্ষে লুইসা সান্তিয়াগা কিন্তু অবিচল। মিনা-র হঠাৎ উপলব্ধি হল যে তিনি একটা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল এবং তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'হে ভগবান'। অনুশোচনায় তিনি উনুনের জ্বলন্ত কয়লার উপর নিজের হাতদুটোকে চেপে ধরলেন।

গাবরিয়েল এলিগিও-র বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি, তিনি কুমারী মায়ের সন্তান। মাত্র চোদ্দো বছর বয়সেই তাঁর মা আরগেমিরা গার্সিয়া পাতেরনিনা জনৈক স্কুল-শিক্ষকের সঙ্গে নিতান্তই সাদামাটা এক অঘটনে জড়িয়ে যাওয়ায় এলিগিও-র জন্ম। রোগা-পাতলা চেহারার আরগেমিরা ফরসা-ফুটফুটে এক হাসিখুশি কিশোরী। এলিগিও-র পরে তাঁর আরও ছয়টি সন্তান হয়। তবে তাদের বাবা কিন্তু তিনজন ভিন্ন পুরুষ। কোনো স্থায়ী পুরুষ সঙ্গী

ছাড়াই আরগেমিরা সিন্‌সে শহরে বসবাস করতেন। মানসিক শক্তির জোরে একের পর এক জন্ম দেওয়া বাচ্চাদের তিনি নিজের হাতেই বড়ো করে তুলেছিলেন। এই গরিব পরিবারের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধির নাম, গাবরিয়েল এলিগিও। বিয়ের রাতেই আমার মায়ের কাছে অনুশোচনার সুরে এলিগিও বলেছিলেন যে ষোলো বছর বয়স থেকেই তাঁর অন্তত জনা-পাঁচেক প্রেমিকা ছিল। আমার কাছেও তিনি স্বীকার করেছেন যে আঠারো বছর বয়সে 'আচি' শহরে টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজ করার সময়েই তাঁর প্রথম ছেলে আবেলার্দো-র বয়স ছিল তিন বছর। 'আইয়াপেল' শহরে একই পেশায় তিনি যখন নিযুক্ত তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। এবং ততদিনে তিনি মাত্র কয়েক মাস বয়সের আরেকটি কন্যার পিতা হয়ে গেছেন। কারমেন রোসা নামের এই মেয়েটিকে পরে আর কোনোদিন তিনি দেখেননি। যদিও কারমেন-এর মাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল যে ফিরে এসেই বিয়েটা সেরে ফেলবেন। লুইসা সান্তিয়াগা-র সঙ্গে প্রেমপর্ব শুরু হওয়ার পর এলিগিও-র জীবনধারা পালটাতে শুরু করলে, একবার তিনি এই পুরোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আরও পরে আবেলার্দো এবং কারমেন-কে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেও আসলে তা ছিল পরিণতিহীন আইনি নিয়মরক্ষা মাত্র। ভাবতেও অবাক লাগে যে এলিগিও-র উচ্ছৃঙ্খল আচরণে কর্নেল মার্কেজ্ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। অথচ নিজের তিনটি বৈধ সন্তান ছাড়াও বিয়ের আগে ও পরে বিভিন্ন মহিলার সূত্রে কর্নেল আরও নয়টি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন। এবং আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল এই যে কর্নেলের স্ত্রী মানে আমার দিদিমা 'মিনা' কিন্তু বাচ্চাগুলোকে এমনভাবে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেন যেন ওরা তাঁর নিজেরই সন্তান। প্রথমবার শোনার পর থেকেই পূর্বপুরুষদের পাপকর্ম সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। এবং এগুলো সহ্য করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

গাবরিয়েল এলিগিও সম্পর্কে আরও আপত্তির কারণ যে তিনি রক্ষণশীল দলের সক্রিয় সদস্য। আর কর্নেল নিকোলাস মার্কেজ্ রক্ষণশীল দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বিখ্যাত। নীরলান্দিয়া এবং উইস্‌কন্‌সিন-এর সন্ধিচুক্তি ছিল একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। আসলে নির্মম মধ্যপন্থীরাই সরকার চালাচ্ছিল। গাবরিয়েল এলিগিও-র রক্ষণশীলতা কতটা আদর্শভিত্তিক, বলা মুশকিল। তবে পরিবার-পরিবেশের প্রভাবেই তিনি ছিলেন কট্টর রক্ষণশীল। আর এই কারণেই আমার মামাবাড়িতে তাঁর প্রখর বুদ্ধি বা নিরবচ্ছিন্ন সততা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এমনিতে বোঝা যেত না, আসলে আমার বাবা বরাবরই ভীষণ গরিব। সারাটা জীবন ধরে তিনি 'সবচেয়ে বড় শত্রু' হিসেবে দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে গেছেন। অথচ তিনি দারিদ্র্য সহ্য করতে পারতেন না। আবার কোনোদিনই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাননি। লুইসা সান্তিয়াগার প্রতি তাঁর ভালোবাসা সাহস ও সম্মানে পরিপূর্ণ। ভালোবাসাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যে তিনি নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। আরকাতাকায় টেলিগ্রাফ দপ্তরের পিছনের ঘরে টাঙানো একটা দোলনায় তাঁর নিঃসঙ্গ রাত্রিগুলো কাটত। অবিশ্যি ঘরে একটা ছোট্ট খাটও ছিল এবং সেটার স্প্রিংগুলোয় নিয়মিত তেলও দেওয়া হত। চোরা শিকারির মতো তাঁর এমন জীবনযাপন প্রক্রিয়া এক-এক সময় আমার প্রচণ্ড জট-পাকানো লাগে। কিন্তু জীবন আমায় শিখিয়েছে যে নিঃসঙ্গতার এত উত্তর রূপ আর কিছুই হতে পারে না। তখন তাঁর জন্যে আমার ভীষণ করুণা হয়।

সেইসব দুঃখ-কষ্টের দিনে এলিগিও একবার সবান্ধবে কর্নেলের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

তাঁকে ছাড়া আর সবাইকে আপ্যায়ন করে বসতে বলা হয়েছিল। অতি সম্প্রতি, মারা যাওয়ার আগেও তিনি এই গল্পটা আর-একবার শোনালেন। আমার মামাবাড়ির লোকেরা অবিশ্যি বরাবরই ঘটনাটাকে অস্বীকার করে এসেছেন। তাঁদের মতে এটা নাকি আমার বাবার মন-গড়া দুঃখবিলাস। তবে একবার, আমার দিদিমার বয়স যখন প্রায় একশো ছুঁইছুঁই, মনের দুঃখে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, 'বৈঠকখানার দরজার পাশে হতদরিদ্র মানুষটা দাঁড়িয়েছিল। কর্নেল ওকে একবার বসতেও বললেন না'। রসিয়ে রসিয়ে পুরোনো আমলের কাহিনী ফাঁস করতে আমার দিদিমার তুলনা ছিল না। মানুষটা কে ছিল প্রশ্ন করায় আমার দিদিমা 'মিনা' বলেছিলেন, 'কে আবার! ভায়োলিন হাতে গাবরিয়েল এলিগিও'।

কর্নেল মার্কেজ্-এর মতো একজন দুঁদে মানুষের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আমার বাবা একটা রিভলভার কিনেছিলেন। সামঞ্জস্যহীন নানান ঘটনায় জড়িয়ে থাকলেও, এটা ছিল তাঁর চরিত্রের সঙ্গে বেমানান। স্মিথ অ্যান্ড উইলসন কোম্পানির লম্বা ব্যারেলের এই রিভলভারটা কত হাত ঘুরে বাবার কাছে এসেছিল, বলা মুশকিল। আগের মালিকরা এই অস্ত্রটা দিয়ে কতগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল — তা-ই বা কে জানে? তবে এ-কথাটা নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় যে আমার বাবা কোনো কারণেই এমনকী কৌতূহলের বশে বা কাউকে ভয় দেখানোর জন্যেও কোনোদিন এটাকে ব্যবহার করেননি। বহুদিন বাদে তাঁর বড়ো ছেলে পাঁচটা বুলেট সমেত অস্ত্রটা খুঁজে পায়। তাঁর সন্ধ্যাসংগীতের সঙ্গী ভায়োলিনটার সঙ্গে একটা বাতিল জিনিসপত্রের বাক্সে রিভলভারটা গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

আমার মামাবাড়ির কঠোর আচরণে কিন্তু গাবরিয়েল এলিগিও এবং লুইসা সান্তিয়াগা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েননি। প্রথম প্রথম তাঁরা লুকিয়ে-চুরিয়ে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরে তাঁদের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল চিঠি, যা আবার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত এক বিচিত্র পদ্ধতিতে চালাচালি করতে হত। এলিগিও উপস্থিত থাকতে পারেন এমন কোনো অনুষ্ঠানে লুইসা-র যাওয়া বারণ ছিল। ফলে তাঁরা দূর থেকেই একে অপরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। মানসিক চাপ ক্রমশ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। আর লুইসার মায়ের প্রচণ্ড ক্রোধকে অগ্রাহ্য করা দু-জনের কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমার মা-বাবা জনসমক্ষে উপস্থিত হতেন না। প্রেমপত্র আদানপ্রদানের জন্য যখন আর কোনো ফাঁকফোকরই খোলা থাকল না তখন সুযোগের আশায় এক সর্বনেশে কৌশলের খোঁজ পাওয়া গেল। গাবরিয়েল এলিগিও-র জন্মদিনে হয়তো কেউ কেক পাঠাচ্ছে, কেকের বাক্সের তলায় লুইসা গুঁজে দিলেন জন্মদিনের শুভেচ্ছা-বার্তা। আবার এলিগিও, নকল তবে ক্ষতিকারক নয় এমন টেলিগ্রাম পাঠানো শুরু করলেন লুইসাকে, যেখানে কাজের কথাগুলো থাকত সাংকেতিক ভাষায় অথবা সহানুভূতিপূর্ণ শব্দে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ফ্রান্সিস্কার জটিল আচরণ এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল যে তিনি হয়ে গেলেন সকলের সন্দেহের শিকার। অনবরত অস্বীকার করা সত্ত্বেও মামাবাড়িতে তাঁর অধিকার আহত হল। কেবলমাত্র বাড়ির সদরের পাশের আলামন্দ গাছগুলোর ছায়ায় বসে সেলাই-ফোঁড়াই করার সময় ফ্রান্সিস্কা এবং লুইসা সান্তিয়াগাকে একসঙ্গে বসার অনুমতি দেওয়া হল। গাবরিয়েল এলিগিওর কিছুটা সুবিধা হল। রাস্তার ওপারে, ডাক্তার আন্তোনিও বারবোজা-র বাড়ির জানালা থেকে তখন তিনি ইশারায় লুইসার সঙ্গে ভাব বিনিময় শুরু করলেন। লুইসা সান্তিয়াগা বিষয়টা এমন চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন যে ফ্রান্সিস্কা অন্যমনস্ক

হওয়া মাত্রই তিনি প্রেমিকের সঙ্গে শব্দবিহীন কথোপকথন শুরু করতেন। ডাক্তার বারবোজা-র স্ত্রী এবং লুইসা-র সহচরী ও সবচেয়ে সাহসী সঙ্গী আদরিনা বেরদুগো ছিলেন শরীরী ভাষায় এমন বিশেষ কায়দায় কথা বলার পদ্ধতির উদ্ভাবক।

প্রেমানলের হালকা আঁচকে জ্বালিয়ে রাখার জন্যে তাঁদের দু-জনের পক্ষেই যোগাযোগের এমন বিচিত্র বন্দোবস্ত যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক ছিল। এর মধ্যে লুইসা সান্তিয়াগা-র একটি চিঠি গাবরিয়েল এলিগিওকে রীতিমতো চিন্তিত করে তোলে। লুইসা যোগাযোগের অন্য পন্থা খোঁজার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এক চিলতে কাগজ মারফত লুইসা কোনোরকমে খবর পাঠালেন যে তাঁকে বারানকাস-এ পাঠানোর চেষ্টা চলছে। দ্রুতগামী জাহাজে চড়ে রিওহাচা নদী দিয়ে, কোনোরকমে এক রাত্রির সফর নয়, খচ্চরের পিঠে চেপে সিয়েরা নেভাদা-র পাহাড় পেরিয়ে, পাদিলা-র প্রশস্ত প্রান্তর ছাড়িয়ে তাঁদের যেতে হবে।

অনেকদিন পরে মা আমায় বলেছিলেন — 'আমি বরং মরেই যেতাম'। একটানা তিন দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে এবং শুধুমাত্র জল আর পাঁউরুটি ছাড়া অন্য কিছু না খেয়ে সত্যি সত্যিই তিনি মরবার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তবে কর্নেলের প্রতি সমীহ-মিশ্রিত ভয়ের দাপটে তাঁর প্রাণত্যাগের ইচ্ছে উবে যায়। গাবরিয়েল এলিগিও বুঝতে পারেন যে ঘটনা আর বেশি দূর এগোবে না। অতএব তিনি এমন এক চরম সিদ্ধান্ত নিলেন যা একদিকে যেমন প্রচণ্ড ঝুঁকির অন্যদিকে আবার তেমনই অনায়াসসাধ্য। তিনি ডাক্তার বারবোজার বাড়ি থেকে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তার ওপারে কর্নেলের বাড়ির সদরের পাশের আলামন্দ গাছগুলোর ছায়ায় বসে সীবনশিল্পে ব্যস্ত ভীত-সন্ত্রস্ত দুই নারীর সামনে উপস্থিত। দু-জনের একজন আমার মা লুইসা সান্তিয়াগা আর অন্য জন — তাঁর মাসিমা ফ্রান্সিস্কা। এলিগিও ফ্রান্সিস্কাকে বললেন, 'আমাদের একটু একান্তে কথা বলার সুযোগ দিন। ওকে, শুধুমাত্র ওকেই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব'।

'কী ধৃষ্টতা', মাসিমা ফ্রান্সিস্কা মন্তব্য করলেন। তার পর ফ্রান্সিস্কা আরও বললেন, 'আমার সামনে বলা যায় না এমন কোনো কথা তোমার থাকতে পারে না'। 'তা হলে আমি কিছুই বলব না। তবে আপনাকে জানিয়ে দিয়ে গেলাম যে এর ফলে যা কিছু ঘটবে তার জন্যে কিন্তু আপনিই দায়ী থাকবেন' — বাবা গাঁকগাঁক করে জবাব দিয়েছিলেন।

লুইসা সান্তিয়াগা যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েই মাসিমা ফ্রান্সিস্কা-র কাছে একটু সময় প্রার্থনা করলেন। তখন গাবরিয়েল এলিগিও আমার মাকে বললেন যে একটা শর্তে লুইসা যতদিন খুশি মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারে। লুইসাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তিনি এলিগিওকেই বিয়ে করবেন। এমন প্রস্তাবে আমার মা খুশি হয়ে বলেছিলেন যে একমাত্র মৃত্যুই তাঁদের বিয়েটা ভেঙে দিতে পারে।

প্রায় বছরখানেক প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখা গিয়েছিল। বিষয়টা যে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক তা দু-জনের কেউ-ই আগে বুঝতে পারেননি। ভ্রমণের প্রথম দু-সপ্তাহ লুইসা সান্তিয়াগার পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। পশুচালানকারীদের একটা বড়ো দলের সঙ্গে লুইসাদের যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। খচ্চরের পিঠে চড়ে লুইসাদের সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালা পার হতে হয়। লুইসা আর তাঁর মায়ের সহযাত্রী ছিল বাড়ির কাজের মেয়ে — চোন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেদার্দো পাচেকো-কে হত্যার পরে কর্নেলের পরিবার বারানকাস ছেড়ে আসার সময় থেকেই চোন, ও বাড়ির সর্বক্ষণের কর্মী। যাত্রাপথের কষ্ট বিশেষত খাড়াই পাহাড়, এবড়োখেবড়ো পাথুরে

রাস্তা সম্পর্কে কর্নেলের ধারণা ছিল। কারণ, গৃহযুদ্ধের সময় এইসব এলাকায় তিনি অনেক দিন ছিলেন। এমনকী বেশ কয়েকটি ছেলে-মেয়েরও জন্ম দিয়েছিলেন। তবে সেইসব বাচ্চাদের ফেলে রেখেই তাঁকে চলে যেতে হয়। অবিশ্যি তাঁর স্ত্রী জলযাত্রার তিক্ত অভিজ্ঞতা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে না জেনেই এই পথটা বেছে নিয়েছিলেন। লুইসা জীবনে এই প্রথম খচ্চরে চড়লেন। প্রখর রোদ, ভয়ংকর বৃষ্টির এমন পথশ্রম তাঁর পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়াল। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার খাঁজ দিয়ে বয়ে আসা ঘুমপাড়ানি হাওয়ায় তাঁর মনে দোলা লাগে। ওদিকে তাঁর মন তখন একটা সুতোর উপর ঝুলছে। অনিশ্চিত প্রেমিকের চিন্তায় তিনি বিভোর। চতুর্থ দিনে লুইসা আর থাকতে না পেরে মাকে বললেন যে এবার বাড়ি ফিরে না গেলে তিনি পাহাড়চূড়া থেকে ঝাঁপ দেবেন। মেয়ের চেয়ে ত্রানকিলিনা ইগোয়ারান কোতেস্ মানে আমার দিদিমা অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং ভয় পেয়েছিলেন। এবং তিনিও মেয়ের মতকেই সমর্থন করলেন। কিন্তু পশুপালকদের সর্দার যাত্রাপথের মানচিত্রটা মা ও মেয়ের সামনে খুলে ধরে দেখিয়ে দিল যে ফিরে যাওয়াটা আরও কষ্টকর। এগারো দিনের মাথায় একটু স্বস্তি পাওয়া গেল। পাহাড়ের উপর থেকে ভাইয়েদুপার-এর সমভূমি নজরে এল।

প্রথম পর্ব চুকে যাওয়ার পর গাবরিয়েল এলিগিও তাঁর বিচিত্র প্রেমের খোঁজখবর রাখার জন্যে একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। বারানকাস-এ পৌঁছোনোর আগে লুইসা ও তাঁর মা যে-সাতটি শহরে থেমেছিলেন সেইসব শহরের টেলিগ্রাফ অপারেটরদের কাছ থেকে নিয়মিত তাঁর প্রেমিকার খবরাখবর পেতেন। লুইসাও নিজের মতো করে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরো প্রদেশটায় 'ইগোয়ারান' এবং 'কোতেস্' নামের ছড়াছড়ি। সেই ভিড়ের মধ্যে লুইসা নিজের তারবার্তাটি ঠিকমতো উদ্ধার করতে পারতেন। ভাইয়েদুপার-এ তাঁরা মাস-তিনেক ছিলেন। আর পুরো সফরটা ছিল এক বছরের। সব জায়গা থেকেই লুইসা যোগাযোগ রেখেছিলেন এলিগিওর সঙ্গে। প্রতিটি শহরেই তিনি স্থানীয় টেলিগ্রাফ দপ্তরে নিয়মিত হাজিরা দিতেন, যাতে এলিগিওকে তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়া যায়। এই সময়টায় চোন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। লুইসার তারবার্তা, চোন নিজের পোশাকের ভিতরে লুকিয়ে নিয়ে আসতেন। চোন এমনিতেই কম কথার মানুষ। তার উপর তিনি লেখাপড়াও জানতেন না। আমার মা-বাবার প্রেমপর্বের গোপনীয়তা প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি মারা যান।

প্রায় ষাট বছর পরে, *এল আমোর এন লোস্ ইয়েম্পোস্ দে কোলেরা (লাভ ইন্ দা টাইম অফ্ কলেরা)* উপন্যাস নতুন করে সাজানোর সময় বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে সেই আমলে পেশাদার টেলিগ্রাফ অপারেটররা নিজেদের জন্যে কোনো সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করতেন কি না। এক মুহূর্তও চিন্তা না করে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, — 'গোঁজ বসানো'। অভিধানে শব্দটির মানে দেওয়া আছে। তবে এ-ক্ষেত্রে সেই মানে ততটা কাজে লাগে না। বাবা আমায় বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু এই শব্দটাই বেছেছিলাম। কারণ, টেলিগ্রাফ দপ্তরের যাবতীয় যন্ত্রপাতি একটা প্যানেলের উপর বসানো থাকে। আর প্যানেলটা দেয়ালে বসানো একটা গোঁজের উপর টাঙিয়ে দেওয়া হয়'। এ-বিষয়ে পরে আর কোনোদিনই আমি বাবার সঙ্গে আলোচনা করিনি। তবে আমার বাবার মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটি সংবাদপত্র তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় প্রশ্ন করেছিল যে যদি তিনি কোনো উপন্যাস লেখেন তবে তার নাম কী দেবেন। উত্তরে বাবা বলেছিলেন যে অমন পরিকল্পনা তিনি শিকেয় তুলে দিয়েছেন। 'গোঁজ বসানো' নিয়ে

কথা বলার সময়ই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি সেই বিষয়েই একটা উপন্যাস লিখতে চলেছি যা আসলে তাঁর লেখার ইচ্ছা ছিল।

সেই সময়কার এমন এক দুঃখজনক ঘটনার কথা বাবা আমায় বলেছেন যা বাস্তবায়িত হলে আমাদের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারত। ছ-মাস একটানা ভ্রমণের পরে আমার মা তখন 'সন্ হুয়ান্ দেল্ সেজার্' শহরে পৌঁছেছেন। গোপনে তিনি আমার বাবা গাবরিয়েল এলিগিওকে জানালেন যে তাঁর মা নাকি স্থায়ীভাবে বারানকাস-এ বসবাসের কথা ভাবছেন। তবে মেদার্দো পাচেকো-র সঙ্গে কর্নেলের লড়াইয়ের ব্যাপারটা লোকের মন থেকে মুছে গেছে কি না বুঝে নেওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখন মনে হয়, ব্যাপারটা হাস্যকর ছিল। কারণ, কর্নেলের পরিবার তখন খারাপ সময় পেরিয়ে এসে আরকাতাকা-য় কলা কোম্পানির সুবাদে ক্ষমতার শীর্ষে। আর কলা কোম্পানিটি তখন নতুন করে স্বপ্নের বাগান গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুত জমি উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত। গোঁয়ার্তুমি দেখিয়ে কর্নেলের পরিবারের লোকেরা বাড়ির মেয়েটিকে ঈগলের নখ থেকে ছেড়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় তাঁদের সুখ-আনন্দ বিসর্জন দিতে হয়নি। গাবরিয়েল এলিগিও, বারানকাস থেকে একশো কিলোমিটারেরও বেশি দূরের শহর রিওহাচা-য় চাকরিস্থল পরিবর্তনের জন্যে আবেদন করলেন। তক্ষুনি কোনো পদ খালি ছিল না। তবে কর্তৃপক্ষ জানায় যে বিষয়টা নজরে রাখা হবে।

মায়ের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে লুইসা সান্তিয়াগা কিছুই জানতে পারেননি। আবার অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার সাহসও তাঁর নেই। তবে তিনি লক্ষ করছিলেন যে যতই তাঁরা বারানকাস-এর দিকে এগিয়ে চলেছিলেন ততই তাঁর মাকে আনন্দিত ও শান্ত দেখাচ্ছিল। একান্ত আস্থাভাজন চোন পর্যন্ত এ-ব্যাপারে আমার মা-কে কোনো খবর দিতে পারেননি। গোপন কথাটা খুঁজে বের করার জন্যে লুইসা সান্তিয়াগা তাঁর মা-কে বললেন যে বারানকাস তাঁর বেশ লাগছে। এবং তিনি সেখানেই থেকে যেতে চান। আমার দিদিমা ক্ষণেকের জন্যে অস্বস্তিতে পড়ে গেলেও কোনো উত্তর দেননি। আর মেয়ে লুইসা বুঝতে পারলেন যে তিনি গোপন সিদ্ধান্তটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লুইসা নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিলেন। রাস্তার এক জিপসি জ্যোতিষী তাঁর ভাগ্য গণনা করে বলেছিলেন যে বারানকাস-এ লুইসার থাকা সম্পর্কে কিছু বলা না গেলেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে দূরে বসবাসকারী কোনো পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘ ও সুখী জীবনযাপনে কোনো বাধা থাকবে না; এবং মানুষটি তাঁকে আমৃত্যু ভালোবাসবে। জিপসি জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণীতে লুইসার ধড়ে প্রাণ আসে। কারণ জ্যোতিষী উল্লিখিত পুরুষটির গুণাবলির অধিকাংশই তাঁর প্রেমিকের মধ্যে নিহিত। জিপসি জ্যোতিষী তাঁকে আরও বলেছিল যে তাঁদের ছয়টি ছেলে-মেয়ে হবে। এ-কথা শুনে তিনি নাকি ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন, আমায় অন্তত সেরকমই বলেছেন। যদিও বাস্তবে তাঁর ছেলে-মেয়ের সংখ্যা ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রায় দ্বিগুণ। পূর্বাভাস শোনার পর তাঁদের উৎসাহ অসম্ভব বেড়ে গেল। টেলিগ্রাফ মারফত তাঁদের বার্তা-বিনিময় গেল বন্ধ হয়ে। প্রচণ্ড নিয়মতান্ত্রিক ও বাস্তবানুগ হয়ে উঠলেন তাঁরা। দিনক্ষণ স্থির করে তাঁরা দেখাসাক্ষাৎ করতে লাগলেন। রোজগারের বন্দোবস্ত হল। আর অন্য কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই অবিলম্বে বিয়েটা সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন।

লুইসা সান্তিয়াগা এমনই দৃঢ়প্রত্যয়ী ও বিশ্বস্ত ছিলেন যে ফোল্কো শহরের একটি নাচের

আসরে প্রেমিকের অনুমতি ছাড়া উপস্থিত হওয়াকে যথাযথ বলে মনে করলেন না। এলিগিও তখন আরকাতাকা-য় জ্বরে বেহুঁশ। একশো তিন ডিগ্রি জ্বর। দোলনায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি খাচ্ছেন। সেই অবস্থায় তিনি শুনতে পেলেন যে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটায় একটা বার্তা আসছে। ফোন্সেকার টেলিগ্রাফ দপ্তর থেকে খবরটা আসছিল। গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ফোন্সেকার অপারেটর জানতে চেয়েছিলেন যে আরকাতাকা থেকে কে কথা বলছেন। কৃতজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময় প্রকাশ করে এলিগিও বলেছিলেন, 'ওকে বলুন যে আমি ওর ঈশ্বরীয় পুত্র'। আমার মা এই সাংকেতিক শব্দটার মানে বুঝতে পেরে পরের দিন সকাল সাতটা পর্যন্ত নাচের আসরে কাটিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরেই তাড়াহুড়ো করে পোশাক পালটিয়ে গির্জার দিকে লাগালেন এক ছুট, যাতে প্রার্থনাসভায় দেরি না হয়।

বারানকাস-এ কর্নেলের পরিবারের প্রতি বিরুদ্ধাচারণের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। বরং সেই মুখোমুখি লড়াই-এর আঠারো বছর বাদে মেদার্দো পাচেকো-র আত্মীয়স্বজনেরা খ্রিস্টীয় প্রথানুযায়ী 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া'-র নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তার উপর মেদার্দো পাচেকো-র জ্ঞাতি-পরিজনেরা লুইসা সান্তিয়াগা ও তাঁর মাকে এমন সাদর সম্ভাষণ জানালেন যে লুইসা সান্তিয়াগা, বারানকাস-এর উষর মরূদ্যানেই থেকে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলেন। আরকাতাকা-র গরম, ধুলো আর মুণ্ডহীন-কন্ধকাটা ভূত ও রক্তপিপাসু শনিবারগুলোর তুলনায় বারানকাস তাঁর কাছে অনেক ভালো লাগল। গাবরিয়েল এলিগিও-র কাছেও এই অভিমতটা পৌঁছে যায়। এবং তিনিও রিওহাচা-য় বদলি হওয়ার শর্তে প্রস্তাবটাকে সমর্থন করেন। লুইসা কিন্তু বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বারানকাস-এ কর্নেল পরিবারের পাকাপাকি বসবাসের সিদ্ধান্তটা তখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি।

দিদিমা মিনা ছাড়া অন্য কারও প্রস্তাবটায় সায় ছিল না। তাঁর ছেলে, মানে আমার মামা হুয়ান দে দিওস্-কে লেখা একটি চিঠি এর সাক্ষী। মামা অবিশ্যি উত্তরে দিদিমাকে লিখেছিলেন যে 'লা গুয়াহিরা'-র আইনানুযায়ী মেদার্দো পাচেকো-র মৃত্যুর পর কুড়ি বছর কেটে না যাওয়া পর্যন্ত বারানকাস-এ ফিরে যাওয়া সমীচীন হবে না। আইনে আরও বলা ছিল যে বিবদমান দুই পরিবারকে সামনাসামনি বসে সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং আক্রমণকারীর পরিবার, আক্রান্তদের একজন পুরুষ সদস্যের জন্যে ক্ষতিপূরণ দেবে। আমার মামা আইনের এই ধারা নিয়ে এতই শঙ্কিত ছিলেন যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে তাঁর ছেলে এদুয়ার্দো জনস্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগের চাকরি নিয়ে বারানকাস যেতে চাইলে তিনি আপত্তি করেন।

এতসব ত্রাস-শঙ্কা সত্ত্বেও পরের তিন দিনে জট-পাকানো পরিস্থিতির সমাধান হল। সেই মঙ্গলবারে লুইসা সান্তিয়াগা জানালেন যে মিনা বারানকাস-এ আস্তানা বাঁধার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছেন। গাবরিয়েল এলিগিও-ও জানতে পারলেন যে রিওহাচা-র টেলিগ্রাফ অপারেটরের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় পদটি খালি হয়েছে। পরের দিন সকালে মিনা ভাঁড়ার ঘরে ভেড়ার লোম-ছাঁটা কাঁচিটা খুঁজতে গিয়ে একটা পুরোনো বিস্কুটের কৌটোয় পেয়ে গেলেন তাঁর মেয়ের একতাড়া প্রেমপত্র, যেগুলো আসলে টেলিগ্রাম হিসেবে এসেছিল। তীব্র রোষ কোনোরকমে চেপে রেখে তিনি নিজস্ব কায়দায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, — 'অবাধ্যতা ছাড়া ভগবান সব কিছুই ক্ষমা করেন'। সেই সপ্তাহের শেষ নাগাদ তাঁরা রিওহাচা-য় যাওয়ার উদ্দেশ্যে জলপথে সান্তা মারতা-য় পৌঁছোলেন। দু-জনের কেউ-ই ফেব্রুয়ারি মাসের সেই

ভয়ংকর রাত্রির প্রবল বাতাস নজর করলেন না। মা পরাজয়ে বিধ্বস্ত। মেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত, কিন্তু খুশি। প্রেমপত্রগুলো আবিষ্কার করায় বিগ্বিত শান্তি-স্থৈর্যের যথার্থ কারণ মিনা খুঁজে পেলেন। পরের দিন সকাল সাতটার ট্রেনে মিনা একাই আরকাতাকা-য় ফিরে গেলেন।

ভালোবাসার দানবের হাত থেকে নিশ্চিতভাবে রক্ষা পাওয়া মেয়েকে সান্তা মারতা-য় রেখে এলেন ছেলে হুয়ান দে দিওস্-এর কাছে। তবে উলটো ব্যাপারটাই ছিল বাস্তব সত্য। লুইসার সঙ্গে দেখা করার জন্যে গাবরিয়েল এলিগিও আরকাতাকা থেকে সান্তা মারতা-র দিকে রওনা দিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতার আঁচে পরিশীলিত ও পরীক্ষিত আমার মামা হুয়ান ঠিক করেছিলেন যে তিনি কোনো পক্ষেই যাবেন না। যে-মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে বোনের প্রেমের প্রতি ভক্তি এবং মা-বাবার নির্দেশের উপর শ্রদ্ধার ফাঁসে তিনি অবরুদ্ধ হতে চলেছেন, নিজের প্রবাদপ্রতিম নির্বিরোধী চরিত্র বজায় রাখার জন্যে তাঁর সেই বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। একান্তে অথবা তাঁর জ্ঞাতসারে নয়, বাড়ির বাইরে তিনি লুইসা ও গাবরিয়েল-কে দেখাসাক্ষাৎ মেলামেশার অনুমতি দিলেন। মামিমা দিলিয়া কাবালিয়েরো ক্ষমা করেছিলেন ঠিকই, তবে ভুলে যাননি যে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এক সময় তাঁর সঙ্গে গোপনে কেমন ব্যবহার করেছিল। এবার ননদের উপর অভ্রান্তভাবে তিনি সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন।

সুতরাং গাবরিয়েল এলিগিও ও লুইসা সান্তিয়াগা-র নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ শুরু হল। প্রথমে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে, তার পর একটু ঝুঁকি নিয়ে সেইসব জায়গায় যেখানে ভিড় কম। তারও পরে মামার অনুপস্থিতিতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা। প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করা হল। বাড়িতে বসে প্রেমালাপ নয়। লুইসা ঘরের ভিতর জানালার ধারে আর জানালার ওপাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাবরিয়েল এলিগিও। মনে হয় আপত্তিকর প্রেম চালিয়ে যাওয়ার জন্যেই এমন একটা জানালা তৈরি হয়েছিল। আন্দালুসিয়ান নকশার গ্রিলের উপর দ্রাক্ষালতা ছড়িয়ে আছে। গুমোট রাতে হঠাৎ করে হালকা হাওয়া বয়ে গেলে এমন জানালা দিয়েই ঘরে জুঁইফুলের সুগন্ধ প্রবেশ করে। মামিমা দিলিয়া সবকিছুই আন্দাজ করতে পারছিলেন। তিনি আরও জানতেন যে কয়েকজন প্রতিবেশী যথাসময়ে সাংকেতিক শিস্ দিয়ে ওদের সতর্ক করে দেয়। এক রাতে অবিশ্যি সব সতর্কতা ব্যর্থ হল। সত্যের কাছে মামা নিজেকে সমর্পণ করলেন। মামিমা এই সুযোগে লুইসা সান্তিয়াগা এবং গাবরিয়েল এলিগিও-কে ডেকে এনে বৈঠকখানায় বসালেন। জানালাটাকেও পুরো খুলে দেওয়া হল যাতে সকলের চোখে পড়ে। সেই মুহূর্তে আমার মামা যে-স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন তা আমার মা কোনোদিন ভোলেননি — 'উঃ! কী শান্তি!'

প্রায় একই সময়ে রিওহাচা-র টেলিগ্রাফ দপ্তরে বদলির আনুষ্ঠানিক নির্দেশ পেলেন গাবরিয়েল এলিগিও। আবার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আমার মা দেশের বিশপের প্রতিনিধি-স্থানীয় যাজক 'মোনসিনোর পেদ্রো এস্পেহো'-র কাছে আবেদন করলেন যাতে অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়াই তাঁদের বিয়েটা হতে পারে। মোনসিনোর এত বিখ্যাত ছিলেন যে সান্তা মারতা-র বাসিন্দারা তাঁকে সবকিছুর রক্ষাকর্তা হিসেবে শ্রদ্ধা করত। প্রার্থনাশেষের 'উন্নতিসাধন' (এলিভেশন) পর্যায়ে পৌঁছোনোর পর নাকি তিনি মাটি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার উপরে শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকতেন; এটা দেখার জন্যেই নাকি অনেকে তাঁর প্রার্থনাসভায় উপস্থিত হত। পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষায় যত্নশীল বলে পরিচিত কর্নেলের পরিবারের একটি মেয়ের আবেদন তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখান করলেন। তবে গির্জার প্রশাসনের মাধ্যমে

গোপনে আমার বাবার পরিবারের সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করলেন। গাবরিয়েল এলিগিও-র মা আরগেমিরা গার্সিয়া-র স্বেচ্ছাচারকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে সিন্‌সে শহরের যাজক একটি সাদামাটা অথচ পরোপকারী ধরনের সমাধানসূত্র আবিষ্কার করলেন — 'তেমন ধর্মপ্রাণ না হলেও ভদ্র ও স্বচ্ছল পরিবার'। এর পরে মোনসিনোর লুইসা সান্তিয়াগা এবং গাবরিয়েল এলিগিও-র সঙ্গে একত্রে ও আলাদা করে আলোচনা করলেন। সবশেষে কর্নেল এবং মিনা-কে চিঠি দিয়ে তিনি জানালেন যে নিশ্চিতভাবে বলা যায় কোনো পার্থিব শক্তিই এদের অদম্য ভালোবাসাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ঈশ্বরের শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে আমার দিদিমা ও দাদামশাই জীবনের একটি বেদনাদায়ক পৃষ্ঠা ওলটাতে রাজি হলেন। তাঁদের ছেলে হুয়ান দে দিওস-কে বিয়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা নিজেরা বিবাহানুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন না। তবে ফ্রান্সিস্‌কা সিমোদোসেয়া-কে কনে-কর্ত্রী হিসেবে সান্তা মারতা-য় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সান্তা মারতা-র গির্জায় ১৯২৬-এর ১১ জুন আমার মা-বাবার বিয়ে হয়। বিয়েটা শুরু হতে মিনিট চল্লিশ দেরি হয়েছিল। কারণ, তারিখটা ঠিকমতো খেয়াল না থাকায় কনের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সকাল আটটা বেজে যায়। সেই রাতেই জাহাজে করে নবদম্পতি রিওহাচা-র উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন যাতে গাবরিয়েল এলিগিও ঠিক সময়ে নতুন দপ্তরের দায়িত্ব বুঝে নিতে পারেন। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় বিয়ের পর প্রথম রাতটা সংযমে কাটে।

মধুচন্দ্রিমা কাটানো বাড়িটার ব্যাপারে আমার মা সবসময়ই ছিলেন স্মৃতিবিভোর। তাঁর বড়ো ছেলেকে যেভাবে তিনি ঘরের পর ঘর মিলিয়ে বাড়িটার সম্পর্কে বলেছেন যেন মনে হয় আমরা সবাই ওখানে একসঙ্গেই থাকতাম। মায়ের মুখে শুনে শুনে গড়ে-ওঠা সেই নকল স্মৃতি আজও আমায় নাড়া দেয়। অথচ ষাট বছরের জন্মদিনের আগে কোনোদিনই আমি রিওহাচা-য় যাইনি। বিস্মিত হয়ে আমার মনে হয়েছিল যে টেলিগ্রাফ অপারেটরের ওই বাড়িটা নিয়ে আমার কোনো স্মৃতি থাকা উচিত নয়। শৈশব থেকেই মনোরম রিওহাচা শহর যার সোরা-য় মোড়ানো রাস্তাগুলো সাগরের পাঁকের মধ্যে মিলিয়ে গেছে, আমার কল্পনার স্মৃতিকে তীক্ষ্ণভাবে খোঁচা মারে, যাকে বাস্তবে অমন অবস্থায় কোনোদিনই দেখিনি। মায়ের স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে কুড়িয়ে আনা নুড়িগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে আমি গড়ে তুলেছিলাম কল্পনার রিওহাচা শহর যাকে আজকের বাস্তবতায় কোনোদিনই দেখা যাবে না।

মাস-দুয়েক বাদেই বাবা আমার মামা হুয়ান দে দিওস্-কে এক তারবার্তায় জানালেন যে লুইসা সান্তিয়াগা অন্তঃসত্ত্বা। খবরটা আরকাতাকা-র বাড়িতে রীতিমতো একটা ঝাঁকুনি দিল। মিনা তখনও মানসিক বিরক্তি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে তিনি ও কর্নেল সব রাগ-দুঃখ ভুলে নবদম্পতিকে অবিলম্বে আরকাতাকা-য় আসার আমন্ত্রণ জানালেন। বিষয়টা কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না। গাবরিয়েল এলিগিও এবং লুইসা সান্তিয়াগা কয়েক মাস ধরে যুক্তি দিয়ে খোলা-মনে বিষয়টা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে কর্নেলের আরকাতাকা-র বাড়িতেই তাঁদের প্রথম সন্তান জন্ম নেবে।

কয়েকদিন বাদে মা-বাবা আরকাতাকা-য় পৌঁছোলেন। 'তোমার সন্তুষ্টির জন্যে আমি সব-কিছু দিতে তৈরি', — স্টেশনেই আমার দাদামশাই কর্নেল নিকোলাস মার্কেজ্ এই ভাষায় আমার বাবা গাবরিয়েল এলিগিও-কে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। এই সম্ভাষণটা আমাদের

পরিবারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। দিদিমা নিজেদের শোওয়ার ঘরটা মেয়ে-জামাই-এর জন্যে ছেড়ে দিলেন। বছরের শেষ দিকে গাবরিয়েল এলিগিও টেলিগ্রাফ অপারেটরের মূল্যবান চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে স্বশিক্ষিত হোমিওপ্যাথিক বিদ্যা নিয়ে চিকিৎসা-ব্যাবসা শুরু করলেন। কৃতজ্ঞতা বোধ অথবা অনুশোচনা থেকে আমার দাদামশাই কর্নেল নিকোলাস মার্কেজ্ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিজেদের বাড়ির সামনের রাস্তাটার নতুন নামকরণ করালেন, — 'মোনসিনোর এস্‌পেহো আভেনুএ'। রাস্তাটা আজও সেই নামেই পরিচিত।

১৯২৭-এর ৬ মার্চ, ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে বৃষ রাশির জাতক হয়ে লুইসা সান্তিয়াগা-র সাত ছেলে ও চার মেয়ের প্রথমটি আরকাতাকা-য় জন্ম নিল। মায়ের নাড়ির জট গলায় জড়িয়ে যাওয়ায় আমি তখন মরণাপন্ন। বরাবরের পারিবারিক ধাত্রী সান্তোসভিয়েকো-র জ্ঞানগম্যি-অভিজ্ঞতা হঠাৎই যেন উবে গিয়েছিল। ওদিকে মায়ের মাসিমা ফ্রান্সিস্‌কা আনন্দে আত্মহারা। আগুন লাগলে মানুষ যেমন উত্তেজিত হয় সেইরকমভাবে সদরের দিকে ছুটে যেতে যেতে তিনি চিৎকার করতে থাকেন, 'ছেলে হয়েছে'। তখনই তাঁর হুঁশ হয় যে বাচ্চাটা তো মরতে বসেছে।

আনন্দ-উৎসবের উদ্দেশ্যে নয়, নবজাতকের গায়ে মালিশ করার জন্যে মদ আনা হল। সৌভাগ্যবশত সেই সময় আমার মায়ের পাশে উপস্থিত ভেনেজুয়েলার মহীয়সী নারী হুয়ানা দে ফ্রেইতেস। পরে তিনি আমায় বলেছেন যে নাড়ি জড়িয়ে যাওয়ার চেয়েও বিপজ্জনক ছিল মায়ের শোওয়ার ভঙ্গি। এর ফলে সদ্যোজাত শিশুটিকে উদ্ধার করা খুবই জটিল হয়ে পড়ে। হুয়ানা মাকে ঠিক করে শুইয়ে দিয়ে নবজাতককে রক্ষা করেন। আর উদ্ধার পাওয়া মাত্রই মায়ের মাসিমা ফ্রান্সিস্‌কা আমার গায়ে পবিত্র জল ছোটানো শুরু করেন। সেই দিনের জন্যে নির্ধারিত সেইন্ট-এর নামানুসারে আমার নাম রাখা উচিত ছিল — ওলেগারিও। কিন্তু হাতের কাছে কোনো পঞ্জিকা না থাকায় বাবার নামে আমার প্রথম নাম রাখা হল, গাবরিয়েল। আরকাতাকা শহরের 'প্যাট্রন সেইন্ট' জোসেফ। আবার মার্চ মাসটাও সূত্রধর জোসেফের উদ্দেশে নিবেদিত। স্বভাবতই আমার দ্বিতীয় নাম হল — জোসেফ, মানে স্প্যানিশ ভাষার 'হোসে'। আমার জন্মের ফলে দুই পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেকার পুরোনো ঝগড়া-ঝাঁটি মিটে গিয়ে মিলমিশ হয়ে যাওয়ায় হুয়ান দে ফ্রেইতেস আমার জন্যে একটি যথার্থ তৃতীয় নাম রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। তবে বছর-তিনেক বাদে আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণের সময় সবাই ভুলে গিয়েছিলেন যে জন্মের সময় আমার নাম রাখা হয়েছিল, গাবরিয়েল হোসে দে লা কোনকোর্দিয়া।

আলোচনা

ভেবে দেখুন

ড: গৌরীপদ দত্ত

[লেখক চিকিৎসাজগতে একটি পরিচিত নাম। আজন্ম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের সভ্য ও সাবজেক্ট কমিটির হেলথ্ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের চেয়ারম্যান]

অনেক বছর আগে এক বিখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধুর স্ত্রীকে আমার গাড়িতে করে লিফ্‌ট দিচ্ছিলাম। বন্ধুপত্নী সমাজমনস্কা এবং শিক্ষাব্রতী। কথায় কথায় উনি বললেন—আপনারা মানে ডাক্তাররা বেশ ভালোই আছেন। ডাক্তারি করে বেশ টাকাপয়সা পান, আবার লোকে আপনাদের শ্রদ্ধাও করে। ভগবান বলে।

আমি বললাম, আপনার ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। ডাক্তারদের বেশ-কিছু পয়সা পেতে, অন্য বৃত্তির তুলনায় জীবনের বেশ-কিছু সময় খরচা করতে হয়। তার কিছুটা ডাক্তারি পড়তে এবং পরে অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখতে। অন্য যে-কোনো বিভাগে ডিগ্রি পেতে যা সময় লাগে ডাক্তারির ডিগ্রি পেতে তার চেয়ে দুই থেকে চার বছর বেশি সময় লাগে। এর উপর আছে শিক্ষানবিশির সময়কাল। প্র্যাকটিস জমাতে হলে বেশির ভাগ ডাক্তারদেরই পশ্চাদ্‌দেশে বার্সাইটিস (Bursitis) না হলে অর্থাৎ কড়া না পড়লে পসার জমে না।

আর সম্মান বা ভগবান ভাবার কথা বলছেন? ওটা একদম আপেক্ষিক (relative)। কারণ বৈদ্য প্রশস্তিতে বলা হয় 'বৈদ্যরাজ নমস্তুভ্যং যমরাজ সহোদর'! আরও বলা হয় যম শুধু প্রাণটাই নেয়, তুমি প্রাণও নাও তার সঙ্গে টাকাটাও নাও।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক Bernard Shaw বলেছেন, God cures the patients, doctors get the fee's। অবশ্য একটা কথা সহৃদয় মানুষদের মধ্যে চালু আছে— "When the patient is critically ill the doctor is an angel; when the patient is getting cured, doctor is an ordinary man, but when the doctors ask for his fee's he is a devil"।

বন্ধুপত্নীকে বলেছিলাম আরও একটা দিক সাধারণ মানুষ কিন্তু বিবেচনার মধ্যে আনেন না। কিছু ডাক্তার অথবা তাদের স্বার্থগন্ধি স্তাবকেরা তা আনতে দেয় না। ডাক্তাররাও মানুষ, বিশেষ একটি বিদ্যায় শিক্ষিত মানুষ। পারদর্শী কথাটা তুললাম না, কারণ পারদর্শিতার মূল্যায়ন কঠিন। ডাক্তারির ক্ষেত্রে অন্তত এর কোনো বাঁধাধরা সঠিক পদ্ধতি নেই। ডাক্তাররাই জানে, অন্তত তাদের জানা উচিত যে চিকিৎসার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডাক্তাররা কত অসহায়। তাদের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের ক্ষমতা কত সীমিত। এই একটি ফলিত বিদ্যা, যাতে দুই আর দুই-এ চার হয় না। অনেক লক্ষণ-বর্হিভূত কারণ রোগীর রোগ ও নিরাময় ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই রোগী সুস্থ হয়ে গেলে যখন রোগীরা বা তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা বলেন, আপনি 'ভগবান' তখন যে-কোনো সৎ চিকিৎসক লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হন। তিনি মনে মনে জানেন রোগী তার নিজের প্রাণ-শক্তিতেই সুস্থ হয়েছেন। চিকিৎসক রোগের কারণ এবং গতিপ্রকৃতি বুঝে রোগীকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছে, এটাই তার শিক্ষালব্ধ বৈশিষ্ট্য। এতে হয়তো দায়বদ্ধতা এবং কারিগরি দক্ষতা আছে। ঈশ্বরত্ব কিছুই নেই। রোগীর ঈশ্বরপ্রাপ্তি না হওয়াটা উভয়ের

পক্ষেই শুভ। আবার যখন কোনো রোগীর রোগ সারানো যাচ্ছে না, অথবা রোগী মারা গেলেন, তখন তাঁর আত্মীয়পরিচিতরা ডাক্তারকে গালাগালি করেন, শয়তান বলেন; তখনও সৎ ডাক্তার ভাবেন, তিনি যে এই লড়াইতে হেরে গেলেন তাঁর এই দুঃখটা কেউ বুঝল না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় *আরোগ্য নিকেতন* গ্রন্থে, তাঁর মতো করে বৈদ্য আর মৃত্যুর দ্বন্দ্ব খুবই মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত করেছেন। চিকিৎসক এবং চিকিৎসিতদের সম্পর্ক এই আলোতেই দেখলে উভয়ের উপকার হবে।

কয়েক বছর আগে আমার বন্ধু এবং রাজনীতিবিদ শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে পুরুলিয়া যাচ্ছিলাম। তখন Consumer Protection Act নিয়ে খুব হইচই চলছে। সোমনাথবাবু তাঁর কামরায় আমাকে ডেকে এনে এক ভদ্রমহিলাকে বললেন—ইনি ডাক্তারদের নেতা। এঁকে CPA -র কথা বলুন। সুবেশ ভদ্রমহিলা খুবই smart। ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ে নেতৃস্থানীয়া আন্দোলনকারী। উনি আমাকে বললেন— জানেন ডাক্তাররা এখন আমার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপছে।

আমি বিনীতভাবে বললাম—মা লক্ষ্মী আপনি আমার কন্যাস্থানীয়া। একটা কথা সবিনয়ে বলি। আমি পেশায় স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক। যে-কথা আপনি আপনার মা, বোন, মেয়ে এমনকী স্বামীকেও বলতে পারবেন না সেই কথা আপনাকে চিকিৎসার প্রয়োজনে আমাকে বলতেই হবে। তেমনই একান্ত অপরিচিতা আপনার মতো মহিলাকে অত্যন্ত নিবিড়, ঘনিষ্ঠভাবে শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে আমাকে চিকিৎসার খাতিরে। এই সম্পর্ককে নিছক লেনদেন বা ব্যাবসা হিসাবে দেখলে ভুল হবে। যদিও চিকিৎসাকে ব্যাবসা হিসাবে দেখাটাই এখন চলতি এবং বাজার-কাটতি জিনিস। এর মানে কিন্তু এই নয় যে চিকিৎসকরা তাদের ত্রুটি, অবহেলা বা অন্যায় প্রভৃতির জন্য বিচারাধীন হবেন না। না চিকিৎসকরা কখনোই বিচারের বা দায়বদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। হতে পারেন না।

আমার বাবা, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জেনারেল প্র্যাকটিশনার ছিলেন। তিনি আমাকে দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন।

> (এক) চিকিৎসা করার সময় তোমাকে ঠিক করতে হবে এই একই চিকিৎসা তুমি তোমার একান্ত আপন জনকে করতে কি না? যদি এই বিবেচনায় রোগীর চিকিৎসা কর তা হলে তুমি নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার। কোনোদিন তা হলে তোমাকে অনুশোচনা বা অনুতাপ করতে হবে না। ভুলভ্রান্তি কার না হয়েছে। 'Best horse also may stumble some day' কিন্তু এটা ত্রুটি, অবহেলা নয়।
>
> (দুই) যেদিন স্থির হয় আমি স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ হব সেদিন উনি আমাকে বলেছিলেন—You have no right to touch a female patient, unless you think that she is either your mother, daughter or sister — ডাক্তারিতে ভরতি হওয়ার দিনও উনি এই কথাই বলেছিলেন সমস্ত রোগিনী সম্পর্কে।

আমার চিকিৎসক-জীবনে ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই হয়েছে। আমার হাতেও রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসায় বিফলও হয়েছি। বাবার নির্দেশ মানার ফলে অনুতাপ হয়নি। তবে দুঃখ হয়েছে নিশ্চয়ই।

এই আলোচনা অক্ষরে লিখছি এই কারণে যে সম্প্রতি দুজন প্রখ্যাত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মহামান্য বিচারক শাস্তির আদেশ দিয়েছেন। এই নিয়ে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসকসমাজ বিচলিত হয়েছে। বিভিন্ন অংশের বুদ্ধিজীবীরা এবং সাধারণ মানুষ নানারকম বিতর্ক তুলেছেন। বিতর্ক ভালো। আমার নিবেদন বিষয়টা একটু গভীরে ভাবা দরকার। ভাবলেই যে সব সমস্যার সমাধান এক দিনেই হয়ে যাবে তা নয়। তবে ভাবা দরকার। কয়েকটি সত্য কথাও বলা দরকার।

নিবন্ধের শুরুতেই কথোপকথনের মাধ্যমে ডাক্তারদের সম্বন্ধে অর্ধসত্য ধারণা, শিক্ষিত এবং সহৃদয় মানুষের মধ্যেও যে আছে তার উল্লেখ করেছি। প্রচলিত কথা আছে— 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্য সহস্রমারী চিকিৎসকঃ'। অথবা কৌতুকছলে বলা, রোগ হলে নিশ্চয়ই ডাক্তার দেখাবে কারণ ডাক্তারদের টাকার দরকার, তাকে তো বাঁচতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশিত ওষুধও নিশ্চয়ই কিনবে, কারণ না কিনলে ওষুধের ব্যাবসা চলবে কী করে? কিন্তু ওই ওষুধ কখনও খাবে না। কারণ তোমাকেও তো বাঁচতে হবে।

আমি ডাক্তারবাড়ির সন্তান। আমাদের বাড়িতে আগে এবং এখনও অনেক ডাক্তার আছেন। আমরা চিরকাল শুনে এসেছি তোমাদের তো 'জল ঢালা পয়সা' 'নাড়ি-টেপা পয়সা' অর্থাৎ ডাক্তাররা বিনা আয়াসেই অর্থ উপার্জন করেন, এটি আমার বিদগ্ধ বন্ধুপত্নীর চিন্তারই গ্রাম্য সংস্করণ। কিন্তু ভাবনার মূলটা হচ্ছে একই।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাড়াও ১৫ জুন (২০০২) ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখা নীলরতন সরকার প্রেক্ষাগৃহে যে আলোচনাসভা করেন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বিস্মিত হয়েছি চিকিৎসকদের কিছু অংশ এবং উপস্থিত বুদ্ধিজীবীরা (সাহিত্যিক সাংবাদিক ইত্যাদি) বললেন স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা এই প্রথম অনুষ্ঠিতহচ্ছে! তার জন্য আই.এম.এ.-কে ধন্যবাদ। এই সভায় একজন বললেন ডাক্তারদের বলতে হবে তারা কাদের পক্ষে? রোগীদের পক্ষে কি না। যেন সমাজের একটি বিশেষ অংশের মানুষ,যাদের উপর অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা নির্ভর করছে, তাঁরা জনসমক্ষে বলবেন—আমরা রোগীদের বিপক্ষে। বিপরীত বুদ্ধির আর কী নমুনা থাকতে পারে! ওই সমস্ত মানবস্বার্থের অভিভাবকদের জানাতে চাই, এ-বছরেই এপ্রিল মাসে কলকাতা জেলা জনস্বাস্থ্য কমিটির উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য মেলা এবং এপ্রিল মাসেই রাজ্য জনস্বাস্থ্য চেতনা প্রসার সমন্বয়সমিতির রাজ্য সম্মেলন হয়েছে ডায়মন্ডহারবারে, তিন দিন ধরে। যেখানে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও স্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতারা; চিকিৎসা, শিক্ষা, বিশ্বায়ন ও জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যনীতি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা যাঁরা বক্তৃতা দিলেন তাঁদের নিজস্ব খবরের কাগজ এবং বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমে একটি বাক্যও তাঁরা প্রচার করেননি। একমাত্র 'গণশক্তি' -তে এই সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

২০০০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় ন্যাশনাল হেলথ্ অ্যাসেমব্লি অনুষ্ঠিত হল। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্তরের স্বাস্থ্য কর্মীরা দলমত নির্বিশেষে এই চার দিন ব্যাপী মহতী সভায় অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রদর্শনী ইত্যাদি অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে প্রতিপালিত হয়। WHO-র প্রাক্তন সম্পাদক ডা. মাহলার, ডা. অস্তিয়া, ডা. জাফরুল্লা চৌধুরি প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিন্তাবিদরা এই সম্মেলনে অংশ নেন। কলকাতার একটি দৈনিক

ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকা এই সংবাদ সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন করেনি। এ-বিষয়ে সোচ্চার সাহিত্যিক এবং সংবাদমাধ্যমের মানুষদের চিকিৎসা বিষয়ে ভাবনা এতেই স্বয়ংপ্রকাশ।

জনমানসে এই চিন্তা-দূষণের জন্য চিকিৎসকসমাজও কম দায়ি নয়। তারা অবচেতন মননে বোধহয় বিশ্বাস করেন যে তাঁরা সাধারণ মানুষের 'Friend, Philosopher and Guide.'। এই মনোবৃত্তিই চিকিৎসিত এবং চিকিৎসকদের সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে।

যখন ক্রেতা সুরক্ষা আইন চালু হতে যাচ্ছে তখন ডাক্তাররা এই আইনের আওতা থেকে নিজেদের বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকদের জাতীয় সংগঠন আই.এম.এ. এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যান। কয়েক লক্ষ টাকাও খরচ হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক অংশ এই C. P. A. -এর আওতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই কার্যক্রমের বিরোধিতা করেন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকরা। যদিও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তা গৃহীত হয়নি। সুপ্রিমকোর্ট ডাক্তারদের এই দাবি মানেননি। মানা সম্ভবও ছিল না।

আই. এম. এ. হয়েছে, যদিও ঠিক জোর দিয়ে বলা হয়নি বা মানুষকে বোঝানো যায়নি যে স্বাস্থ্যকে পণ্য হিসাবে দেখা অমানবিক। সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের। এই তত্ত্ব স্বীকৃত এবং রূপায়িত হয়। এর ফলে ইংল্যান্ডে 'রিভারেজ কমিটি'র রিপোর্ট এবং পরে ভারতবর্ষে 'ভোর (Bhore) কমিটি'র রিপোর্টে বলতে হয়, 'No body should be denied from obtaining adequate treatment because he can not pay for it'? এর চেয়ে মানবিক ঘোষণা আর কী হতে পারে! এর রূপায়ণের ভার প্রতি দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ব্যবস্থাপনার উপর থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসকদের ত্রুটি বিচ্যুতি নিশ্চয়ই বিচারাধীন হবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে চিকিৎসার দর্শন অবশ্যই মানবিক।

আমি ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় আই. এম. এ.-র রাজ্য শাখার হসপিটাল কমিটির কনভেনার ছিলাম। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত চিকিৎসক নিগ্রহের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়, এই নিয়ে আই.এম.এ.-তে কর্মীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। একদলের মতে এই নিগ্রহের কারণ বাম রাজনীতিজনিত উচ্ছৃঙ্খলতা (Political Vandalism)। অন্য অংশের মত ছিল স্বাস্থ্য-পরিষেবা সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা এবং স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। চিকিৎসকরাও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, বিশেষত চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে যে-উচ্চকোটি শ্রেণীর মানুষরা, সাধারণ মানুষকে তাদের তাঁবে রাখার অস্ত্র হিসেবে (as a means of political dominance) ব্যবহার করছেন এ-কথাও সঠিকভাবে বোঝেননি বা বুঝাতে চাননি। এই চেতনাপ্রসারের জন্যই আই.এম.এ. স্বাস্থ্য বিষয়ক মেলায় সমস্ত গণসংগঠনের (দলমত নির্বিশেষে) নেতা ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে আলোচনা সংগঠিত করেন। ডাক্তারদের রক্ষা বা তাদের পাপ স্খালনের জন্য নয়। আই.এম.এ. এবং ডাক্তারদের অন্য সংগঠনগুলি এখনও তাই করে যাচ্ছেন।

আই. এম. এ.-র হসপিটাল কমিটির কনভেনার হিসাবে আমাকে আমাদের কমিটি সদস্যদের নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে বছরে ৪০ টি অভিযোগের তদন্ত করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতিটি ঘটনার প্রধান কারণ : ১। রোগীদের অবস্থা সম্পর্কে বাড়ির লোকদের দেওয়া সমস্ত তথ্যে।

অস্বচ্ছতা, ২) চিকিৎসকদের একটা অংশের স্থানীয় প্রভাবশালী এমনকী সমাজবিরোধীদের

সন্তুষ্ট করা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অন্যায় আবদারের কাছে নতি স্বীকার, ৩) একজন চিকিৎসক অন্যের সম্পর্কে অসূয়া বা অজ্ঞতাপ্রসূত নিন্দা, এমনকি উসকানি।

এই তথ্যের ভিত্তিতেই আই. এম. এ. কনভেনশন করেছে চিকিৎসকসমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করুন। রোগীদের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করুন, সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চিকিৎসাব্যবস্থায় উন্নতি করুন বলে পোস্টার এবং লিফলেট দিয়েছেন। এতখানি দুঃসাহস অন্য কোনো গণ-সংগঠন জানিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

একটি ঘটনার (শোনা কথা) উল্লেখ করি। একদিন খারাপ খেলার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল মহাশয়কে কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক জুতোর মালা দিতে এলে ওঁর সঙ্গীরা তাদের মারতে যান। তাদের নিবৃত্ত করে জুতোর মালা পরার জন্য শ্রীপাল গলা এগিয়ে দেন। এবং সকলকে বিস্মিত করে বলেন, ভালো খেলার জন্য যখন ফুলের মালা নিই খারাপ খেলার জন্যও তখন জুতোর মালা নিতেই হবে। আমিও ইনসিওরেন্স কর্মীদের বলেছি আমার রোগীরা যদি আমাকে জেলে দিতে চান তা হলে আমি জেলেই যাব।

এখানে চিকিৎসক বন্ধুদের কাছে নিবেদন। রোগীকে এবং তাদের আত্মীয়দের সব কথা খোলাখুলি বলুন। রোগের ইতিহাস লক্ষণ এবং আপনার findings সবই রোগীর ব্যবস্থা-পত্রে লিখে দিন। নিজের আত্মীয়দের ক্ষেত্রে যা করতেন রোগীর ক্ষেত্রে ঠিক তাই করুন।

জনসাধারণের কাছে একটিই আবেদন। এখন সবকিছুই মাপা হয় কেনাবেচার আদর্শে। পুঁজিবাদী সমাজের এই অপকৌশলে সায় দেবেন না। ধনবাদী সংস্কৃতির এই অপপ্রয়াসে শামিল হবেন না। স্বাস্থ্যকে পণ্য করবেন না। চিকিৎসাব্যবস্থা ও তার পিছনের রাজনীতিকে বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। রোগী ছাড়া ডাক্তারদের চলবে না। আর ডাক্তারকে বিশ্বাস করতেই হবে, না হলে তার কাছে নিজের ও আত্মীয়দের জীবন রক্ষার ভার কেমন করে দেবেন?

আইন শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষসাধনই যথেষ্ট নয়

অরুণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের উন্নতির জন্য তাঁর চিন্তা ও কর্মে রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের মৌল মূল্যবোধ ও জনহিত চিন্তা নিয়ে তিলে তিলে গড়ে-ওঠা সমাজ দিয়েই তার প্রকৃত পরিচয়, কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক পরিচয়টা গৌণ। কিন্তু আজ দিনকাল পালটেছে। ঘোড়ার আগে গাড়ি এসে বসেছে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থার আগে এসে গেছে, সমাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছে। তাই শহরে ও গ্রামে রাষ্ট্রব্যবস্থাই ভার নিয়েছে জল, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নয়নমূলক কাজ প্রভৃতির। এ-সবের নিয়ম-নীতি, ভালো-মন্দ নির্ধারণ করছে, রূপায়ণ করছে সেই রাষ্ট্র। সমাজ এখন যে কোনো ব্যাপারে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। এ-অবস্থা এখন ওয়েলফেয়ার স্টেট, কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণায় চলছে।

এইভাবেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচির অধীন। রাষ্ট্রের চিন্তা ও চেষ্টায় শিক্ষার নিয়ম-নীতি, পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, সম্প্রসারিত হচ্ছে। রাষ্ট্র-পালিত বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞরা নানা কমিটি কমিশনে থেকে রাষ্ট্রকে সাহায্য করছেন। আগে ছিল প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিকাঠামো, এখন এতে যুক্ত হয়েছে টেকনিকাল এডুকেশন, ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন, ইনফরমেশন এডুকেশন প্রভৃতি নব নব দিগন্ত। তবে এত দিন আইন শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার যে পিছিয়ে পড়েছিল এটাও বাস্তব সত্য।

এই ভেবেই হয়তো প্রায় তিন বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পূর্ণাঙ্গ আইন বিশ্ববিদ্যালয় (The West Bengal National University of Juridical Sciences) স্থাপন করেছে সল্টলেকের 'অরণ্যভবন'-এ, ভবিষ্যতে নতুন বাড়িতে তা উঠে যাবে স্থির হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঐতিহ্যপূর্ণ আইন বিভাগ ও কলেজে-কলেজে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে নতুন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হল কেন এমন একটি প্রশ্ন তখন বিতর্কের আকারে দেখা দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুক্তি ছিল এই : দুটি প্রধান উদ্দেশ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল— *এক*, আইন শিক্ষার দিকে ছাত্রছাত্রীদের যেভাবে আগ্রহ বাড়ছে তাতে আইন শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ আশু দরকার এবং *দুই*, আইনবিদ্যাচর্চায় উৎকর্ষসাধনও প্রয়োজন যাতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পিএইচ.ডি, ডি.লিট গবেষণার সহজ সুযোগ পায়। এর পালটা যুক্তি ছিল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ ও কলেজ স্তরে আইন শিক্ষার পরিকাঠামো যদি ওই দুটি উদ্দেশ্যসাধনে অপ্রতুল মনে হয় তা হলে কি এই ঐতিহ্যপূর্ণ আইন বিভাগটির উপযুক্ত সংস্কারসাধন করে অভীষ্ট সিদ্ধ হত না? এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা যখন ঘোষিত হয় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন: 'এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ আইন বিভাগটিকে আরও জনবল অর্থবল দিয়ে নতুন করে সম্প্রসারিত করে সাজিয়ে এবং কলেজ স্তরে আইন শিক্ষার আরও প্রসার ঘটিয়ে পুনর্গঠন করলে নতুন আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর প্রয়োজন হত না। তবুও দক্ষিণ ভারত

থেকে বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এন. আর. মাধব মেননকে উপাচার্য পদে বৃত করে বেশ সোরগোল ফেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হল সল্টলেকে।

এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি কী— নতুন উপাচার্য তার ব্যাখ্যা দেন এইভাবে— এখানে আইন শিক্ষার তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে— *এক*, মূল্যবোধ-ঋদ্ধ শিক্ষা অর্থাৎ আমাদের সনাতন সমাজ ও বর্তমান সংবিধানে মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিক আদর্শের যে-প্রতিফলন আছে ছাত্রছাত্রীরা সে-সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হবে এবং তা আত্মস্থ করে বিবেকী, সৎ আইনজ্ঞ হয়ে উঠবে। *দুই*, আইনের বিভিন্ন শাখায় সম্যক জ্ঞান অর্জন করে তারা আইন বিশারদ হবে। এবং *তিন*, উপযুক্ত উকিল অথবা ল অফিসার হওয়ার জন্য বৃত্তিকুশলতা বা Professionalism ভালোভাবে আয়ত্ত করবে। ফলে, যেমন তারা যোগ্যতার সঙ্গে আইন-ব্যাবসা করতে পারবে বিভিন্ন আদালতে, ট্রাইব্যুন্যালে, সলিসিটর ফার্মে এবং ল অফিসার হিসেবে বিভিন্ন ফার্মে, তেমনই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ডক্টরাল গবেষণা করে পিএইচ.ডি এবং ডি.লিট ডিগ্রি নিয়ে আইনের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হতে পারবে দেশে ও বিদেশে, তা ছাড়া আইন-ব্যাবসার সুযোগ তো তাদের রইলই।

এখানে আইন শিক্ষার পদ্ধতি কী ? অধ্যাপক মাধব মেনন জানালেন, শ্রেণিকক্ষে পড়ানো ছাড়াও আইনের ব্যাবহারিক জ্ঞান প্রয়োগের শিক্ষার জন্য ছাত্রীদের পাঠানো হবে নামি অ্যাডভোকেটদের কাছে যাতে তারা মামলার ব্রিফ তৈরির পদ্ধতি ও সওয়াল-জবাবের কলাকৌশল শেখে। তা ছাড়া এখানে কয়েকটি লিগ্যাল জাস্টিস সেন্টার খোলা হয়েছে যেখানে সাধারণ নাগরিক ও মহিলারা আইনের জ্ঞান ও তাদের আইনি অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ও ওয়াকিবহাল হবে। সমাজের মহিলা ও শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত আইনচর্চার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বিশেষ ফোকাস হিসেবে। এর পরেও অধ্যাপকগণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গ্রামাঞ্চলে যাবেন এবং নির্যাতিত মহিলাদের আইনের পরামর্শ দেবেন এবং আইনের আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের আইনজ্ঞ হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ তৈরি হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি আশার সঞ্চার করে। এভাবে সব ঠিকঠাক চললে, যোগ্য সব আইনজ্ঞ তৈরি হলে যে-সিদ্ধি লাভ হবে তা কিন্তু প্রাথমিক সিদ্ধি, কিন্তু শেষ সিদ্ধি নয়। কারণ, যেহেতু আইন এক ব্যাবহারিক বিদ্যা, সেহেতু এর শেষ সিদ্ধিলাভের পরীক্ষাক্ষেত্র হল সমাজ। তবে এ-পরীক্ষা হবে অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও দুরতিক্রম্য, কারণ আজ এ-সমাজটা অবক্ষয়িত, অসুস্থ।

প্রয়োগতভাবে আইন এমন একটা বিদ্যা, মানুষের কল্যাণবিধানই যার একমাত্র লক্ষ্য; মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের, সরকারের অন্যায়-অবিচারের পথে, আইনের ন্যায়বিচারই তার একমাত্র অভিপ্রায়। আইনের সেই অধীত বিদ্যার প্রতিষ্ঠানের দরজার বাইরে আইনজ্ঞ ছাত্রছাত্রীরা যেখানে এসে দাঁড়ায় তার নাম সমাজ, তাদের একমাত্র কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রের চেহারা আজ কেমন তা বিশ্লেষণের আগে তারা যা শিখে এল সেই আইনগুচ্ছের উপর কিছু আলোকপাত করা যাক। প্রথমেই প্রশ্ন হল: তারা আইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে আইনগুলি শিখে এল তা কি আজকের পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনের তুলনায় যথার্থ ও যথেষ্ট? এ-প্রশ্নের কারণ হল এ-দেশে ব্রিটিশ শাসকরা তাদের প্রয়োজনে অর্থাৎ নিজেদের নানা

স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে আইনগুচ্ছ প্রবর্তন করেছিল তাদের প্রায় সবটাই স্বাধীনোত্তর ভারতে অনুসৃত হয়ে আসছে প্রায় হুবহু, অথচ স্বাধীন ভারতের সংবিধান তার জনগণকে যে একগুচ্ছ মৌলিক অধিকার দিয়েছে তার সঙ্গে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্রিটিশের দমন-পীড়নমূলক ফৌজদারি আইনগুলি অপরিবর্তিত রাখা সংগত ছিল না এই কারণে যে, বিদেশি শাসকরা ভারতীয়দের নানা আন্দোলন পর্যুদস্ত করার জন্য এগুলি প্রয়োগ করত। আজ দিনকাল পালটাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় স্তরে মানবাধিকার কমিশন মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে। দেশের সুপ্রিম কোর্ট আজ চুপ করে বসে নেই। এই সর্বোচ্চ আদালতও ফৌজদারি আইনের অনুসারী পুলিশের কোড অফ কনডাক্ট নিয়ন্ত্রণ করে দিয়ে নির্দেশ পাঠিয়েছে প্রতি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে। পুলিশ সেগুলো না মানলে মানবাধিকার কমিশন এগিয়ে আসছে নির্যাতিতের পক্ষ নিয়ে, ফলে প্রশাসন ও কমিশনের মধ্যে তিক্ত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত পুরনো আইনগুলির সময়ানুগ সংস্কারের জন্য কমিটি কমিশন বসাচ্ছিল মাঝে মাঝে, কিন্তু আজও পর্যন্ত ভারতীয় আইনগুচ্ছ তৈরি হল না। শুধু ভারতীয় সংবিধান শততম সংশোধনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যুগোপযোগী পরিবর্তনের প্রয়োজনে, কিন্তু সংবিধানেরই যে মৌলিক কতকগুলি সংস্কার প্রয়োজন তা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট কমিশন বছর-দুই ধরে গবেষণার পর মুষিকপ্রসবের গল্প তৈরি করেছে মাত্র। এইসব দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে হয় আমাদের ব্রিটিশ আইনের লিগেসি ভুলে নিজস্ব আইনগুচ্ছ তৈরি করার যোগ্যতা নেই, নতুবা আমরা এটা চাই না, এক অদ্ভুত স্ট্যাটাসকোর অনুপন্থী আমরা।

এবার সমাজের দিকে মুখ ফেরাই। আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নবীন আইনজ্ঞরা তাদের কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসে যে-সমাজকে দেখছে তার চেহারা ও চরিত্র কেমন? এককথায় এর উত্তর হল : নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ে জীর্ণ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিভিন্ন রূপ যেভাবে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে গেছে সমাজের সারা দেহে তাতে পায়ের নীচে দুর্নীতিমুক্ত এক ইঞ্চি জমিও নেই। আবার দিনে চুরি-ডাকাতি আগে যেমন ছিল এখনও আছে, তবে দুর্নীতি বলতে আমরা যা বুঝি তা ছিল পুলিশের ঘুষ নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ-যুগের দুর্নীতির জন্ম ও বৃদ্ধি দিকে দিকে হয়েছে। বিশেষত দুটি মহাযুদ্ধ, একটি মহাদুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি থেকে বিভিন্নমুখী অর্থস্রোতের পর থেকে। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, মজুতদারি, কালোবাজারি, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অবদান এবং তার পরবর্তীকালে ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকি, অবৈধ আর্থিক লেনদেন থেকে কালো টাকার উদ্ভব, এখন যা এক সমান্তরাল আর্থিক ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। এর পরে আসছে সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের নিয়ে *ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না অবস্থা*— যা ছিল এককালে পুলিশের মনোপলি। রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা আজ আর্থিক দুর্নীতির সর্বকালের রেকর্ড করে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে আছে হাফ ডজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, এক ডজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কোয়ার্টার ডজন মুখ্যমন্ত্রী এবং বহু আমলা যাঁরা কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠনের, বহু জমিজমা আত্মসাৎ-এর অভিযোগে অভিযুক্ত। জনগণের কণ্ঠে একটাই প্রশ্ন, একটাই দাবি— *ওদের কেন শাস্তি হয় না, আজও কেন এঁরা জেলের বাইরে আছেন?* এ-নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী *কে? প্রশাসন, আদালত বা অন্য কোনো অদৃশ্য কালো হাত? জুডিসিয়াল অ্যাক্টিভিজম-*

এ উদ্‌বুদ্ধআদালতই ছিল মানুষের শেষ ভরসা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের শেষ হাতিয়ার। আর কতকাল মানুষ আদালতের উপর আস্থা রাখতে পারবে জানি না। আমার এ- সংশয়ের নিষ্পত্তি করে দিলেন আমার এক ফৌজদারি কোর্টের উকিল বন্ধু—দেখবে এঁদের কারোরই শাস্তি হবে না। কী ভয়ংকর কথা! কোন্ সমাজে বাস করছি আমরা? ইদানীং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তোলাবাজ, অপহরণের পর মুক্তিপণের দাবিদার প্রভৃতি সমাজবিরোধী অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *চন্দ্রগুপ্ত* নাটকে চাণক্যের একটা সংলাপ ছিল, 'প্রভাতের সর্বাঙ্গে ঘা— পুঁজ পড়ছে'। এই কাব্যটিকে একটু পালটে বলতে ইচ্ছে করে— আজ সমাজের সর্বাঙ্গে ঘা—পুঁজ পড়ছে।

এখন প্রশ্ন হল— নতুন আইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৈরি হওয়া মূল্যবোধাশ্রয়ী ও সৎ আইনজ্ঞের ভূমিকা এখন সর্বাঙ্গদূষিত সমাজে কীভাবে পালন করবে তা একজন ছাত্র বা ছাত্রীর প্রথম পরীক্ষা। সে একটি বাণিজ্যিক সংস্থায় ল অফিসার হিসেবে চাকরি পেয়ে দেখছে, সে-সংস্থা আয়কর, বিক্রয়কর, আবগারিকর এবং আরও অন্যান্য কর ফাঁকি দিয়ে কালো টাকার পাহাড় জমিয়ে চলেছে বছরের পর বছর। তাকে চাকরি রাখতে হলে ওই অসৎ সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে, নতুবা বিবেকতাড়নায় চাকরিটি ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু আয়করের একজন উকিল এ-সংস্থাকে কর ফাঁকি দিতে সাহায্য করছে কর-ফাঁকি-দেওয়া টাকার একটি বড় শতাংশ চুক্তির বিনিময়ে। নবীন আইনজ্ঞ এই অবস্থায় কী করবে?

এবার তেমন এক জন নবীন আইনজ্ঞ উকিলকে নিয়ে আসি একটি ফৌজদারি মামলার আসরে। বীভৎস খুনের মামলা। খুনের পরেই যে-ঘটনাটি ঘটল তা হল— পুলিশ ডাক্তার ও খুনির পক্ষের একটি চক্র মিলে নিহতের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটি এমনভাবে ডাইলিউট করে তৈরি করল যে তার ভিত্তিতে খুনিকে ছোঁয়া যাবে না, সঙ্গের পুলিশ রিপোর্টটিও তদনুরূপ দুর্বল। এখানে নবীন উকিল ও বিচারক নিহতের পরিবারের কাছে সুবিচার পৌঁছে দেবেন কী উপায়ে? বিচারকের পুলিশকে ভর্ৎসনা ছাড়া আর কীই বা করার আছে এবং উকিলটির সততা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসের প্রতিফলনও ঘটবে কীভাবে? এই খুনের কেসের সঙ্গে আর-একটি ডাইমেনশন যুক্ত করা যাক—এই খুনটি হয়েছে বর্তমান রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ফলস্বরূপ যার পেছনে আছে এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা যার কাছ থেকে আসতে থাকে উকিল ও সাক্ষীদের খুনের হুমকি, কিন্তু কে তাদের নিরাপত্তা দেবে? পুলিশ? তাঁরা তো এ-ষড়যন্ত্রের অংশীদার। অধ্যাপক মাধব মেননের মন্ত্রশিষ্যরা এই দুর্বৃত্ত-কবলিত পরিস্থিতিকে কীভাবে সামাল দেবেন? সমাজবিরোধীদের রাজনীতি-নিরপেক্ষ অথবা সাপেক্ষ দৌরাত্ম্যে, থানার কিছু সৎ পুলিশ অফিসার, আদালতের উকিল ও বিচারকরা নিরুপদ্রব ও নিরপেক্ষভাবে সুবিচার করার পরিবেশ পাচ্ছেন না। ফলে খুনের মামলার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ মামলায় এমন দুরভিসন্ধির জন্য শতকরা পাঁচজন-এরও কম খুনি শাস্তি পাচ্ছে। খুন করলেও শাস্তি পেতে হয় না— গ্রামে-গঞ্জে-শহরে এই বার্তা রটে যায় ক্রমে, ফলে সমাজে খুনির সংখ্যা হুহু করে বাড়তে থাকে এবং অন্য দিকে জেলের দরজা দিয়ে তারা বেরিয়ে যায় এভাবেই মামলা জিতে। আবার খুন করে, ধরা পড়ার পর জানা গেল এর আগে এক জন সাতটা খুন ও আর-এক জন আটটা খুন করেছিল কিন্তু পুলিশ তাদের এতদিন যে ধরেনি তার সরল কারণ

কারোর অনুমানের অসাধ্য নয়। কারণ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে আটটি খুনের খুনিকে পুলিশ অচিরেই ধরে ফেলে। এই হল বর্তমান প্রশাসন ও আইন—আদালতের হালচাল।

এ-কথা অনুমানসাধ্য যে, নয়া আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সৎ মানবদরদি ও সুবিবেচক আইনজ্ঞ তৈরি করার জন্য মূল্যবোধের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে পাঠ্যসূচিতে। বাস্তবে লক্ষ করা যায়, বিভিন্ন স্তরের আদালতে এমন এক শ্রেণির উকিল আছেন যাঁরা মক্কেলদের অর্থশোষণের অভিপ্রায়ে বিচারকের কাছ থেকে নানা অজুহাতে বারবার মামলার তারিখ নেন এবং প্রতিবারেই মক্কেল, উকিলকে অনাবশ্যক ফি দিতে বাধ্য হন। আবার আর-এক শ্রেণির উকিল আছেন যাঁরা প্রতিপক্ষ থেকে 'টাকা খেয়ে' নিজের মক্কেলের মামলা দুর্বল করে দিয়ে তাকে হারিয়ে দেন— এখানে উকিলের গাছের ও তলার দুটো লাভই হল। প্রথম শ্রেণির উকিলদের মক্কেল-শোষণের এ-অসাধুতা বিচারকই বন্ধ করতে পারেন মামলার দিন অনুমোদনের ব্যাপারে কড়া হয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণির উকিলদের ওই অসাধুতা চেষ্টা করলেই তিনি ধরে ফেলতে পারেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তা বন্ধও করে দিতে পারেন।

নবীন আইনজ্ঞ উকিলদের আদালতের আর-এক হালচালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সারা ভারতে বিভিন্ন স্তরের আদালতে প্রায় তিন কোটি মামলা অমীমাংসিত হয়ে পড়ে আছে। একমাত্র কলকাতা হাইকোর্টে জমে আছে প্রায় আড়াই লক্ষ মামলা। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, পঞ্চাশ বছরের পুরনো মামলাও জমে আছে। এক-একটি মামলার রায় বেরোতে বহু বছর লেগে যাচ্ছে। দু একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিই : সম্প্রতি উড়িষ্যার *ছবিরাণী মামলার* চূড়ান্ত রায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে বেরোল বাইশ বছর পর। কলকাতার পোর্ট পুলিশ অফিসার বিনোদ মেহতার হত্যা মামলার রায় বেরোতে লাগল পনেরো বছর। এমন বহু উদাহরণ তুলে ধরা যায়। ঘটনার ছয় মাস পরে সম্প্রতি খাদিম কর্তা অপহরণের মামলাটি আদালতে রুজু হয়। এর রায় বেরোতে কত বছর লাগে তাই দেখার বিষয়। সাম্প্রতিককালের একটি বিলম্বিত মামলার কাহিনী খুবই চমকপ্রদ ছিল। এক জন খুনি অপরাধীর সাত বছর কারাদণ্ড হয়, জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর তা বাড়বে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার অপরাধ মকুব করার জন্য অ্যাপিল করে, কিন্তু সে-অ্যাপিল আর আদালতে ওঠে না। ইতিমধ্যে তার জেলের আট বছরের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, কিন্তু সে জেল থেকে মুক্তি পায় না, কারণ তার আপিলের মামলা শেষ হয়নি। এটা বিলম্বিত বিচারের এক অমানুষিক উদাহরণ। হয়তো এমন আরও সব উদাহরণের এক মালা গাঁথা যায়। অথচ 'ল কলেজ' অথবা 'অরণ্যভবন'-এর নবীন আইনজ্ঞরা পাখি-পড়া পড়ে এসেছে — 'বিলম্বিত বিচার, বিচার-বঞ্চনার শামিল' এবং এখন তারা বুঝতে পারছে আইন-আদালতের জগতে কোথায় তারা দাঁড়িয়ে আছে একান্ত অসহায়ভাবে! তাদের মূল্যবোধ শুধু আঘাতই পাবে।

পরিশেষে, আমার মতে, নতুন আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার গল্প। এখানে ঘোড়া হল চলিষ্ণু সমাজ আর গাড়ি হল আইন-কানুন, নীতি-নিয়ম ও তাদের প্রয়োগ-ব্যবস্থা। ঘোড়াটাই যদি বেয়াদব ও উচ্ছৃঙ্খল হয় তা হলে ওই গাড়ি-ভরতি আইন-আদালতের বোঝা এবং নতুন প্রজন্মের মূল্যবোধ, ঋদ্ধ আইনজ্ঞদের দলে দলে আবির্ভাব কোনো সুফল দেবে বলে মনে হয় না। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচন-অবস্থায় সুফল আনা কি আদৌ সম্ভব আজ? তবু কিছু উচ্চস্বরি চিন্তা করে দেখা যাক : *এক*, সমাজের যথার্থ

প্রয়োজন অনুসারে ব্রিটিশ আইন ও তার ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। *দুই*, আদালত ও বিচারকের গুণগত মানবৃদ্ধি এমনভাবে করা যাতে মামলার খুব দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়! লোক আদালত ও পারিবারিক আদালতের আরও সম্প্রসারণ দরকার। *তিন*, দল-শ্রেণি-নিরপেক্ষ পরিচ্ছন্ন প্রশাসনব্যবস্থার সাহায্যে সমাজের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্ম ও প্রসারণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। *চার*, টাকার লোভে এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলে অপহরণ, খুন-জখম, তোলাবাজি প্রভৃতি সমূলে বন্ধ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। *পাঁচ*, রাজনৈতিক দলগুলিকে গণতান্ত্রিক শিষ্টতা ও মূল্যবোধের আচার-নিষ্ঠায় নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যে দুর্নীতি দমন আশু কর্তব্য। *ছয়*, বেকার যুবকদের (যাদের মধ্যে সমাজের দুষ্কৃতিদের অবস্থান) দলনিরপেক্ষভাবে কর্মসংস্থানের কর্মসূচি ক্রমে ক্রমে কার্যকরী করতে হবে। *সাত*, সর্বোপরি সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষদের স্বার্থে সমাজ-কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে তা যথাসম্ভব রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব সাত দফা কর্মসূচির মধ্যে *আইন শিক্ষা* একটি অংশমাত্র। বাকি কর্মসূচি রূপায়ণ সুফল না দিলে নবীন আইনজ্ঞরা তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ, সততা ও মূল্যবোধ নিয়ে তাদের অভীষ্ট ভূমিকা সোচ্চার করে তুলতে পারবে না সমাজের বুকে। 'অরণ্যভবন'-এর অরণ্যে রোদনই সার হবে।

Price : Rs. 42
Vol. 23 No. 4

BIVAV
April-June '2002
Published in September '2002

Reg No : 30017/76
85th issue

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO 0970-1885

সবিনয় নিবেদন

গত এক দশক ধরে বিভাব আমরাই ছাপছি।

ভালোলাগা অনেকেই জানিয়েছেন,

জানাচ্ছেন।

ত্রুটিগুলিও জানান।

শুরু থেকে শেষ অবধি সব ধরনের মুদ্রণই

আমাদের বৈশিষ্ট্য।

এবার নিজস্ব প্রকাশনাও শুরু হল।

বর্ণনা

৬/৭, বিজয়গড় ,কলকাতা - ৩২

বর্ণনা প্রকাশনী

এ/১২৫, বাঘাযতীন আই ব্লক ক্রশিং, কলকাতা - ৭০০ ০৯২

দূরভাষ : ৪১২ ১১৩৩